মহাকাশ পরিচয়

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

মহাকাশ পরিচয়

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জনপ্রিয় গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় বহুল প্রচলিত। বিজ্ঞানবিশেষে সুদক্ষ অধিকারী না হয়েও সে বইগুলি জনসাধারণের বোধগম্য। সকল দেশেই স্থানীয় ভাষায় এ জাতীয় বইয়ের একান্ত আবশ্যক। এমনই একটা মনোভাব নিয়ে ১৯৩৬ সনে শ্রীতাপসবালা দেবীর সহযোগিতায় 'আকাশ রহস্য' নামে একখানা জ্যোতির্বিজ্ঞান পুস্তক প্রণয়ন করেছিলাম। তারপর তেত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টিশক্তি বেড়েছে, আকাশ পর্যবেক্ষণে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান নামে এক নূতন শাখার সৃষ্টি হয়েছে, মহাকাশ সমীক্ষায় রকেট অভিযান সুরু হয়েছে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে অসামান্য দ্রুত গতিতে। স্বভাবতই 'আকাশ রহস্য' গ্রন্থে আলোচিত তদানীন্তন তত্ত্বে ও তথ্যে এসেছে নানা নব-রূপায়ণ।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম আদর্শ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার। মাসিকপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল যাবৎ পরিষদ এই কার্যে ব্রতী। বর্তমানে আবার বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ একটি নিয়মিত বিভাগ অনেক বাংলা সাময়িকীর অঙ্গসজ্জার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই ভাবে বিজ্ঞানের সকল শাখারই আধুনিকতম তত্ত্ব ও তথ্যাবলী বাংলায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কিন্তু শাখাবিশেষে আগ্রহশীল পাঠকের পক্ষে তার অভিলষিত প্রবন্ধাবলী ঐ সকল পত্র-পত্রিকা থেকে অনুসন্ধান করে পাঠ করা সহজসাধ্য নয়। তাই আমার এই 'মহাকাশ পরিচয়' গ্রন্থখানি রচনার প্রচেষ্টা। এ পুস্তকখানায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের আদিম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত বহু তত্ত্ব ও তথ্য জনসাধারণের পাঠোপযোগী করে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আমার শ্রম সার্থক হয়েছে কিনা সে বিচার পাঠকের।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাদিসম্বলিত আমার লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ বিগত দুই তিন বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানও বিজ্ঞান' মাসিকপত্রের এবং

এ পুস্তকের যে কয়টি প্রবন্ধ পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে—

গ্রহের জন্মকথা—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' জানুয়ারী, ১৯৬৬

নক্ষত্রের জন্মকথা—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' জুলাই, ১৯৬৬

বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

ব্রহ্মাণ্ড—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মার্চ, ১৯৬৭

জ্যোতিষ্কের দীপ্তিমাত্রা—'মাসিক বসুমতী' চৈত্র, ১৩৭২

নক্ষত্রের জীবন-প্রগতি—'মাসিক বসুমতী' জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৭৩

রাশিচক্র—'আকাশ রহস্য'

সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্র—'আকাশ রহস্য'
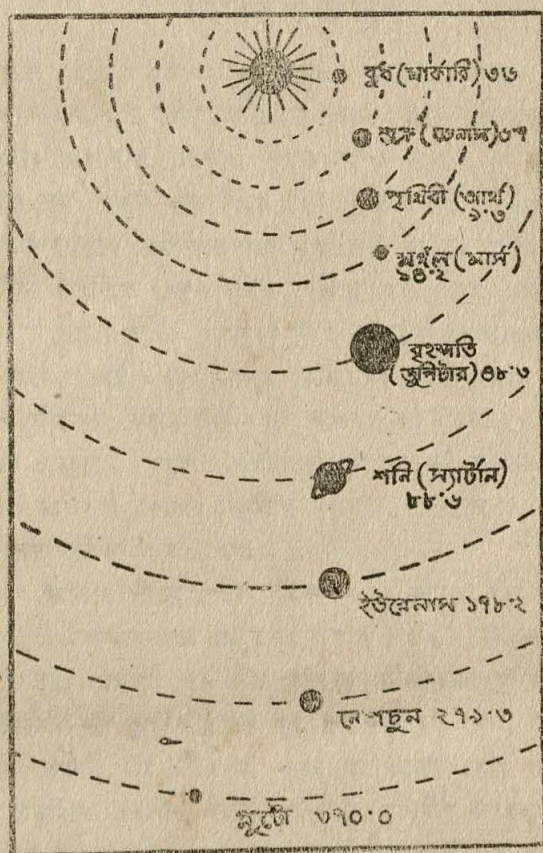
সূর্য থেকে গ্রহগুলির গড় দূরত্ব কোটির হিসাবে দেখানো হয়েছে

এসে পড়তো,—আর সব একাকার হয়ে যেত,—কোন কিছুরই আর কোনও পৃথক অস্তিত্ব থাকতো না।

উপরে বলা হয়েছে এক জ্যোতিষ্ক অপর একটির চারদিকে কক্ষ পরিক্রমা করে। আপাতদৃষ্টিতে এরূপই দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এতটা সরল নয়। দুটি জ্যোতিষ্কেই মহাকর্ষ শক্তি নিহিত আছে, অতএব উভয়ই উভয়কে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা এই দাঁড়ায় যে, জ্যোতিষ্কদ্বয়ের সম্মিলিত ভরকেন্দ্রের চতুর্দিকে উভয়ই প্রদক্ষিণ করে। জ্যোতিষ্ক দুটির ভর যদি সমান হয় তাহলে তাদের সম্মিলিত ভরকেন্দ্র অবস্থিত হবে উভয়ের ব্যবধানের মধ্যবর্তী স্থানে। এই ভরকেন্দ্রের চতুর্দিকে তারা প্রদক্ষিণরত। এজন্যে সমভরের অথবা প্রায়-সমভরের যুগল নক্ষত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা পরস্পর পরস্পরের চারিদিকে কক্ষ ভ্রমণ করছে। সূর্যের ভর যে কোনও গ্রহের তুলনায় অনেক বেশী। এত বেশী যে, এ কারণে সূর্য ও গ্রহের সম্মিলিত ভরকেন্দ্র অবস্থিত থাকে সূর্যেরই দেহের ভিতরে তার স্বকীয়
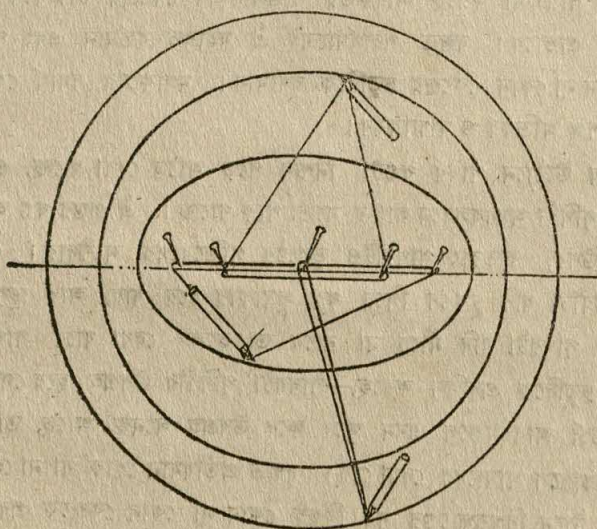
চিত্র-১—উপবৃত্ত অঙ্কন

কেন্দ্রবিন্দুর একেবারে সন্নিকটে। সেজন্যে শুধু গ্রহকেই সূর্যের চারিদিকে কক্ষ পরিক্রমা করতে দেখা যায়। সূর্য কোনরূপে গ্রহটির দ্বারা প্রভাবান্বিত কিনা তা বোঝাও যায় না। পৃথিবীর ভর চন্দ্র অপেক্ষা এত বেশী যে,

চন্দ্র-পৃথিবী জুটিতেও সম্মিলিত ভরকেন্দ্র পৃথিবীর দেহের ভিতরেই অবস্থিত থেকে যায়। এজন্যে চন্দ্রকেই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে দেখা যায়; পৃথিবীও কিন্তু সেই ভরকেন্দ্রের চতুর্দিকে পরিক্রমা করে অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না।

প্রতি জ্যোতিষ্করই ভ্রমণ কক্ষ সাধারণত একটি উপবৃত্ত। উপবৃত্তকে বৃত্তাভাসও বলা হয়। চিত্রের ন্যায় কাগজের উপর দুটি আলপিন বিঁধিয়ে তাদের উভয়কে কেন্দ্র করে একটি বেষ্টনী সুতোর সাহায্যে উপবৃত্ত অঙ্কন করা যায়। আলপিন দুটি পরস্পর থেকে যত দূরে থাকবে উপবৃত্তটি তত দীর্ঘাকৃতি হবে। (চিত্র-১)। আলপিন দুটি যত একে অন্যের কাছে হবে উপবৃত্তটি তত বৃত্তের কাছাকাছি হবে। অবশেষে আলপিন দুটি যখন একই বিন্দুতে এসে মিলবে তখন অঙ্কিত রেখাচিত্রটি সম্পূর্ণ বৃত্তাকার হয়ে যাবে। আলপিন দুটি উপবৃত্তের দুই কেন্দ্র।

গ্রহ-নক্ষত্রদের উপবৃত্তাকার কক্ষপথেরও ঐরূপ দুটি কেন্দ্র। বৃহৎ ভরের জ্যোতিষ্ক যে কোন একটি কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে, স্বল্পতর ভরের জ্যোতিষ্ক উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি পরিক্রমণ করে তাকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যও ঐরূপ এক কেন্দ্রে আছে কাজেই কক্ষ ভ্রমণকালে গ্রহগণ একসময়ে সূর্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়—তারপর ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে পুনরায় নিকটে আসতে আরম্ভ করে। গ্রহরা সূর্যের সবচেয়ে নিকটস্থ হলে সেই অবস্থানকে বলে অনুসূর (Perihelion) আর সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানের নাম অপসূর (Aphelion)। পৃথিবী ও চন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঐরূপ, চন্দ্র যখন তার উপবৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে থাকে তখন সেই অবস্থান বিন্দুর নাম অনুভূ (Perigee) আর দূরতম অবস্থানের নাম অপভূ (Apogee)। সূর্যের চতুর্দিকে বুধ, মঙ্গল ও প্লুটোর কক্ষ বেশ উপবৃত্তাকার, অন্যান্য সকল গ্রহের কক্ষ এত সামান্য উপবৃত্তাকার যে, প্রায় বৃত্তাকার বলা চলে। সূর্যের চারদিকে ধূমকেতুদের কক্ষ সাধারণত দীর্ঘ উপবৃত্ত।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবী

বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার পর মানুষ তার দৃশ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণিপূর্ণ বাসভূমির নাম দিল পৃথিবী, নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপের নাম দিল আকাশ। সে দেখলো দিগন্ত রেখায় পৃথিবী শেষ হয়ে আকাশ আরম্ভ হয়েছে। তার ধারণা হলো পৃথিবী চ্যাপ্‌টা থালার মতো সমতল ভূমি।

তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার সূত্রপাত হলো, সর্বাগ্রে—ভারত, চীন, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে। এ সব আদি সভ্যতার দেশের মানুষ চন্দ্র, সূর্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক জ্যোতিষ্কের সঙ্গে পরিচিত হলো। গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভেদ বুঝলো। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে তারা গ্রহরূপেই চিনলো। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও গতিবিধি নিয়ে সেই আদি যুগে মানুষ যে সকল কাল্পনিক আখ্যান রচনা করেছিল সে সব লিপিবদ্ধ আছে হিন্দু পুরাণে, মিশরীয়, আসিরীয় ও গ্রীসীয় পুরাণে। গল্পগুলি ভারী সুন্দর, জ্যোতিষ্কদেরই কথা রহস্যের অন্তরালে বিবৃত। অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয় জ্যোতিষীরা জানতেন পৃথিবী একটি নিরাধার গোলক।

৬।৭ হাজার বছর পূর্বেকার বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় আচার্যদের জ্যোতিষ চর্চা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রভূত উন্নতিও হয়েছে। যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ এমন অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন যেগুলি পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্র সাহায্যে আবার নূতন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুর জ্যোতির্বিদ্যা পাশ্চাত্য দেশে স্বীকৃতি পায় নি। এ অবহেলার কারণ ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর ভারতে গণিত-জ্যোতিষের উন্নতি স্তব্ধ হয়ে গেল, বোধ হয় উপযুক্ত ধারক ও বাহকের অভাবে। কিন্তু ফলিত-জ্যোতিষের চর্চা লোপ পেল না। ফলিত জ্যোতিষের জন্যে যতটুকু গণিত-জ্যোতিষ প্রয়োজন এবং পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্যে যতটুকু আবশ্যক, তার ব্যবহার অবশ্য আজও আছে।

ইতিমধ্যে গ্রীস থেকে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম ইউরোপে জ্যোতিষের চর্চা ছড়িয়ে পড়ছিলো। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর পশ্চিম ইউরোপে মানযন্ত্রের ব্যবহার সহযোগে জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিলো। যন্ত্র-যুগের প্রারম্ভ থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রমবর্ধমান গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে বিগত ৬০।৬৫ বছরে জ্যোতির্বিদ্যার যে উন্নতি হয়েছে পূর্বেকার কয়েক শতাব্দীর সমষ্টিগত উন্নতিও তার তুলনায় নগণ্য। পাশ্চাত্য দেশসমূহে জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের ধারার কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক নয়।

আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সে যুগে পৃথিবীকেই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র মনে করে চিন্তা সুরু করেছিল, তারই জের চললো অনেক দিন। প্রাচীন পণ্ডিতদের ধারণা হয়েছিল চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রসমন্বিত নভোমণ্ডল এক দিন-রাত্রির মধ্যে পৃথিবীকে
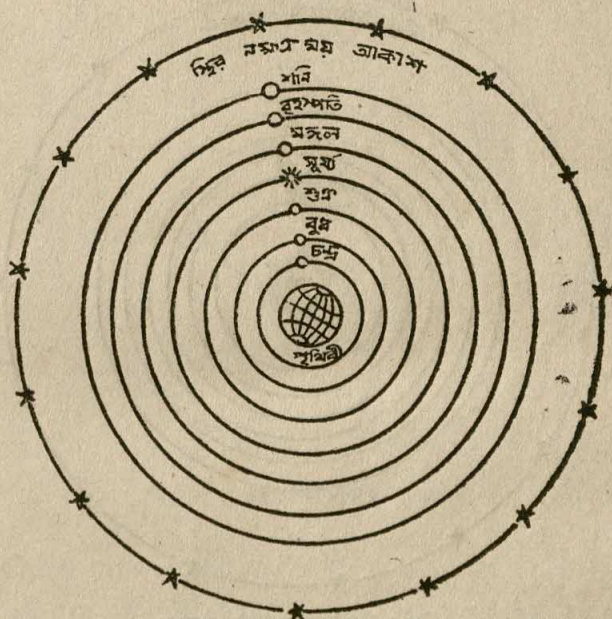
চিত্র-২—টলেমীর সৌরজগৎ

একবার প্রদক্ষিণ করছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী (Ptolemy) গ্রীস দেশে আকাশের যে চিত্র দিলেন তার কেন্দ্রে রইলো স্থির পৃথিবী, তার পরে

ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রগণ অবস্থিত, এরা সকলে দিনরাত্রে একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসছে (চিত্র-২)।

বারো শত বছর ব্রহ্মাণ্ডের এই চিত্রই মানুষের মনে বাসা বেঁধে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ডের বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ভাবলেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রগণ এতদূর থেকে এমন সুদীর্ঘ পথে প্রত্যহ একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসবে, এটা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন আকাশে সূর্য একস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত আছে, পৃথিবী প্রত্যহ একবার লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে আর সেজন্যেই আকাশের সকল জ্যোতিষ্ককে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে দেখা যায়। এইভাবে পাক খেতে খেতে পৃথিবী এক বৃত্তাকার পথে অগ্রসর হয়ে নিয়মিত গতিতে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসছে। অন্যান্য গ্রহরাও বৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং

চিত্র-৩—কোপারনিকাসের সৌরজগৎ
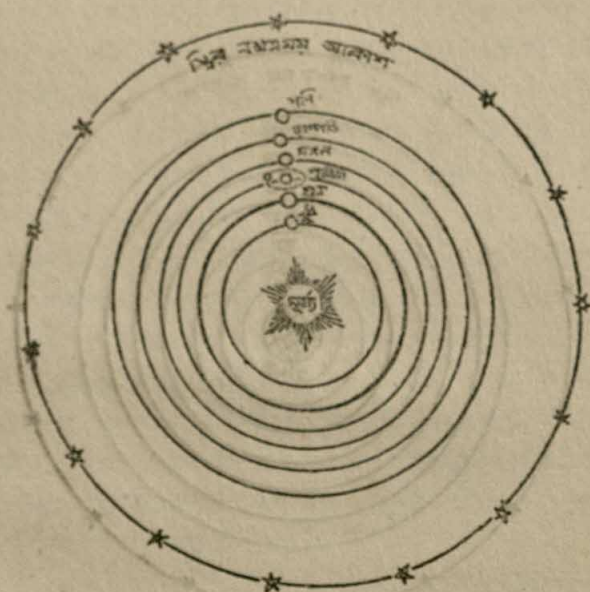
নক্ষত্রগণ সুদূর গগনে সূর্যের ন্যায় স্থির। কিন্তু তখনকার দিনে পৃথিবীকে কেন্দ্রচ্যুত করা ধর্ম-বিরোধী ছিল বলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল গোপন রেখে

মৃত্যুর পূর্বে স্বরচিত পুস্তকে তা প্রকাশ করে যান। সে যুগের বিজ্ঞানীরা এ মতবাদের তেমন কোন গুরুত্ব দেন নি (চিত্র-৩)।

এর পর টাইকোব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) বললেন সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করেছে বটে কিন্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। প্রদক্ষিণরত জ্যোতিষ্কদের প্রত্যেকেরই গতিপথ বৃত্তাকার। এই ধারণা অনুসারে গণনা করলেও গ্রহগণের গতিবিধি ইত্যাদির মোটামুটি নির্ভুল হিসেব পাওয়া যায়। কাজেই পণ্ডিতেরা এ মত অগ্রাহ্য করেন নি (চিত্র-৪)।
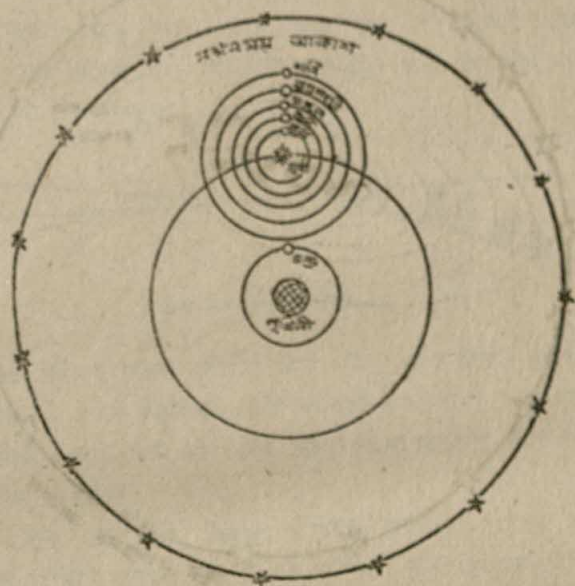
চিত্র-৪—টাইকোব্রাহের সৌরজগৎ

ইটালীয় পণ্ডিত গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) নিজের তৈরী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে গ্রহগণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, পৃথিবী ও গ্রহগণ সকলেই সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে অর্থাৎ কোপারনিকাসের মতবাদই পুনরুজ্জীবিত হলো। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এক পুস্তকে গ্যালিলিও তাঁর ঐ মতবাদ প্রকাশ করলেন। ধর্ম-বিরোধী শিক্ষা প্রচারের অভিযোগে তাঁকে

বিচারালয়ে যেতে হলো এবং উক্ত মতবাদ অস্বীকার করে তাঁকে প্রাণদণ্ডের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলো।

সূর্যের চারদিকে গ্রহদের কক্ষপথ বৃত্তাকার ধরে নিয়ে হিসেব করলে তাদের গতিবেগে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। টাইকোব্রাহের শিষ্য কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০) আবিষ্কার করেন ঐ পথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে সূর্যের অবস্থান, আর যখন কক্ষপথে গ্রহগণ সূর্যের নিকটস্থ হয় তখন তাদের গতিবেগ কিছুটা বৃদ্ধি পায় (চিত্র-৫)।
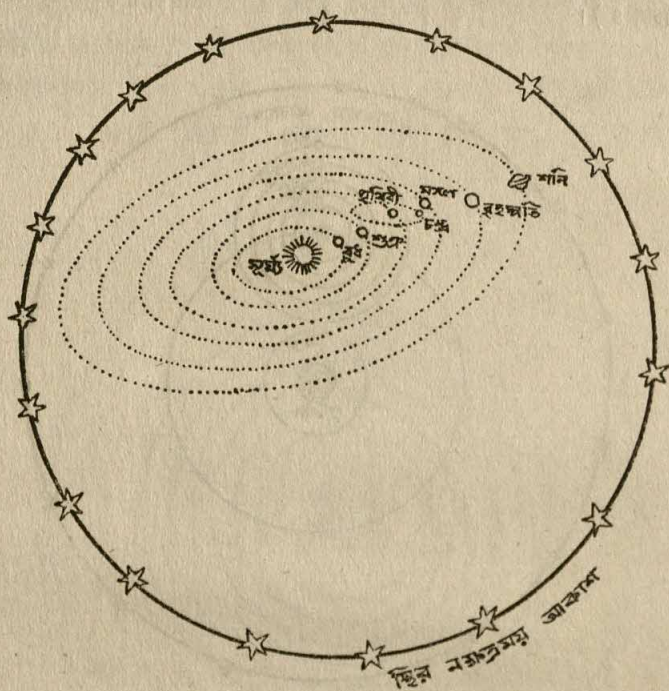
চিত্র-৫—কেপ্‌লারের সৌরজগৎ

অবশেষে নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) আবিষ্কার করেন মহাকর্ষশক্তি ও তার নিয়মকানুন। এর ফলে গ্রহগণের গতিবিধির যাবতীয় হিসেব নির্ভুল হয়ে গেল। সকল তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটলো। এখন আর কোন প্রশ্নই থাকলো না যে, পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহরা আপন আপন উপবৃত্তাকার কক্ষে সূর্যের চতুর্দিকে পথ পরিক্রমা করে এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের দেহমধ্যস্থ কোনও অক্ষ অবলম্বনে লাটিমের মতো পাক খায়।

পৃথিবী গোলাকার

অতি প্রাচীন কালে মানুষ ভেবেছিল পৃথিবী এক অসীম সমতল ক্ষেত্র। দীর্ঘকাল পূর্বেই তার সে ভুল ভেঙ্গেছে। তখন থেকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী গোলাকার,—বৃহৎ গোলকের স্বল্পাংশের উপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে বলে পৃথিবীকে তার সমতল মনে হয়। সাধারণ বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণেই সে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতির অকাট্য প্রমাণ পায়। যেমন—

(১) বন্দরে জাহাজ আসছে—তার মাস্তুল ও চোঙ আগে চোখে পড়ে। যত এগিয়ে আসে ক্রমে ক্রমে তার পেট ও খোল দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাজটির মাস্তুল থেকে আরম্ভ করে তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেহটি একটু একটু করে তার দৃষ্টিপথে এল। পৃথিবী সমতল হলে তার উপর-নীচ সবটা এক সঙ্গেই দেখা যেত (চিত্র-৬)।
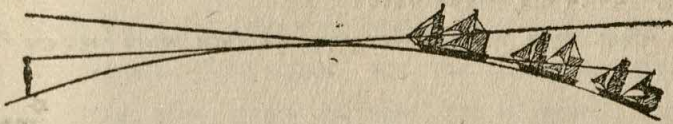
চিত্র-৬—বন্দরাভিমুখী জাহাজ

(২) চন্দ্র গ্রহণের সময়ে পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রের উপর। এ ছায়া সর্বদাই বৃত্তাকার। গোল জিনিষের ছায়াই সর্বাবস্থায় বৃত্তাকার। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে ছায়াটাও অবশ্যই কোন না কোন সময়ে বৃত্ত না হয়ে অন্য রকম কিছু হতো। কিন্তু তা হয় না।

(৩) এখানে এখন সূর্য উঠলো, পশ্চিমস্থ জায়গায় সূর্যোদয় হবে পরে, আরও পশ্চিমে আরও পরে। যত পশ্চিমে তত দেরীতে—পৃথিবী গোল বলেই এমনটা হয়, চ্যাপ্টা সমতল হলে পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গা থেকেই এক সঙ্গে সূর্যোদয় দেখা যেত।

পৃথিবীর বর্তুলাকৃতির আরও অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে।

সমুদ্র যদি পুকুরের মতো শান্ত থাকতো তাহলে তার পিঠে চোখ রেখে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যেত দৃষ্টিরেখা ও সমুদ্র-পৃষ্ঠ কিছু দূর একসঙ্গে থেকে তারপর সমুদ্র-পৃষ্ঠ যেন ক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছে। বস্তুত এক মাইল

দূরে সমুদ্র-পৃষ্ঠ দৃষ্টিরেখা থেকে আট ইঞ্চি নীচে নেমে যায়। দু-মাইল দূরে সমুদ্র-পৃষ্ঠ দৃষ্টিরেখা থেকে $২^২ \times ৮ = ৩২$ ইঞ্চি নীচে নামে, তিন মাইল দূরে $৩^২ \times ৮ = ৭২$ ইঞ্চি নীচে নামে। এই রকম আট মাইল দূরে সমুদ্র-পৃষ্ঠ দৃষ্টি সমতল থেকে ৫১২ ইঞ্চি নীচে নামে। ভূপৃষ্ঠ বক্র বলেই সমুদ্র-পৃষ্ঠের এই বক্রতা হয়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি ও আয়তনাদি

প্রদক্ষিণ ও আবর্তন শব্দ দুটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বহিঃস্থিত কোন কেন্দ্রের চারদিকে যদি কোন বস্তু ঘোরে তবে তার নাম প্রদক্ষিণ। যেমন, একটি গাছের চারদিকে কোন ছেলে হাঁটছে, এখানে কেন্দ্রীয় গাছটিকে ছেলেটি প্রদক্ষিণ করছে। নিজ দেহ মধ্যস্থ কোনও অক্ষের চারদিকে যদি বস্তুটি ঘোরে তবে তার নাম আবর্তন। লাট্টু তার নিজের দেহাভ্যন্তরের এক অক্ষের বা মেরুদণ্ডের চারদিকে পাক খায়,—এখানে লাট্টু আবর্তন করছে।

পৃথিবী সূর্যের সম্মুখে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আপন দেহমধ্যস্থ বিশেষ
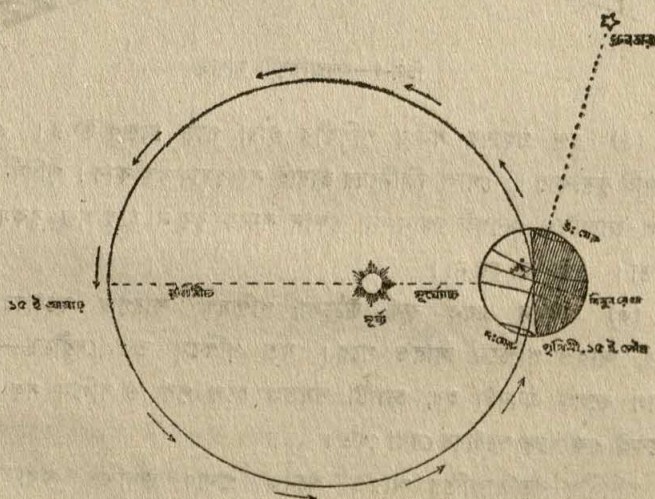
চিত্র-৭—পৃথিবীর বার্ষিক গতি

এক অক্ষ বা মেরুদণ্ড অবলম্বনে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। একবার পূর্ণ আবর্তন কালের নাম দিন। সূর্যের সম্মুখে পৃথিবীর একার্ধ আলোকিত,

তাকে বলে দিবাভাগ ; অপরার্ধ অন্ধকার—তাকে বলে রাত্রি। পূর্ণ আবর্তন কালের একার্ধ দিবা অপরার্ধ রাত্রি। দিবাভাগকে আমরা অনেক সময়ে দিনই বলি। সূর্যের সম্মুখে দৈনিক একবার আবর্তনকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলা হয়।

সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি একবার পরিভ্রমণ করে আসতে পৃথিবীর ৩৬৫¼ দিন অতিবাহিত হয়। সূর্যের চারদিকে এইরূপ একবার পূর্ণ-প্রদক্ষিণ কালকে বৎসর বলে। ৩৬৫¼ দিনে পৃথিবীর এক বৎসর বা চলিত কথায় বছর। কক্ষপথে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণের নাম পৃথিবীর বার্ষিক গতি। পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় উনিশ মাইল পথ পশ্চিম থেকে পূর্বে অগ্রসর হয় (চিত্র-১)।

নিকটতম অবস্থায় সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধান ৯ কোটি ১৪ লক্ষ মাইল, দূরতম অবস্থায় তাদের মধ্যে ব্যবধান ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল ধরা হয়।

পৃথিবী বর্তুলাকৃতি হলেও সম্পূর্ণ বর্তুল নয়—উত্তর ও দক্ষিণে ঈষৎ চাপা। যে অক্ষ অবলম্বনে পৃথিবী আবর্তন করে তার উত্তর প্রান্তের নাম উত্তর মেরু বা সুমেরু, দক্ষিণ প্রান্তের নাম দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। আবর্তনের ফলে দুই মেরু অঞ্চল কিছুটা চেপে গিয়ে পৃথিবীর পেট বা বিষুব প্রদেশ একটু ফুলে উঠেছে। এজন্যে বিষুব বৃত্তে পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা তার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান কম। বিষুব বৃত্তে ব্যাস ৭৯২৬ মাইল ও মেরুদ্বয়ে ব্যাস ৭৯০০ মাইল অর্থাৎ দুই ব্যাসে ২৬ মাইল তফাৎ। বিষুব বৃত্তে পৃথিবীর পরিধি ২৪৯০০ মাইল এবং এখানে ব্যাসার্ধ ৩৯৬৩ মাইল কিন্তু সাধারণ আলোচনায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৪০০০ মাইল এবং পরিধি ২৫০০০ মাইল বলা হয়।

বিষুব বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে অক্ষাংশের গণনা সুরু হয়। বিষুব বৃত্তের অক্ষাংশ শূন্য। এজন্যে বিষুববৃত্তের অপর নাম নিরক্ষবৃত্ত। নিরক্ষবৃত্ত থেকে ক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে অক্ষাংশ বাড়তে থাকে, সুমেরুতে গিয়ে হয় ৯০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ ও দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে হয় ৯০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ। নিরক্ষবৃত্তের পরিধি ২৫০০০ মাইল। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। অতএব নিরক্ষবৃত্তের মানুষ ২৪ ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় তার গতিবেগ এক হাজার মাইলেরও বেশী

(চিত্র-৮) অথচ যে লোক মেরুবিন্দুতে আছে সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা পাক খেল, এক ইঞ্চিও অগ্রসর হলো না অর্থাৎ তার কোন গতিবেগ নেই। সুতরাং নিরক্ষ অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের অন্তর্বর্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠের গতিবেগ ঐ
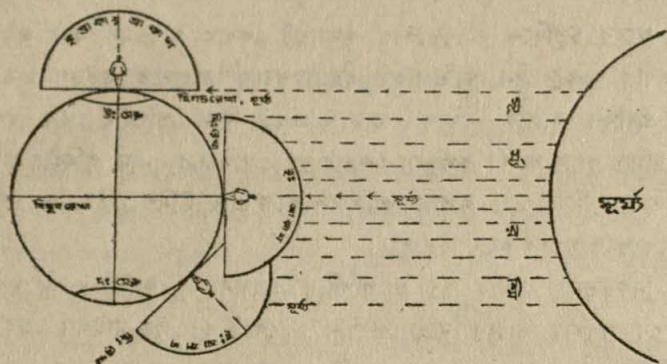
চিত্র-৮—পৃথিবীর আকাশে সূর্য

সহস্রাধিক মাইল থেকে আরম্ভ করে 0 এর মধ্যে। অক্ষাংশ যত বেশী তথাকার বৃত্ত-পরিধি তত কম, অতএব প্রতি ঘণ্টায় সে স্থান তত কম দূরত্ব পরিভ্রমণ করে। কলকাতার অক্ষাংশ ২২°৩০ ডিগ্রী উত্তর,—সেজন্যে কলকাতা প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনাধিক ৭৫০ মাইল পথ চলে।

পৃথিবীর আবহাওয়া ও ঋতু

পৃথিবী যে কক্ষে সূর্য প্রদক্ষিণ করে সেই পথের নাম ক্রান্তিবৃত্ত। পৃথিবীর কেন্দ্র ও সূর্যের কেন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের সমতলে অবস্থিত। ক্রান্তিবৃত্ত নাম হলেও পথটি একেবারে বৃত্তাকার নয়, সামান্য উপবৃত্তাকার—একথা আগেই বলা হয়েছে। পৃথিবীকে আমরা নিশ্চল মনে করি তাই সূর্যকেই ঐ পথে ভূপ্রদক্ষিণ করতে দেখি। এজন্যে ক্রান্তিবৃত্তকে রবিমার্গও বলা হয়।

ঐ উপবৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে সূর্যের অবস্থান। কাজেই কক্ষভ্রমণ কালে এক সময়ে পৃথিবী সূর্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে আসে। সে সময়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যকে ঈষৎ বৃহত্তর দেখায়। পৃথিবীর ভ্রমণবেগও একটু বৃদ্ধি পায়। ছয় মাস পর এর বিপরীত অবস্থা। ৩১শে ডিসেম্বর পৃথিবী সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে আসে, এ দিনটিকে অনুসূর (Perihelion) বলে। ১লা জুলাই

পৃথিবী সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকে, এ দিনটিকে অপসূর (Aphelion) বলে (চিত্র-৭)।

ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের উপর পৃথিবীর অক্ষ ঠিক সমকোণে দাঁড়িয়ে নেই, অক্ষটি ৬৬½ ডিগ্রী কোণ করে হেলে রয়েছে। এজন্যে পৃথিবীর উত্তর মেরু সর্বদাই ধ্রুবতারার দিকে নির্দিষ্ট থাকে। সমকোণে দাঁড়িয়ে থাকলে পৃথিবীর যে স্থানে যে রকমের আবহাওয়া তার আর কোনও পরিবর্তন হতো না, সারা বছর একই প্রকার থাকতো। সে ক্ষেত্রে সারা বছর বিষুব অঞ্চলে গরমের প্রচণ্ডতা কমতো না, মেরু অঞ্চলে শৈত্যের তাপমাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো না, মধ্যবর্তী অঞ্চলে একই প্রকার শীতাতপ চিরস্থায়ী হতো। অক্ষ হেলে রয়েছে বলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন সম্ভব হয়।

দিবাভাগকে আমরা নানা অংশে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। বলি সকাল, দুপুর, বিকাল, সাধু বাংলায় পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ। রাত্রি গিয়ে দিবা আসে সেই সন্ধিক্ষণের নাম উষা, দিবা শেষ হয়ে রাত্রি আগমনের সন্ধিক্ষণকে বলি সন্ধ্যা। সূর্যাস্তের পরও কিছু সময় পৃথিবী ম্লান আলোকিত থাকে—তাকে বলা হয় গোধূলি কাল। আবার এক দিনের সঙ্গে অন্য দিনের তফাৎ থাকে। কোন দিন হয়তো মেঘলা, কোন দিন সূর্য-করোজ্জ্বল, কোন দিন কুয়াসাচ্ছন্ন, কোন দিন বা বর্ষণমুখর। বছরকে আমরা বারোটি মাসে ভাগ করি রাশি নক্ষত্র অনুসারে। আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বছরের আবার প্রাকৃতিক বিভাগও আছে তাদের ঋতু বলা হয়। ঋতু প্রধানত চারটি—গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত। প্রতি ঋতু প্রায় তিন মাস কালব্যাপী। বাংলা দেশে আমরা আরও দুটি ঋতু গণনা করে থাকি এবং প্রতি ঋতুর ব্যাপ্তি ধরি দু মাস। গ্রীষ্মের শেষাংশকে বলি বর্ষা, শীতের প্রারম্ভকে বলি হেমন্ত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দু-মাস গ্রীষ্ম, আষাঢ় শ্রাবণ দু-মাস বর্ষা, ভাদ্র আশ্বিন দু-মাস শরৎ, কার্তিক অগ্রহায়ণ দু-মাস হেমন্ত, পৌষ মাঘ দু-মাস শীত, এবং ফাল্গুন চৈত্র দু-মাস বসন্ত ঋতু।

পৃথিবী তাপ ও আলোক পায় সূর্যরশ্মি থেকে। ভূপৃষ্ঠের যে জায়গা যখন সূর্যালোক পায় তখন সে জায়গায় দিন, সূর্যালোক না থাকলেই রাত্রি। আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাপও পাওয়া যায় দিনের বেলায়, রাত্রি বেলায় পাওয়া যায় না। কাজেই রাত্রি অপেক্ষা দিন গরম।

সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। এ সময়ে

বায়ুমণ্ডল সূর্যরশ্মি থেকে কিছু তাপ শোষণ করে রেখে দেয়। কাজেই বায়ুস্তর যত গভীর তত বেশী তাপ শোষিত হয়।

সকাল ও বিকালের চেয়ে দুপুর গরম। তার কারণ, প্রথমত, দুপুরে সূর্য মাথার উপরে থাকে। এই সময়ে সূর্যরশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের যত গভীরতা ভেদ করে আসতে হয় তার চেয়ে বেশী বায়ুস্তর ভেদ করতে হয় সকালে ও বিকালে। কাজেই সকাল বিকালের চেয়ে দুপুরের তাপমাত্রা বেশী। দ্বিতীয়ত, দুপুরে সূর্য মাথার উপর থাকে বলে সূর্যরশ্মি ভূপৃষ্ঠে পড়ে লম্বভাবে এবং সকাল বিকালে পড়ে তির্যক ভাবে। কাজেই দুপুরে যতগুলি রশ্মি যতখানি বর্গক্ষেত্রে পড়ে, সকাল বিকালে ঠিক ততগুলি রশ্মি তার চেয়ে বেশী বর্গক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। একই পরিমাণ তাপ বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ায় সকাল বিকালের তাপমাত্রা দুপুরের চেয়ে কম (চিত্র-৯)।
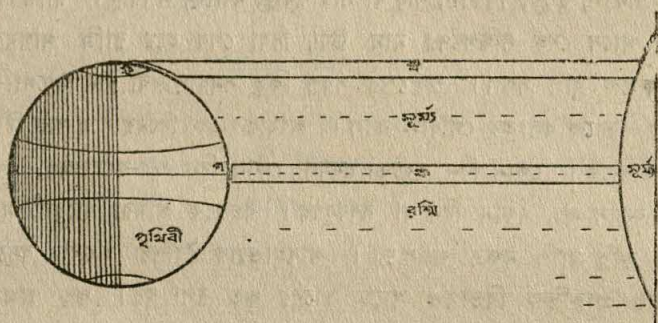
চিত্র-৯—সূর্যের লম্বরশ্মি ও তির্যকরশ্মি

মেরু অঞ্চল অপেক্ষা বিষুব প্রদেশ গরম। এরও কারণ ঠিক ঐ দুটি। সূর্য থেকে বিষুব অঞ্চল যত দূর, মেরু অঞ্চল তার চেয়ে বেশী দূর। কাজেই মেরু অঞ্চলে সূর্যরশ্মি পৌঁছাতে গভীরতর বায়ুস্তর ভেদ করতে হয়। এজন্য বিষুব প্রদেশ অপেক্ষা মেরু প্রদেশ কম তাপ পায়। আবার নিরক্ষ অঞ্চলে লম্বভাবে সূর্যরশ্মি পড়ে, মেরু অঞ্চলে পড়ে তির্যক ভাবে, কাজেই সমপরিমাণ তাপ মেরু প্রদেশে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ায় তথাকার তাপমাত্রা নিরক্ষ অঞ্চলের তুলনায় অনেক কমে যায়। বস্তুত মেরু এত কম তাপ পায় যে তথায় সারা বছরই বরফ জমে থাকে (চিত্র-৯)।

ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের উপর পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুদণ্ড ৬৬½ ডিগ্রী কোণ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মানে পৃথিবীর বিষুব সমতল ক্রান্তিবৃত্তের

সমতলের সঙ্গে ২৩½ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে পরস্পরকে ছেদ করছে। এই ব্যাপারটা প্রতিভাত হয় আকাশে সূর্যের আপাত গতিবিধি লক্ষ্য করলে। দেখা যায় সূর্য পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের অবস্থান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে খানিকটা করে পরিভ্রমণ করে।

মধ্যাহ্ন সূর্য নিরক্ষবৃত্তের মাথার উপর থেকে একটু একটু করে সরে তিন মাস পরে ২৩½ ডিগ্রী উত্তর-অক্ষাংশের মাথার উপর যায়, তারপর দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণমুখী চলতে আরম্ভ করে। তিন মাস পরে আবার নিরক্ষবৃত্তের উপর আসে। দক্ষিণে অভিযান এখানেই শেষ নয়, তিন মাস পরে সূর্য গিয়ে উপস্থিত হয় ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণ-অক্ষাংশের মাথার উপর। এখন আবার দিক পরিবর্তন করে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে সূর্য আরও তিন মাস পরে নিরক্ষবৃত্তের উপর যাত্রাকালীন স্থানে এলে তার বারো মাসের ভ্রমণ-চক্র শেষ হয়। অবস্থাটা পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উদয়বিন্দুর প্রতি লক্ষ্য রাখলেও দেখা যায়। দেখা যাবে প্রত্যহ একই বিন্দুতে সূর্যোদয় হয় না। নিরক্ষবৃত্তের উপর যেদিন থাকে সেদিন উদয়কালে সূর্য দিগন্তের ঠিক পূর্ব বিন্দুতে অবস্থিত। ঐ বিন্দু থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে ২৩½ ডিগ্রী পর্যন্ত সীমিত স্থান উদয়বিন্দুটি সারা বছরে যাতায়াত করে। যাত্রাকালীন স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেই সূর্যের বর্ষ-চক্র শেষ হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে সূর্য বছরের ছয় মাস নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে অর্থাৎ পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে এবং বাকী ছয় মাস নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে থাকে। ২৩½ ডিগ্রী উত্তর-অক্ষাংশ থেকে ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণ-অক্ষাংশ পর্যন্ত যেতে সূর্যের ছয় মাস লাগে, এই সময়টাকে সূর্যের দক্ষিণায়ন বলে। ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণ-অক্ষাংশ থেকে আরম্ভ করে ২৩½ ডিগ্রী উত্তর-অক্ষাংশ পর্যন্ত সূর্যের উত্তরাভিযানেও লাগে ছয় মাস, এই ছয় মাসকে সূর্যের উত্তরায়ণ বলে।

২১শে মার্চ (৭।৮ চৈত্র) পৃথিবী কক্ষের উপর ক-চিহ্নিত স্থানে আসে (চিত্র-১০)। সূর্যের রশ্মি সেদিন বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে পড়ে এবং পৃথিবীর সর্বাংশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বারো ঘণ্টা আলোকিত হয়, বারো ঘণ্টা অন্ধকারে থাকে। সেদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা রাত্রি সমান। তখন বসন্ত কাল, পৃথিবীর সকল স্থানে প্রায় নাতিশীতোষ্ণ তাপ। ঐ তারিখের পর দিন থেকে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে ক্রমশ উত্তর দিকে। এজন্যে উত্তর

গোলার্ধে দিবাভাগ ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে এবং গ্রীষ্মও বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ গোলার্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অন্ধকারে থাকে, সেখানে রাত্রিকাল হয়ে
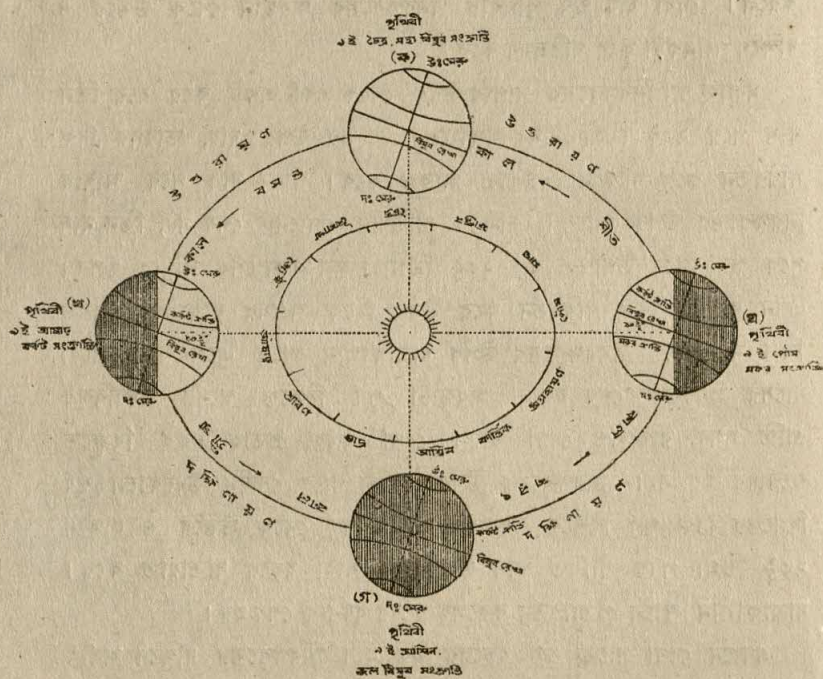
চিত্র-১০—ঋতু পরিবর্তন

পড়ে দিবসের চেয়ে দীর্ঘতর। এইরূপে তিন মাস চলে ২১শে জুন (৬।৭ আষাঢ়) পৃথিবী খ-চিহ্নিত স্থানে আসে। সূর্যরশ্মি সেদিন লম্বভাবে যে অক্ষাংশের উপর পড়ে ভূপৃষ্ঠের সেই কল্পিত বৃত্তের নাম কর্কটক্রান্তি। এই অক্ষাংশ বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে। চিত্র থেকেই বোঝা যাবে উত্তর গোলার্ধে রজনী অপেক্ষা দিবা দীর্ঘতর। উত্তর গোলার্ধে এখন গ্রীষ্মকাল। ৬৬½ ডিগ্রী অক্ষাংশের উত্তরে মেরুসন্নিহিত স্থান সর্বদাই সূর্যালোকে থাকে— সেখানে প্রায় ছয় মাস ব্যাপী দীর্ঘ দিবাভাগ হয়। বাংলা দেশে প্রায় ১৪ ঘণ্টা দিবা ও ১০ ঘণ্টা রাত্রি কাল। ইংলণ্ডে প্রায় ১৭ ঘণ্টা দিবাভাগ ও ৭ ঘণ্টা রাত্রি। উত্তর গোলার্ধে ২১শে জুন তারিখে দিবাভাগ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ।

২১শে জুনের পর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে সরতে থাকে।

এখন সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হলো। তিন মাস পরে ২২শে সেপ্টেম্বর (৬।৭ আশ্বিন) পৃথিবী গ চিহ্নিত স্থানে এলে সূর্যরশ্মি আবার নিরক্ষ-বৃত্তের উপর লম্বভাবে পড়ে। এদিন দিবা ও রাত্রি আবার সমান হয়, পৃথিবী নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় আসে। এখন উত্তর গোলার্ধে শরৎ ঋতু, দক্ষিণে বসন্ত।

এর তিন মাস পর ২২শে ডিসেম্বর (৬।৭ পৌষ) পৃথিবী ঘ চিহ্নিত স্থানে আসে। সেদিন যে অক্ষাংশে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে পৃথিবীর উপর সেই বৃত্তের নাম মকরক্রান্তি। সূর্যের দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে আজ উত্তরায়ণ সুরু হলো ছয় মাসের জন্যে। এখনকার সকল অবস্থা খ চিহ্নিত অবস্থার ঠিক বিপরীত। উত্তর গোলার্ধে শীতকাল, উত্তর মেরুর সন্নিকটে প্রায় ছয় মাসব্যাপী রাত্রি। বাংলা দেশে প্রায় দশ ঘণ্টা দিবা, চৌদ্দ ঘণ্টা রাত্রি ; ইংলণ্ডে সাত ঘণ্টা দিবা, সতের ঘণ্টা রাত্রি। দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ মেরুর নিকট প্রায় ছয় মাস দীর্ঘ দিবাভাগ।

উত্তরগামী সূর্য তিন মাস পর ২১শে মার্চ আবার ক চিহ্নিত স্থানে ফিরে আসে। বর্ষ-চক্রে এইভাবে পৃথিবী তার ভ্রমণ সমাপন করে।

২১শে মার্চ তারিখটিকে বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinox) ও ২২শে সেপ্টেম্বরকে শারদ বিষুব (Antumnal Equinox) বলা হয়। হিন্দু জ্যোতিষে ঐ বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে মহাবিষুব সংক্রান্তি ও জলবিষুব সংক্রান্তি নামে আখ্যাত। দক্ষিণায়নের আরম্ভ ২১শে জুন তারিখটিকে কর্কটক্রান্তি কিংবা দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি (Summer Solistice) এবং উত্তরায়ণের প্রারম্ভ দিন ২২শে ডিসেম্বরকে মকরক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (Winter Solistice) বলা হয়।

আমাদের দেশীয় পঞ্জিকায় ১লা বৈশাখ মহাবিষুব সংক্রান্তি, ১লা কার্তিক জলবিষুব সংক্রান্তি, ১লা শ্রাবণ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে উল্লেখিত থাকে। এক কালে ঐ তারিখগুলিই নির্ভুল ছিল, কিন্তু পৃথিবীর মেরু দোলনের দরুণ উক্ত প্রত্যেকটি তারিখই এখন ২২।২৩ দিন পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭।৮ চৈত্র, ৬।৭ আশ্বিন, ৬।৭ আষাঢ় ও ৬।৭ পৌষ। দেশীয় পঞ্জিকা দীর্ঘকাল অবস্থানুযায়ী সংশোধিত হয় নি বলেই প্রাচীন তারিখগুলি রয়ে গেছে।

পৃথিবীর গঠন-উপাদান

সূর্যের জন্মসময়ে তার চারদিকে ছিল অমিত পরিমাণ গাঢ় গ্যাস ও ধূলিকণার আবরণ অতি উচ্চ তাপমাত্রায়। সৌর তাপ এই মিশ্র গ্যাসকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিতে আরম্ভ করে এবং সে কারণে গ্যাস ও ধূলিকণার তাপমাত্রাও কমতে থাকে। প্রথমে সূর্যের নিকটস্থ অঞ্চলে উচ্চ-স্ফুটনাঙ্কের বস্তুগুলি ঘনীভূত হয়ে কঠিন কণায় রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে প্রধান হলো ধাতব অণু এবং নানাবিধ অণুর রাসায়নিক সংযোগে ও মিশ্রণে সৃষ্ট শিলা। তারপর সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের বস্তুসমূহ তরল ও কঠিনে রূপান্তর গ্রহণ করে। সূর্যের নিকটস্থ অঞ্চল বলতে বোঝায় সূর্যদেহ থেকে প্রায় চল্লিশ কোটি মাইল। এই অঞ্চলে ঘনীভবনের ফলে প্রাচুর্য হয়েছিল লৌহ ও পাথরের। এজন্যে এস্থানকে লৌহ-শিলা অঞ্চল বলা যেতে পারে। অবশ্য লৌহ ও শিলার গণ্ডী শুধু এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রকৃতপক্ষে সকল স্থানেই সর্ববিধ বস্তু অল্পবিস্তর বর্তমান থাকা সম্ভব। যে অঞ্চলে যে জাতীয় বস্তুর পরিমাণ বেশী সেই অঞ্চলকে সেই নাম দেওয়া হয়।

পৃথিবী লৌহ-শিলা অঞ্চলে গঠিত। এজন্যে পৃথিবীর গঠন উপাদান প্রধানত লৌহ ও পাথর। এ ছাড়া সর্ববিধ মৌলপদার্থ ও তাদের সংযোজন পৃথিবীতে যথেষ্টই আছে,—তবে লৌহ ও শিলার তুলনায় তাদের পরিমাণ নগণ্য।

ভূপৃষ্ঠের চেয়ে খনির মধ্যে তাপমাত্রা বেশী, যত বেশী গভীর তাপমাত্রাও তত বেশী। মাত্র দেড় মাইল নীচেকার ভূগর্ভে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ জলের স্ফুটনাঙ্কের সমান। কোন জল ঐ গভীরতায় গেলে বাষ্পীভূত হয়ে ছিদ্রপথে উপরে উঠে উষ্ণ প্রস্রবণাদির সৃষ্টি করে। ভূপৃষ্ঠের ৩০ মাইল নীচেকার তাপমাত্রা প্রায় ১৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপে অনেক প্রকারের পাথর গলে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষীরণে এইরূপ গভীরতা থেকেই গলিত প্রস্তরাদি লাভা আকারে বেরিয়ে আসে।

উপরকার পদার্থের চাপেই ভিতরে এই প্রকার তাপের উৎপত্তি। উপরের চাপ যত বেশী হবে ভিতরের তাপও তত বেশী হবে। ভূকেন্দ্রের উপর চতুর্দিক থেকেই চার হাজার মাইলব্যাপী ঘন সন্নিবিষ্ট ভারী পদার্থের চাপ সুতরাং ভূকেন্দ্রে তাপ কত প্রচণ্ড তা উপলব্ধিতে আনা যায় না।

ভূকেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে ২২০০ মাইল পর্যন্ত স্থানে উত্তাপের দরুণ

লোহ তরল অবস্থায় আছে (চিত্র-১১)। এই তরল লৌহের ঘনত্ব এত বেশী যে, ভূপৃষ্ঠের গলিত লৌহের সঙ্গে তুলনা করে তার ধারণা করা যাবে না। কেন্দ্রীয় এই লৌহ অষ্টির উপরের দিকে প্রায় ১৮০০ মাইল স্থান
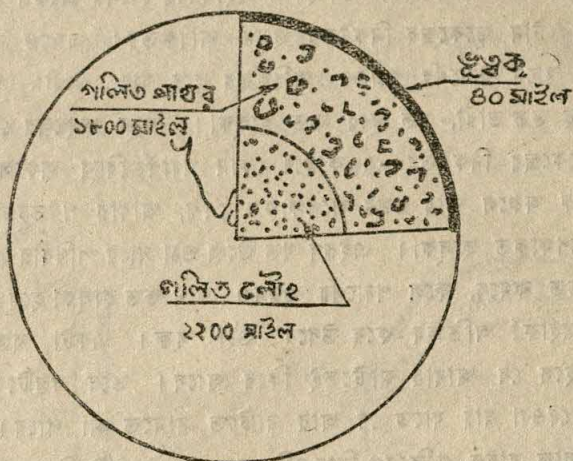
চিত্র-১১—ভূকেন্দ্র থেকে ভূত্বক পর্যন্ত পৃথিবীর গঠন বস্তু

গুরুশিলা, লোহা ও অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত, উত্তাপের দরুণ এ স্থানও কঠিন অবস্থায় নেই, অকঠিন পিচের (Pitch) সঙ্গে এর তুলনা হয়তো চলে। এই মণ্ডলের উপরে আছে ভূত্বক—মানুষ যার উপর বসবাস করছে। ভূত্বকের গভীরতা মাত্র ৪০ মাইল। ৪০ মাইলের এই স্তর প্রধানত ব্যাসাল্ট (Basalt) ও গ্রানাইট (Granite) দ্বারা গঠিত এবং সর্বোপরি আছে মাটি, বালি, জল প্রভৃতি। ধাতু উত্তাপে গালালে ধাতুমল বা গাদ উপরে ভেসে উঠে সরের ন্যায় জমে। ভূত্বকও সেইরূপ পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত পদার্থসমূহের গাদ, সরের ন্যায় ক্রমে শীতল হয়ে বর্তমানের কঠিন অবস্থায় এসেছে। ভারী এবং হাল্‌কা উভয়বিধ উপাদানে গঠিত পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ৫·৫ অর্থাৎ সমায়তন জলের চেয়ে পৃথিবী সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী।

পৃথিবীর মহাকর্ষ

সকল বস্তুতেই মহাকর্ষ শক্তি বর্তমান, প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপন আপন কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করছে। এই টানাটানিতে যার ভর বেশী তারই জয়, বাধা না থাকলে বৃহতের দিকে ক্ষুদ্র অধিকতর অপসৃত হয়।

বোঁটাছেড়া ফল সেখানেই নিশ্চল হয়ে থাকে না বা মহাশূন্যের দিকে উঠে যায় না, মাটিতে এসে পড়ে। মাটি বাধা না দিলে ভূকেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হতো। পদার্থ ভারী মনে হয় ঐ মহাকর্ষের টানের জন্যে। পৃথিবীর মহাকর্ষের টান ভূকেন্দ্রের নিকটতর স্থানে অধিকতর। এজন্যে ভূকেন্দ্রের নিকটতর স্থানে পদার্থের ওজনও অধিকতর হয়ে যায়; অর্থাৎ ভূকেন্দ্রের যত কাছে তত ভারী, যত দূরে তত হাল্‌কা। বিষুব অঞ্চলের চেয়ে মেরু অঞ্চল ভূকেন্দ্রের নিকটতর—এ কারণে কোন পদার্থ বিষুব অঞ্চলে যতটা ভারী, মেরু অঞ্চলে তার ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী, আবার পর্বতচূড়ায় তার ওজন অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। এইরূপ যত উর্ধ্বে ওঠা যাবে পৃথিবীর মহাকর্ষের প্রভাব তত কমবে, ফলে পদার্থের ওজনও ক্রমে তত হাল্‌কা হবে। কিন্তু পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করে উপরে ওঠা শক্ত। একটা বস্তু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলে সে আবার মাটিতেই ফিরে আসে। তবে বস্তুটিতে এমন গতিবেগ দেওয়া যায় যাতে সে আর মাটিতে নামতে না পারে। প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল গতিবেগ নিয়ে যদি কোন বস্তু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহলে সে আর ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে না, মহাশূন্যে চলে যাবে। একে বলা হয় প্রস্থান বেগ (Escape Velocity); অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে পদার্থের প্রস্থান বেগ ৭ মাইল বা ১১·২ কিলোমিটার। ভারী বা হাল্‌কা, ছোট বা বড়, কোন কিছুর উপরই পদার্থের প্রস্থান বেগ নির্ভর করে না, শুধু তার গতিটি প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল হলেই হলো।

পৃথিবীর আবহমণ্ডল

ভূপৃষ্ঠের উপরে আছে একটি আবহমণ্ডল। এই আবহমণ্ডলের উপাদান বায়ু। বায়ুর সঙ্গে মিশে আছে জলীয় বাষ্প, মহাশূন্য থেকে সমাগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা, ভূপৃষ্ঠ থেকে উত্থিত ধূলিকণা ইত্যাদি। কয়েকটি বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাসের মিশ্রণে বায়ুর সৃষ্টি।

বায়ুর গ্যাসে সাধারণত থাকে শতকরা ৭৫·৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ২৩·১ ভাগ অক্সিজেন, ০·৯ ভাগ আর্গন, ০·০৩ ভাগ আঙ্গারিক গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসের পরিমাণ যৎসামান্য। এ সকল গ্যাসের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি বায়ুতে অবশ্য সব সময়েই কিছু কিছু হচ্ছে তবে এটাই সাধারণ হিসেব। আবহ-মণ্ডলটি কয়েক শত মাইল গভীর। ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

বায়ুও অত্যন্ত হাল্‌কা হয়ে পড়ে। হাল্‌কা হতে হতে কোথায় গিয়ে যে বায়ু মহাশূন্যের গ্যাসের সঙ্গে এক হয়ে মিলিয়ে যায় তা বোঝা যায় না। ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪ পাউণ্ড।

ভূপৃষ্ঠের সাগরাদি থেকে জল বাষ্পরূপে বায়ুতে মেশে এবং এই জলীয় বাষ্পের কিছু অংশ ছয় মাইল উচ্চতা পর্যন্ত পরিবাহিত হতে পারে। তার উপরে আর কোনও আর্দ্রতা নেই, বায়ু একেবারে শুষ্ক। উষ্ণ বায়ু যত উপরে ওঠে তত প্রসারিত হয় এবং তার ফলে বায়ুর তাপমাত্রা ক্রমাগত
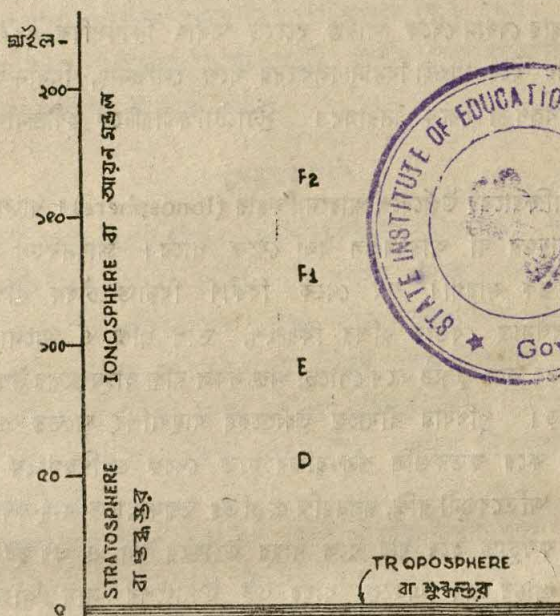
চিত্র-১২—আবহমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

কমতে থাকে। দেড় মাইল উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা জলের হিমাঙ্ক অর্থাৎ 0 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌছে, এ ভাবে কমতে কমতে ছয় মাইল উপরে গিয়ে বায়ুর তাপমাত্রা জলের হিমাঙ্কের ৭০।৭৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে নেমে যায়। এর পর প্রায় ৫০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত প্রায় ঐ একই তাপমাত্রা থেকে যায়। তার উপরে তাপমাত্রা আবার বাড়তে আরম্ভ করে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে প্রথম ছয় মাইল পর্যন্ত আবহমণ্ডলকে ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere) বলে। সম্পূর্ণ বায়ুর ভরের ৯০ ভাগ আছে এই স্তরে।

সূর্যতপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে উত্তপ্ত বায়ু উচ্চে পরিবাহিত হয়ে স্তরটিকে সর্বদাই বিক্ষুব্ধ রাখে। বিশ্ব-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ট্রপোস্ফিয়ারকে ক্ষুব্ধস্তর নামে আখ্যাত করেছেন। এখানেই মানুষের চিরপরিচিত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাত্যার উদ্ভব। এই-অংশেই হয় মেঘের উৎপত্তি, এখান থেকেই নামে বর্ষাধারা, তুষারপাত, শিলা-বৃষ্টি, এখানেই মানুষ দেখতে পায় মেঘ বিজলীর খেলা (চিত্র-১২)।

ছয় মাইল থেকে প্রায় ৪৫ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত স্থানের নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)। এখানে মেঘ নেই, ঝড়ঝঞ্ঝা নেই, উপরে নীল আকাশ। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩০০০০ ফুট উচ্চতা পার হয়ে যাওয়া বিমানচালকদের পক্ষে লোভনীয়, বিমান-যাত্রীরাও প্রকৃতির বিরূপতা থেকে নিরাপদ। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারটিকে রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধস্তর বলেছেন।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বদেশে আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere)। বাংলায় একে আয়নিত বায়ুস্তর বা আয়নমণ্ডল বলা যেতে পারে। আয়নমণ্ডল মানুষের পক্ষে মারাত্মক জায়গা। সূর্য থেকে বিকীর্ণ বিদ্যুত-চৌম্বক রশ্মিসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র বেতার রশ্মির কিয়দংশ, তাপ রশ্মি ও আলোক রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছে, অন্য সকল রশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে আটক পড়ে। পৃথিবীর সীমান্তে ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুরাশিই অভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে কতকগুলি শত্রু-রশ্মির হাত থেকে প্রাণিজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি প্রভৃতির তরঙ্গাঘাতে বায়ু-কণা থেকে ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে যায় বলে বায়ুর ঊর্ধ্বস্তরে ধন ও ঋণ দুই প্রকার আয়নেরই প্রাচুর্য এবং এজন্যে বায়ুর এই ঊর্ধ্বাংশের নাম আয়নমণ্ডল। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়নমণ্ডল প্রধানত চারিটি স্তরে বিভক্ত—D, E, F_1, F_2 এই চারিটি ইংরেজী অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত। এদের উপরে আরও দুইটি স্তরের অস্তিত্ব জানা গেছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে G ও H। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০ মাইল উচ্চতায় D স্তরটির অবস্থান, শুধু দিনের বেলায় এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। E স্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০ মাইল উচ্চে। E স্তরটি খুব সুস্থির এবং এখানে আয়নিত কণার সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বেশী। পরবর্তী F_1 স্তরটি আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২০ মাইল উচ্চতায়। সর্বোপরি F_2 স্তরটি ভূপৃষ্ঠের উপর ১৫০ থেকে ২৫০ মাইল উচ্চতায় অবস্থিত। এই স্তর সবচেয়ে অস্থির, এখানে আয়নিত কণার সংখ্যাও প্রচুর। শীতকালে ও

গ্রীষ্মের রাত্রে F_1 ও F_2 স্তরদ্বয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, উভয়ে একসঙ্গে মিশে যায়। আয়নমণ্ডলের প্রকৃতি নির্ধারণে ও বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন তথ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র ও সত্যেন বসুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।

বেতারের হ্রস্ব-তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। ভূপৃষ্ঠে প্রতিহত হয়ে আবার আয়নমণ্ডলে যায়, সেখান থেকে আবার ভূপৃষ্ঠে আসে আবার যায়, এভাবে প্রচুর শক্তিসম্পন্ন বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বেতারের হ্রস্ব-তরঙ্গ বহুদূর পর্যন্ত বাহিত হয়ে যেতে পারে। কলকাতায় বসে যাঁরা লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো প্রভৃতি বেতার কেন্দ্র ধরেন তাঁদের কাছে বেতার-তরঙ্গ ঐ ভাবেই এসে পৌছায়।

মেরুজ্যোতি

পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। চুম্বক-দণ্ডের যেমন উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরু আছে, পৃথিবীরও তেমনি ছুইটি চৌম্বক-মেরু আছে। পৃথিবীর উত্তর-চৌম্বক মেরু ও দক্ষিণ-চৌম্বক মেরু তার ভৌগোলিক মেরুদ্বয় থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। চুম্বক-দণ্ডের চৌম্বক ক্ষেত্র লোহাচুড়ের সাহায্যে দেখতে গেলে দণ্ডের ছুই মেরুর মধ্যে বহু বঙ্কিম বলরেখার (Line of force) বিন্যাস ঘটে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রও ঠিক তদনুরূপ ছুই মেরুর মধ্যে বঙ্কিম বলরেখায় বিন্যস্ত।

আয়নমণ্ডলের উর্ধ্বে পৃথিবীর বিরল বায়ুস্তর ক্রমশ শূন্যে গিয়ে বিলীন হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে এ স্থান উচ্চতায় প্রায় ৬০০ মাইল। কিন্তু পৃথিবীর সম্পর্ক এখানেই ছিন্ন হয় নি। মহাকর্ষ তো আছেই, তাছাড়া আয়নমণ্ডলের বহু উর্ধ্বেও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রসারিত।

অণু ও পরমাণু স্বভাবত তড়িৎ-নিরপেক্ষ। একটি অণু বা পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বেরিয়ে যেতে পারে, তাতে ঐ অণু বা পরমাণু ধন-তড়িৎবিশিষ্ট হয়ে পড়ে। আবার তড়িৎ-নিরপেক্ষ কোন অণু বা পরমাণুতে বাড়তি কোন ইলেকট্রন ঢুকে পড়লে সেই অণু বা পরমাণুটি ঋণ-তড়িৎ বিশিষ্ট হয়ে পড়বে। ধন বা ঋণ যেটাই হোক, ঐ প্রকার তড়িতাবিষ্ট অণু বা পরমাণুকে আয়ন বলে। ইলেকট্রনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এই ভাবে অণু বা পরমাণুর আয়নে রূপান্তরণকে আয়নিত হওয়া বলে।

আয়নমণ্ডলের বায়ু খুবই তন্বকৃত (Rarefied)। ট্রপোস্ফিয়ার বা ক্ষুব্ধস্তরে একক ঘনায়তনে যত সংখ্যক বায়ু-কণা আছে, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা স্তব্ধস্তরে আছে তার চেয়ে অনেক কম, আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডলে তার সংখ্যা আরও বিরল। সূর্য থেকে বিকিরিত অতিবেগুনী রশ্মি আয়নমণ্ডলে শোষিত হয়। এই শোষিত রশ্মির শক্তিতে বা তেজে আয়নমণ্ডলে বায়ু আয়নিত হয়। এই ভাবে আয়নমণ্ডলে বিদ্যুৎ-ধর্মী ইলেকট্রন ও আয়নের সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রন, আয়ন, বায়ু-কণা সকলেই অতি চঞ্চল। তাদের ছুটাছুটি কালে কেউ ধাক্কা লাগায়, কেউ খায়। তার ফলে যেমন আয়নের সৃষ্টি হয় তেমনি তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণাও সৃষ্ট হয়। মুক্ত বিদ্যুৎ-কণার প্রাচুর্য থাকায় আয়নমণ্ডল সমগ্র ভাবে বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয়ে থাকে।

সূর্য থেকে শুধু বিদ্যুৎ-চৌম্বক রশ্মিই বিকীর্ণ হয় না, সূর্যের দেহ থেকে ও শিখা থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পরমাণুর নিউক্লিয়াস প্রভৃতি বিদ্যুৎ-কণা প্রচুর পরিমাণে বিচ্ছুরিত হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সকল কণার কিছু অংশ পৃথিবীর দিকে আসে এবং আয়নমণ্ডলে পৌঁছাতে তাদের সময় লাগে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন। এই সকল সৌরকণিকাও আয়নমণ্ডলের বায়ু-কণাদের আয়নিত করে। তার ফলে আয়নমণ্ডলে বিদ্যুৎ-ধর্মী কণার সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। প্রতি ১১ বছরে সূর্যে সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৌরশিখাও গুরুতর হয়ে ওঠে এবং তখন সব চেয়ে বেশী ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি সৌরকণিকা ছুটে এসে আয়নমণ্ডলে পেঁছাতে থাকে। আয়নমণ্ডলে অবস্থিত পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা এ সকল বিদ্যুৎ-ধর্মী কণার গতি নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। কণাগুলি কর্ক-স্ক্রু (Cork Screw) প্যাচের মতো গতিপথে চৌম্বক বলরেখার চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর উভয় মেরু অভিমুখে প্রবাহিত হয় (চিত্র—১৩)। প্রবাহকালে বায়ু-কণার সঙ্গে সংঘাতের দরুণ বায়ু-কণা জ্যোতির্ময় হয়ে পড়ে এবং সেজন্যে উভয় মেরু অঞ্চলকেই ভূপৃষ্ঠ থেকে আলোকোজ্জ্বল দেখায়। একে মেরুজ্যোতি (Polar light বা Aurora Borealis) বলে। প্রতি ১১ বছরে সৌরকলঙ্কের আধিক্যহেতু অধিক সংখ্যক সৌরকণিকা এসে আয়নমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সেজন্যে প্রতি ১১ বছর অন্তর মেরুজ্যোতিও অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তখন শুধু উচ্চ অক্ষাংশ থেকে নয় নিরক্ষ অঞ্চলের সন্নিকট থেকেও প্রায় মধ্যাকাশ পর্যন্ত মেরুজ্যোতির বিস্তৃতি দেখা যায়।

আজকাল ফ্লুরেসেণ্ট (Fluorescent) বাতির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। ঐ বাতি মেরুজ্যোতির প্রণালী অবলম্বনে প্রস্তুত। কাচের নলে বায়ু তনুকৃত করা হয়। এই বিরল বায়ু বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে বায়ু-কণার ইলেকট্রন
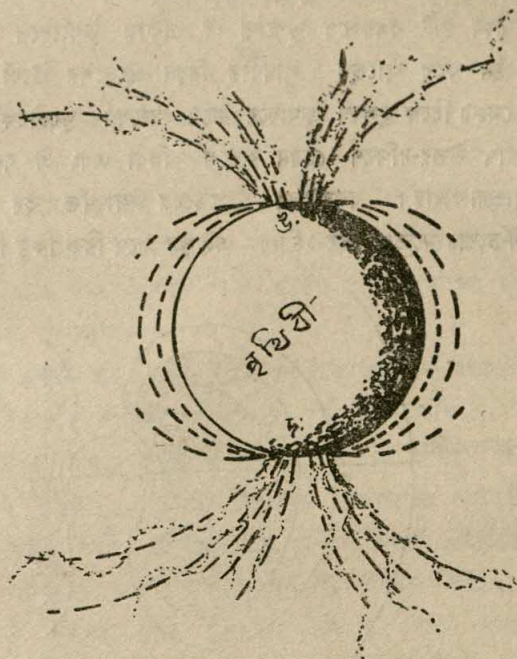
চিত্র-১৩—মেরুজ্যোতি

খসতে আরম্ভ করে। এই সব ইলেকট্রনের ছুটাছুটিতে নলের মধ্যে অন্য বায়ু-কণাগুলি উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে ও কাচের নল আলোকোজ্জ্বল হয়।

ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় (Van Allen Radiation Belt)

ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে এক হাজার থেকে তিন হাজার মাইল উচ্চতায় পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রে বলরেখা এমন ভাবে বিন্যস্ত যে, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বিদ্যুৎ-কণা তথায় সাময়িকভাবে বন্দী হয়ে থাকে, পৃথিবীর মেরু অভিমুখে প্রবাহিত হতে পারে না। তার ফলে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত তীব্র বিদ্যুৎ-তেজ সম্পন্ন হয়ে পড়ে। আবার ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে আট হাজার থেকে বারো হাজার মাইল উচ্চতায় অনুরূপ দ্বিতীয় আর একটি ক্ষেত্র আছে। তথায় বন্দী

বিদ্যুৎ-কণাদের তেজের তীব্রতা আরও অনেক বেশী। দুই অঞ্চলেই তেজঃ কণাসমূহের গতি মেরুমুখী না হয়ে তারা স্ক্রু প্যাচের মতো চৌম্বক বলরেখা অবলম্বনে সম্মুখে পশ্চাতে ইতস্তত ছুটাছুটি করতে থাকে।

ক্ষেত্রদ্বয় যেন দুটি বলয়রূপে ভূপৃষ্ঠের ঐ প্রকার ঊর্ধ্বদেশে দুই স্থানে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। পৃথিবীর বিষুব প্রদেশের ঊর্ধ্বে বলয়দ্বয়ের স্থূলতা বেশী, মেরুর দিকে স্থূলতা ক্রমান্বয়ে কমে আসে। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রটিকে মধ্যতলে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে ছেদন করলে পৃথিবী এবং ঐ বলয় দুইটির প্রস্থছেদ পাওয়া যায়। বলয়দ্বয়ের প্রস্থছেদের আকৃতি হয় অনেকটা শৃঙ্গবিশিষ্ট অর্ধ-চন্দ্রের মতো (চিত্র-১৪)। এই শৃঙ্গ পথে কিছু কিছু বিদ্যুৎ-কণা
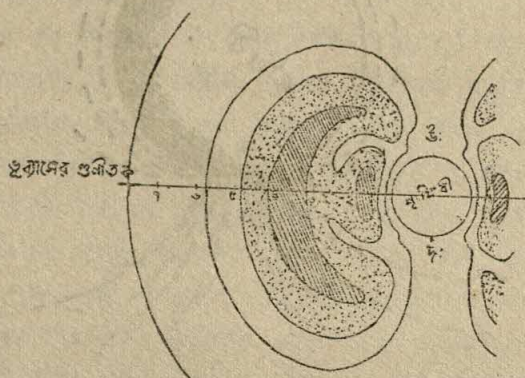
চিত্র-১৪—ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়

বেরিয়ে গিয়ে মেরুজ্যোতি সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

ঊর্ধ্বস্থিত বলয়টি প্রধানত সৌরকলঙ্কাদি দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বিদ্যুৎ-কণা দ্বারা সৃষ্ট বলে অনুমিত হয়। নিম্নের বলয়টি সম্ভবত অধিকাংশই মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic ray) দ্বারা বিধ্বস্ত অণু-পরমাণুর ভগ্নাংশ।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেম্‌স্ ভ্যান অ্যালেন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এক্সপ্লোরার—১, ৩, পাইওনিয়ার—৩, প্রভৃতি মহাকাশচারী বীক্ষণাগারসমূহের যাতায়াতের পথে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাদি পরিচালনা করেন। তাতেই ঐ দুটি অঞ্চলের চৌম্বক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এবং নাম দেওয়া হয় ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় (Van Allen Radiation Belt)।

তৃতীয় অধ্যায়

চন্দ্র

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীকে ভেঙ্গে পঞ্চাশটি চন্দ্র গড়া যায় কিন্তু সূর্য গড়তে তের লক্ষ পৃথিবীর দরকার হয়। সুতরাং হিসেব মত সূর্য আয়তনে চন্দ্রের সাড়ে ছয় কোটি গুণ বড়। চার শত চন্দ্র পাশাপাশি রাখলে সূর্যের ব্যাসের সমান হয়। তথাপি আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও সূর্যকে প্রায় সমান দেখায় তার কারণ চন্দ্র আমাদের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী ও সূর্য বহুদূরে অবস্থিত।

পৃথিবী একটি গ্রহ। চন্দ্র তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে, অতএব চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী বর্তুলাকার, চন্দ্রও বর্তুলাকার। পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। চন্দ্রও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে। একটি উপবৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের একটিতে সূর্যের অবস্থিতি কল্পনা করলে উপবৃত্তটি দ্বারা পৃথিবীর কক্ষপথ মোটামুটি নির্দেশিত হয় কিন্তু উপবৃত্তের একটি কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থান কল্পিত হলে চন্দ্রের গতিপথ ঐ উপবৃত্ত দ্বারা নির্দেশিত হয় না। তার কারণ চন্দ্র যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবী তখন সূর্যের চারদিকে ঘুরছে—এজন্যে চন্দ্রেরও সূর্য প্রদক্ষিণ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী এই রকম সচল হওয়ায় তার চারদিকে চন্দ্রের ভ্রমণ পথটি কোন সময়েই একটি পূর্ণ উপবৃত্তের রূপ নেয় না। পথটি হয়ে যায় ঢেউ খেলানো (চিত্র-১৫)—পৃথিবীর কক্ষের দুই ধারে সেই ঢেউয়ের চূড়া প্রসারিত।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রের সর্বনিম্ন দূরত্ব কিঞ্চিদধিক ২২৫০০০ মাইল, সর্বাধিক দূরত্ব কিঞ্চিদধিক ২৫২০০০ মাইল। গড়-দূরত্ব মাত্র ২৩৯০০০ মাইল। এজন্যে সাধারণ আলোচনায় পৃথিবী ও চন্দ্রের ব্যবধান বলা হয় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। আপন কক্ষপথে পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল অগ্রসর হয়, চন্দ্র তার কক্ষপথে চলে প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র আধ মাইল। আকাশমার্গে ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্রের অগ্রগতি ১৩⅓ ডিগ্রী।

চন্দ্র এবং যে সকল গোলক সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাদের অর্ধাংশ সর্বদা

আলোকোজ্জ্বল থাকে, অপরার্ধ অন্ধকারাবৃত। পৃথিবীর মানুষ কোনদিন চন্দ্রের আলোকিত অর্ধাংশের সমস্তটাই দেখতে পায়, কোনদিন কিছু উজ্জ্বল অংশ, কিছু ছায়াবৃত অংশ তার সম্মুখে থাকে, কোনদিন অন্ধকার অর্ধেকের সম্পূর্ণটাই তার দিকে ফিরানো থাকে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু আলোকিত
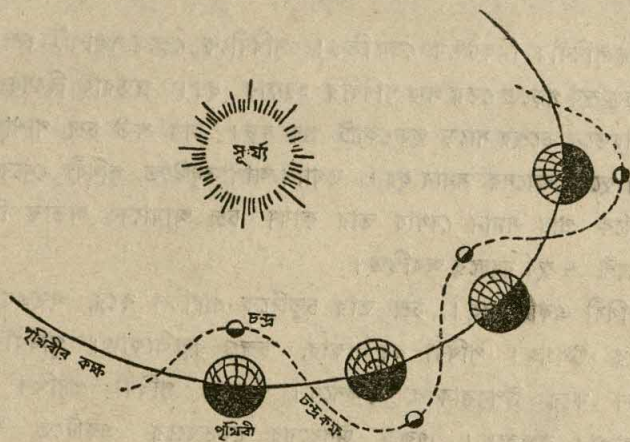
চিত্র-১৫—চন্দ্রের সূর্য প্রদক্ষিণ

হয় সূর্যরশ্মি দ্বারা, তার নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে যেদিন চন্দ্র আসে সেদিন তার আলোকিত অর্ধেক থাকে পৃথিবীর বিপরীতে, সুতরাং সেদিন চন্দ্রকে মানুষ দেখতে পায় না। এ দিনকে বলা হয় অমাবস্যা তিথি। চন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে কয়েক দিন পরে আবার পৃথিবীর ঠিক উল্টো দিকে যায়, পৃথিবী থাকে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে। সেদিন চন্দ্রের আলোকিত অর্ধাংশ সমস্তটাই পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এদিনকে বলা হয় পূর্ণিমা তিথি (চিত্র-১৬)। পৃথিবীর মানুষ দেখতে পায় অমাবস্যার পর থেকে প্রত্যহ চন্দ্রের আলোকিত অংশ একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে, অবশিষ্ট অংশ তদনুপাতে দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। চন্দ্রের আলোকিত অংশের এই দৈনন্দিন বৃদ্ধিমাত্রাকে কলা বলে। ষোল কলা পূর্ণ হয় পূর্ণিমার দিন। তার পরদিন থেকে চন্দ্রের আলোকিত অংশ আবার একটু একটু করে হ্রাস পেতে থাকে। প্রাত্যহিক এই হ্রাস-মাত্রাকেও কলা বলে এবং চন্দ্রকলার ক্ষয় হতে হতে অমাবস্যা উপস্থিত হয়।

অমাবস্যার পর দুই তিন দিন পর্যন্ত চন্দ্রের তমসাবৃত অংশও আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। সূর্যরশ্মি পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত হয়ে যদি চন্দ্রে গিয়ে পড়ে তাহলে তার অন্ধকার অংশ আমরা ঐরূপ আবছায়া দেখি। তারপর চন্দ্রালোক যখন অধিক উজ্জ্বল হয় তখন আর তার অস্পষ্ট অংশ দেখা যায় না।

অমাবস্যার পর পূর্ণিমা ; তারপর আবার অমবস্যা—এতেই চন্দ্রের এক বার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ শেষ হয়। ২৭ দিন ৭ ঘণ্টায় চন্দ্র একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ
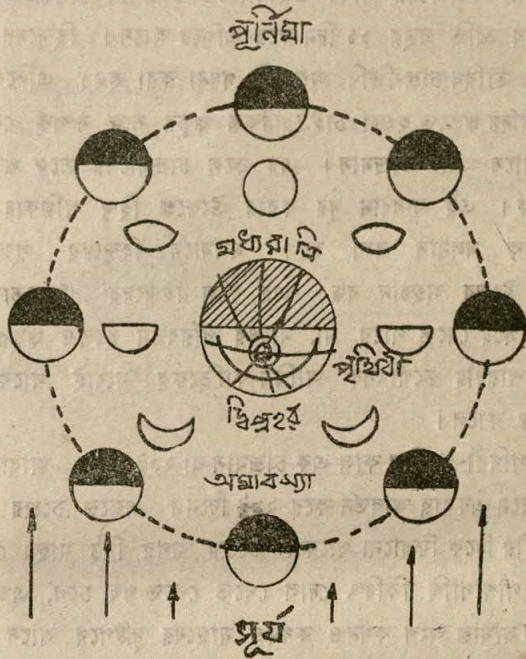
চিত্র-১৬—চন্দ্রের কলা

করে কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে কিছুটা এগিয়ে যায়। তার ফলে পৃথিবীর যে বিন্দুর উপর থেকে চন্দ্র যাত্রা সুরু করেছিল সেই বিন্দুর উপর ফিরে আসতে চন্দ্রের ২৯½ দিন লাগে। এই ২৯½ দিনকে বলা হয় এক চান্দ্রমাস। এক চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ২৯½ দিনে ৩০টি তিথি। কাজেই একটি তিথি প্রায় এক দিনের সমান।

অমাবস্যার পর প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, এইরূপ চতুর্দশীর পর পূর্ণিমা

—এই ১৫টি তিথি। পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত আবার প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে ঐরূপ ১৫টি তিথি। অমাবস্যার পর পূর্ণিমা পর্যন্ত ১৫ দিনকে শুক্লপক্ষ বলে। পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ১৫ দিন কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যা থেকে সাধারণত চান্দ্রমাসের গণনা আরম্ভ হয়। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চন্দ্রের ৩৫৪·৪ দিন লাগে। একেই চান্দ্র-বৎসর বলে। ৩৬৫¼ দিনে এক সৌর-বৎসর, সুতরাং এক সৌর-বৎসর অপেক্ষা এক চান্দ্র-বৎসর ১১ দিন কম।

মসলমান সম্প্রদায়ের পার্বণ উৎসবাদিতে চান্দ্রমাস ব্যবহৃত হয়, এজন্যে তাদের পরব প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। হিন্দুদের পূজাপার্বণ উৎসবাদির তারিখ চান্দ্র-তিথি অনুযায়ী গণনা করা হয়। এদিকে হিন্দুদের ধর্মকৃত্য নির্দিষ্ট ঋতুতে হওয়া চাই। কিন্তু ঋতুর সঙ্গে সম্পর্ক সৌরমাসের। ৩২ সৌরমাসে ৩৩টি চান্দ্রমাস। এর ফলে চান্দ্রমাসের সঙ্গে ঋতুর গরমিল হতে থাকে। এই ব্যবধান দূর করার উদ্দেশ্যে হিন্দু পঞ্জিকায় অতিরিক্ত চান্দ্রমাসটিকে মলমাস বলা হয়। মলমাসে হিন্দুদের পূজাপার্বণ ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ। এর ফলে হিন্দুদের ধর্মকৃত্যের তারিখ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে পারে না, মাসের পরিবর্তন হলেও ঋতুর পরিবর্তন হয় না। শারদীয় দুর্গোৎসব আশ্বিন-কার্তিকের মধ্যেই থাকে, বাসন্তী পূজাও বসন্ত কালে।

চন্দ্রের পৃথিবী-প্রদক্ষিণ কাল এক চান্দ্রমাস বা ২৯½ দিন। আবার চন্দ্র তার মেরু অবলম্বনে একবার আবর্তন করে ২৯½ দিনে। এজন্যে চন্দ্রের একই পিঠ সর্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে। চন্দ্রের অপর পিঠ মানুষ দেখতে পায় না। চন্দ্র পাশাপাশি কিঞ্চিৎ দোল খেতে খেতে পথ চলে, এজন্যে চন্দ্রের অপরার্ধেরও সামান্য অংশ কখনও কখনও মানুষের দৃষ্টিপথে আসে। প্রকৃত-পক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের শতকরা ৫৯ ভাগ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, অবশিষ্ট ৪১ ভাগ কোন সময়েই পৃথিবী থেকে দৃশ্য নয়।

আমাদের ২৯½ দিনে চন্দ্র তার অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে। অতএব আমাদের ২৯½ দিনে চন্দ্রের এক দিন। সুতরাং আমাদের প্রায় ১৫ দিন চন্দ্রের দিবা ভাগ ও বাকী প্রায় ১৫৷ দিন চন্দ্রের রাত্রি ভাগ। একই স্থান ক্রমাগত ১৫ দিন সূর্যরশ্মি পায়, আবার ১৫ দিন অন্ধকারে থাকে। তার ফলে দিবাভাগে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্কের ঊর্ধ্বে ওঠে।

রাত্রে হিমাঙ্কেরও অনেক নীচে। চন্দ্রে দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২১৪ ডিগ্রী ফারেনহীট হয় ও রাত্রের তাপমাত্রা সর্বনিম্নে পৌঁছায় −২৪৩ ডিগ্রী ফারেনহীট।

রাহু ও কেতু

চন্দ্রের কক্ষতল ও পৃথিবীর কক্ষতল এক সমতলে অবস্থিত নয়। উভয় কক্ষতলের মধ্যে ৫° ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন হয়েছে। ফলে চন্দ্রকক্ষের একার্ধ পৃথিবীর কক্ষতলের উপরের দিকে ও অপরার্ধ নীচের দিকে থাকে। পৃথিবী-কক্ষের সমতলের উপর চন্দ্রের কক্ষ যে দুই বিন্দুতে ছেদ করে তাদের একটির নাম রাহু (Ascending Node) ও অপরটির নাম কেতু (Descending Node) (চিত্র-১৭)। চন্দ্র কেবল রাহু বা কেতু বিন্দুতে এলে সূর্য ও
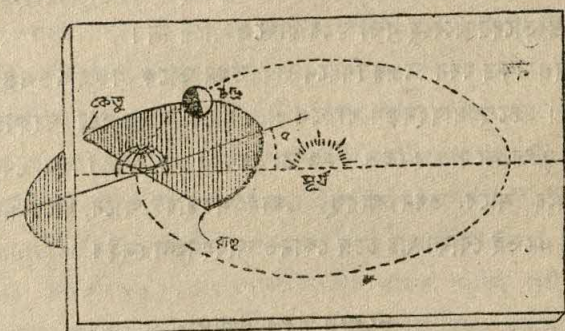
চিত্র-১৭—পৃথিবীর কক্ষ ও চন্দ্রের কক্ষ

পৃথিবীর সঙ্গে এক সরলরেখায় অবস্থিত হতে পারে এবং তখনই শুধু চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ সম্ভব।

চন্দ্রে আবহমণ্ডল নেই

চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। চন্দ্রের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের এক ভাগ এবং চন্দ্রের ভর পৃথিবীর ভরের ৮১ ভাগের এক ভাগ। ভর এত কম বলে চন্দ্রের মহাকর্ষ শক্তিও কম। চন্দ্রের মহাকর্ষ পৃথিবীর মহাকর্ষের ছয় ভাগের এক ভাগ। তার মানে পৃথিবীতে যে লোকের ওজন দেড় মণ, চন্দ্রে সে মাত্র দশ সের ভারী। পৃথিবীতে যে লোক এক মণ ওজন তুলতে পারবে চন্দ্রে সে ছয় মণ পারবে।

ভূপৃষ্ঠে পায়ের ধাক্কা দিয়ে এক পদক্ষেপে যতটা যাওয়া যায়, চন্দ্রপৃষ্ঠে সেই ধাক্কায় তার ছয় গুণ অগ্রসর হতে হবে। মহাকর্ষ কম বলে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রস্থান বেগও (Escape Velocity) কম। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রস্থান বেগ প্রতি সেকেণ্ডে দেড় মাইল মাত্র। চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্রিকেট মাঠ থেকে কোন ব্যাটসম্যান যদি এমন শক্তিতে বলে আঘাত করতে পারে যে, তার গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত ১½ মাইল, তাহলে ক্যাচ ধরার জন্যে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের হতাশ হতে হবে। কারণ ঐ বল আর চন্দ্রপৃষ্ঠে ফিরে আসবে না, মহাশূন্যে পালিয়ে যাবে। প্রস্থান বেগ কম বলেই চন্দ্র কোন আবহমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে নি। উত্তাপ পেলে অণুসমূহের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে দেড় মাইলের বেশী হয়। কাজেই চন্দ্রে যদি কোন দিন কোন আবহমণ্ডল থেকেও থাকে এখন আর তার অবশিষ্ট কিছু নেই। কারণ সূর্যতাপে আবহমণ্ডলের অণুরা সকলে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, চন্দ্র তাদের স্বদেহে বন্দী করে রাখতে পারে নি।

কোনও নক্ষত্র যখন চন্দ্রের পিছনে যায় তখন তাকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হতে দেখা যায়। চন্দ্রে আবহমণ্ডল থাকলে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে তারপর নক্ষত্রটি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যেত, কিন্তু তা হয় না। চন্দ্রের পিছন থেকে নক্ষত্র যখন বেরিয়ে আসে তখন পরিপূর্ণ উজ্জ্বল অবস্থায়ই আসে, ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয় না। এতেই বোঝা যায় চন্দ্রে কোনও আবহমণ্ডল নেই।

চন্দ্রের গঠন-উপাদান

পৃথিবীর উপরকার চল্লিশ মাইল পুরু স্থানকে ভূত্বক বলে। ভূত্বকের গঠন-উপাদান প্রধানত ব্যাসাল্ট (Basalt) ও গ্রানাইট (Granite) এবং ভূত্বকের গড়-ঘনত্ব ৩·৩। চন্দ্রের গড়-ঘনত্বও ৩·৩। এ থেকেই অনুমিত হয় চন্দ্রে লৌহাদি ভারী ধাতু নেই এবং চন্দ্রদেহ সর্বতোভাবে ব্যাসাল্ট ও গ্রানাইট জাতীয় পাথর দ্বারা গঠিত। চন্দ্রের বয়স পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহাদির বয়সের সমান। পৃথিবীর অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে চন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে এমন একটা মতবাদ থাকলেও তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস সৌরজগতের অন্যান্য গোলক যে ভাবে সৃষ্ট হয়েছে, সূর্যসন্নিধানে লৌহ-শিলা অঞ্চলে চন্দ্রও তেমনি একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর আকর্ষণ-সীমায় পড়ে পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করে চলেছে, সূর্য-প্রদক্ষিণরত গ্রহ হতে পারে নি।

চন্দ্রের ভিতরে বা বাইরে কোথাও এক বিন্দু জল নেই। পৃথিবীর মরুভূমিতে জলের আশা করলে কোথাও এক আধ ফোঁটা মিলেও যেতে পারে কিন্তু চন্দ্রে জলের আশা করা একেবারেই নিরর্থক। করুণ কোমল রহস্যময়ী জ্যোৎস্নার উৎস চন্দ্র এমন জল ও বায়ুহীন কঠিন পাষাণস্তূপ!

চন্দ্রের উপরিভাগ

চন্দ্রের উপরিভাগ অত্যন্ত অসমতল। দূরবীনে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠে আছে উত্তুঙ্গ পর্বত, বিরাট উপত্যকা, সুগভীর ও অগভীর ছোট ও বড় চক্রাকার গহ্বর বা খাদ। অসংখ্য খাদ থাকায় চন্দ্রপৃষ্ঠের সর্বাংশই এবড়োখেবড়ো, মানুষের মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগের মতো। পাহাড়-পর্বতের মধ্যেকার ক্ষেত্র সমূহে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, তাই পৃথিবী থেকে সে জায়গাগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। এই কালো অংশগুলিকে মানুষ চাঁদের কলঙ্ক বলে—তাই নিয়ে কত কাল্পনিক গল্প রচনা করে।

গ্যালিলিও তার দুর্বল দূরবীনে পর্যবেক্ষণ করে চন্দ্রের ছায়াবৃত অংশকে সাগর মনে করেছিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের যে নামকরণ হয়েছিল তার বাংলা প্রতিশব্দ অমৃত সাগর (Mare Nectaris), শান্তি সাগর (Mare Tranquilitatis) ইত্যাদি। পরে শক্তিশালী দূরবীনে দেখা গেছে চন্দ্রে জল নেই এক বিন্দুও। চন্দ্রের পর্বতমালার নামও পার্থিব পর্বতের নামানুকরণেই রাখা হয়েছে—আল্‌প্‌স্‌, আপেন্নাইন্‌স্‌, কার্পেথিয়ান ইত্যাদি। আগে প্রতিটি পর্বতকে আগ্নেয়গিরি ভাবা হয়েছিল তাই তাদের উপরিস্থিত প্রত্যেক গহ্বর বা খাদকে অগ্ন্যুদগীরণের মুখ মনে করা হতো। সেই থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের খাদমাত্রকেই অগ্ন্যুদগীরণ মুখ (Crater) বলা হয়। এই সকল তথাকথিত অগ্নিমুখের প্রধানগুলিকে পৃথিবীবাসী নরসমাজ প্লেটো, কোপারনিকাস, টাইকো, কেপ্‌লার প্রভৃতি দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের নামে আখ্যাত করেছেন। পরবর্তী কালে উন্নত দূরবীনের সাহায্যে খাদগুলির যে ছবি পাওয়া গিয়েছে তাতে ওদের সবগুলি যে অগ্ন্যুদগীরণ মুখ হতে পারে না এ কথা নিশ্চিত (প্লেট-ক)।

ভূপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯০০০ ফুট, চন্দ্রের উপরে অনেক পর্বতের উচ্চতা ৩০০০০ ফুটের বেশী। চন্দ্রপৃষ্ঠের বৃহত্তম গহ্বরের নাম ক্লেভিয়াস (Clavius)—এর মুখের ব্যাস ১৪৬ মাইল ও গভীরতা

২০০০০ ফুট। কমপক্ষে এক মাইল যে সব খাদের মুখের ব্যাস, দূরবীনে তারা সহজেই ধরা পড়ে, ক্ষুদ্রতর অবশ্যই আরও অনেকানেক আছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের সমভূমিতে, বৃহৎ গহ্বরের গায়ে ও তলদেশে, উপত্যকায় ও পর্বত-গাত্রে সর্বত্র গহ্বর সমাকীর্ণ। এদের আকৃতি গামলা বা বাটির মতো। এ ধরণের এত খাদের উৎপত্তি কি করে হলো তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক কল্পনা-জল্পনা করেছেন। বিজ্ঞানী জর্জ ডারউইন বলেছেন পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় যখন তার উত্তপ্ত দেহ অর্ধতরল ছিল ও আবর্তন ছিল অতি দ্রুত তখন তার বিষুবাঞ্চল থেকে প্রকাণ্ড এক বস্তুস্তূপ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছিট্‌কে চলে যায় মহাশূন্যে কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ এড়াতে পারে না। এই বস্তুস্তূপই পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। উত্তপ্ত ও অর্ধতরল এই চন্দ্রের বহির্ভাগ স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শীতল হয়ে কঠিনে রূপান্তরিত হলো এবং অধিকতর উত্তপ্ত পদার্থ অভ্যন্তরে আটক পড়লো। এ কারণে শীতল বহিরাবরণে যে সব ছোট বড় বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয়েছিল তারা ফেটে যেতেই বর্তমানে দৃশ্যমান খাদসমূহ উৎপন্ন হয়েছে। এ অনুমানের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই তবে দেখা যায় ভূত্বকের যে ঘনত্ব, চন্দ্রদেহের ঘনত্বও তাই—উভয়ই ৩·৩। আবার প্রশান্ত মহাসাগরের ঘনায়তন ও চন্দ্রের ঘনায়তন সমান। এজন্যে বলা হয় পৃথিবীর উপরতল থেকে চন্দ্র ছিট্‌কে বেরিয়ে যাওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছে।

আর একটি কল্পনা হলো এই যে, চন্দ্রে এককালে ঘন ঘন প্রলয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গীরণ হতো, খাদগুলি তারই মুখ। যদি তাই হতো তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ থাকা উচিত ছিল সর্বত্র ও প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু শক্তিশালী দূরবীনেও তেমন কোন সাক্ষ্য মেলে না।

আর একটি অনুমানের সম্ভাব্যতাই সবচেয়ে বেশী। সেটি এই যে, খাদগুলি উৎপন্ন হয়েছে উল্কাপাতের আঘাত থেকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে ভূপৃষ্ঠ চাঁদের মতো এবড়োখেবড়ো নয় কেন? এর উত্তর আছে। পৃথিবীতে উল্কাকে যে আবহমণ্ডল ভেদ করে আসতে হয় তাতেই তাদের অধিকাংশ জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়। মাটির নীচে যে সব ডিম্বাকৃতি উল্কা পাওয়া যায় তাদের ক্ষত ভূপৃষ্ঠের জল ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। আরও বড় উল্কা যেগুলি ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছতে পারে তাদের সৃষ্ট ক্ষত বা খাদ চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্ষতের মতো ঠিক একই রকম দেখতে। সাইবেরিয়া, আরিজোনা ও আফ্রিকার উল্কাক্ষতগুলির সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের খাদ-

গুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ভূপৃষ্ঠের এ খাদগুলিও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে। চন্দ্রপৃষ্ঠে জল নেই, চন্দ্রের কোন আবহাওয়া নেই, কাজেই তার দিকে যে সব উল্কা ছুটে আসে তারা প্রত্যেকেই অব্যাহত গতিতে সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল বেগে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে ক্ষত বা খাদ সৃষ্টি করতে পারে এবং যে ক্ষত সৃষ্ট হয় তার অবলুপ্তির সম্ভাবনা নেই। বস্তুত শত বর্ষ পূর্বে দূরবীনে চন্দ্রের যে চেহারা ছিল আজও তার কোন পরিবর্তন হয় নি, হবেও না কোন দিন।

চন্দ্রের এক পিঠ আমরা সর্বদা দেখি, অপর পিঠ পৃথিবীর লোক দেখতে পায় না। কিন্তু এক পিঠের সঙ্গে অপর পিঠের চেহারায় কোন পার্থক্য থাকবার সম্ভাবনা নেই। কয়েক বছর পূর্বে রাশিয়া 'লুনিক ৩' নামক রকেট পাঠিয়ে চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের যে ছবি তুলেছে তাতে দেখা যায় দুই পিঠের দৃশ্য একই রকম। ও পিঠেও এ পিঠের মতোই খাদ আছে অসংখ্য, উচ্চ পাহাড়-পর্বত আছে, তথাকথিত সাগরও আছে। রুশবাসীরা তাদের নামকরণ করেছে রুশীয় বৈজ্ঞানিক, রুশীয় পাহাড়-পর্বত ও সাগর-উপসাগরের নামানুকরণে।

জোয়ার ভাটা

সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বিদ্যমান। এই আকর্ষণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায় ভূপৃষ্ঠের জলভাগে।

ভূপৃষ্ঠের সমুদ্র যখন চন্দ্রের সম্মুখে থাকে তখন সেখানকার জল ফুলে ওঠে। ভূপৃষ্ঠে চন্দ্র থেকে যত দূরে ভূকেন্দ্রের ব্যবধান তার চেয়ে ৪০০০ মাইল বেশী। এজন্যে চন্দ্রের সম্মুখস্থ ভূপৃষ্ঠে চন্দ্রের যে আকর্ষণ; ভূকেন্দ্রে আকর্ষণ তদপেক্ষা কম। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ চন্দ্রের দিকে যতটা সরে, ভূকেন্দ্র ততটা পারে না। জলভাগ এগিয়ে গেল, সুতরাং জলে স্ফীতি দেখা দেয়।

আবার চন্দ্র থেকে ভূকেন্দ্র যতটা দূরে পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠ তার চেয়ে ৪০০০ মাইল বেশী দূরে। এদিকে সমুদ্রতলের কঠিন ভূভাগ ভূকেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। কাজেই চন্দ্রের আকর্ষণে ভূকেন্দ্র সমস্ত ভূভাগ সহ চন্দ্রের দিকে যতটা সরে যায়, পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠের সমুদ্রজল ততটা সরে না, পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং সেখানেও জল ফুলে ওঠে। জলের স্ফীতিই জোয়ার (High Tide)। অতএব দেখা যাচ্ছে চন্দ্রের সম্মুখস্থ

ভূপৃষ্ঠের সাগরে ও তার বিপরীতস্থ ভূপৃষ্ঠের সাগরে একসঙ্গে জোয়ারের আবির্ভাব হয়। সম্মুখে পশ্চাতে যখন জোয়ার দক্ষিণ ও বামের জল তখন ঐ স্ফীত স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এর ফলে দক্ষিণে ও বামে জল-সমতলে অবনতি ঘটে। জল এইভাবে নেমে গেলে তার নাম ভাটা (Low Tide) ; অর্থাৎ দুই জোয়ার-স্থানের মধ্যবর্তী দুই স্থানে ভাটা (চিত্র-১৮)।
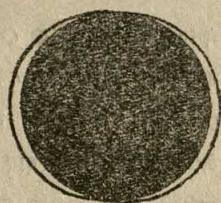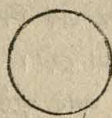
চিত্র-১৮—জোয়ার ভাটা।

পৃথিবী নিশ্চল দাঁড়িয়ে নেই, ক্রমাগত ঘুরছে। অতএব চন্দ্রের সম্মুখস্থ ভূপৃষ্ঠ প্রতি নিমেষে সরে যাচ্ছে আর সেখানে নূতন ভূপৃষ্ঠ উদয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার ভাটার স্থানেরও পরিবর্তন ঘটছে। ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী আবর্তন করে। সুতরাং এখন যেখানে ভাটা ছয় ঘণ্টা পরে সেখানে জোয়ার হবে। এইভাবে প্রতিদিন একই স্থানে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়।

চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর সাগরজলে এই যে জোয়ার ভাটা ঘটছে সূর্যের আকর্ষণেও ঠিক এইভাবেই জোয়ার ভাটা ঘটে। কিন্তু সূর্য অনেক দূরে থাকায় তার আকর্ষণ অনেক কম। অমাবস্যার দিনে একই দিক থেকে চন্দ্র ও সূর্য সাগরজলকে টানে কাজেই ঐ দিন জলের স্ফীতি খুব বেশী। একে ভরা-কটাল (Spring Tide) বলে। পূর্ণিমার দিন বিপরীত দিক থেকে চন্দ্র ও সূর্য সাগরজলকে টানে, কাজেই এদিনও ভরা-কটাল।

সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্য পরস্পরের সহিত সমকোণে স্থিত হয়। এ সময়ে চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার, সূর্যের স্থিতিভেদে সেখানে ভাটা, আবার চন্দ্রের প্রভাবে যেখানে ভাটা, সূর্যের প্রভাবে সেখানে

জোয়ার, কাজেই জোয়ারের জল কোন ক্ষেত্রেই বেশী স্ফীত হতে পারে না। এর নাম মরা-কটাল (Neap Tide)।

আজ যখন যেখানে জোয়ার হলো আগামীকাল সেখানে ঠিক সেই সময়ে জোয়ার হবে না, হবে তার ৫২ মিনিট পরে। পৃথিবীর আবর্তন ও চন্দ্রের কক্ষ ভ্রমণের সম্মিলিত ফলে জোয়ারের সময় প্রত্যহ এই ভাবে ৫২ মিনিট করে পিছিয়ে যায়। সব জায়গায় ও সব সময়ে জোয়ারের বেগ ঠিক ঐ হিসেব মেনে চলে না, বায়ুপ্রবাহ, জলের গভীরতা, সমুদ্রের তলায় ঘর্ষণ প্রভৃতির জন্যে ঐ হিসেবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

পৃথিবীর আবর্তন গতি পশ্চিম থেকে পূর্বে তাই জোয়ারের স্রোত প্রবাহিত হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। জোয়ারের সময় সাগরজল স্ফীত হয় মাত্র ৩।৪ ফুট কিন্তু তাই যখন সুপ্রশস্ত ফানেল মুখ দিয়ে অপ্রশস্ত নদীপথে প্রবেশ করে তখন সেই জলের উচ্চতা অনেক সময় ৩০।৪০ ফুটেরও উর্ধ্বে ওঠে এবং নদীর কূল ছাপিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। একে বান বলে।

বিজ্ঞানীরা বলেন সমুদ্রের তলায় জলের ঘর্ষণের দরুণ পৃথিবীর আবর্তন বেগ কমে গিয়ে দিনমান একটু একটু করে বড় হয়ে যাচ্ছে। এক শত বৎসরে দিনমান ১৩ সেকেণ্ড বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দৃষ্টিতে এটা তেমন কিছু নয় কিন্তু দীর্ঘকালের হিসেব ধরলে উপেক্ষা করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ

চন্দ্রগ্রহণ

কোন কোন পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের উপর একটি কালো গোল ছায়া পড়ে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অদৃশ্য করে ফেলে। আবার এক একটি অমাবস্যার দিনে উজ্জ্বল সূর্যকেও ঢাকা পড়তে দেখা যায়। এদের আমরা চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ বলে থাকি।

গ্রহণ দৈনন্দিন ঘটনা নয়। তাই প্রাচীন মানুষ ভয়ে ও বিস্ময়ে এর সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা করেছেন। রাহু কর্তৃক চন্দ্র-সূর্য গ্রাসের কাহিনী এদেশে কারও অবিদিত নয়। বস্তুত, গ্রহণ নিতান্তই একটি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হয় এবং সেজন্যে গ্রহণের কাল পূর্ব থেকেই আমরা হিসেব করে জানতে পারি।

সূর্য একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ। পৃথিবীর নিজের কোন আলোক নেই। এ কারণে, সূর্যের বিপরীত দিকে মহাশূন্যে সর্বদাই পৃথিবীর একটি ছায়া রয়েছে।

চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। চন্দ্র একমাত্র পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে। সুতরাং কেবল
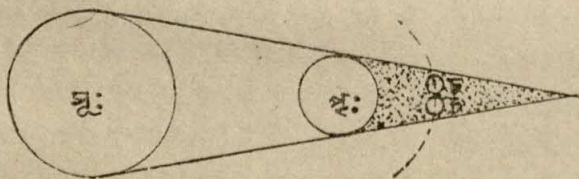
চিত্র-১৯—চন্দ্রগ্রহণ

পূর্ণিমা তিথিতেই চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব। পৃথিবী একটি গোলক বলে চন্দ্রের উপর এর যে ছায়াটি আমরা দেখিতে পাই, তাও গোলাকার হয়। স্বীয় কক্ষে চলতে চলতে চন্দ্র যে সময় ঐ ছায়ার সীমা স্পর্শ করে তখন গ্রহণ লাগে এবং যখন ছায়ার সীমানা অতিক্রম করে তখন গ্রহণ ছাড়ে।

এখন প্রশ্ন এই, সকল পূর্ণিমাতেই চন্দ্র যদি সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে, তাহলে সকল পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হয় না কেন? এর কারণ আছে। পৃথিবী ও সূর্য একত্র যে সমতলে অবস্থিত, চন্দ্র সেই সমতলে অবস্থিত নয়। চন্দ্রের কক্ষ ঐ সমতলকে দুই বিন্দুতে ছেদ করেছে। বিন্দুদ্বয়কে রাহু ও কেতু বিন্দু বলা হয়। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র যদি একই সমতলে থাকতো তাহলে প্রতি পূর্ণিমাতেই চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করতো। সমতল এক নয় বলে তা হতে পারে না, চন্দ্র সেই সমতলের উপরে বা নীচে থাকে। যদি চন্দ্র কোনও পূর্ণিমাতে রাহু বা কেতু বিন্দুতে থাকে, সেদিন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরলরেখায় পড়ে। সুতরাং সেদিন পৃথিবীর ছায়াও চন্দ্রকে আবৃত করে ফেলে। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ঠিক রাহু বা কেতু বিন্দুতে আসবে—এই যোগাযোগটি সাধারণত ঘটে উঠে না। তাই, সকল পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে না।

সূর্য ও পৃথিবীর সহিত একই সরলরেখায় চন্দ্র থাকলে পূর্ণ-গ্রহণ হয়। যখন রাহু বা কেতু বিন্দু থেকে চন্দ্র অল্প দূরে থাকে, তখন আংশিক-গ্রহণ দেখা যায়।

বৎসরে চন্দ্রগ্রহণ তিনটি পর্যন্ত হতে পারে, আবার একেবারে না-ও হতে পারে। পূর্ণ-গ্রহণ কোন বছর একাধিক হয় না।

সূর্যগ্রহণ

চন্দ্রগ্রহণ থেকেই সূর্যগ্রহণের কারণও বুঝা যাবে। কক্ষের উপর চন্দ্র যেদিন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যপথে এসে দাঁড়ায় সেদিন পৃথিবীর অমাবস্যা তিথি। কোন অমাবস্যা তিথিতে যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থিত হয়, অর্থাৎ চন্দ্র যদি রাহু বা কেতু বিন্দুর উপর এসে পড়ে, তাহলে সেই দিন পৃথিবীবাসীর সম্মুখে চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়াবে। এই সূর্যগ্রহণ।
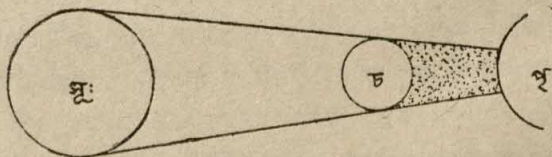
চিত্র-২০—সূর্যগ্রহণ

চন্দ্রকক্ষ একটি উপবৃত্ত। এজন্যে চন্দ্র কখনও পৃথিবীর নিকটে আসে, কখনও দূরবর্তী হয়। দূরে থাকলে চন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়। সেই

সময়ে যদি সূর্যগ্রহণ হয়, তবে সূর্য চন্দ্রদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হতে পারে না। কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের চতুর্দিকে সূর্যের বহিঃপ্রান্তকে একটি জ্যোতির্ময় বলয়ের ন্যায় দেখা যায়। একে বলয়-গ্রহণ বা কঙ্কণ-গ্রাস (Annular eclipse) বলে। রাহু বা কেতু বিন্দু হতে সামান্য দূরে থেকে চন্দ্র যদি সূর্যের অংশমাত্রকে আবৃত করে, তাহলে সূর্যের আংশিক-গ্রহণ হয়। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে রাহু বা কেতু বিন্দুতে থাকা অবস্থায় সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণ বা পূর্ণ-গ্রাস হয়।

একটি কথা মনে রাখতে হবে। চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে। সূর্য জ্যোতির্ময়; তাকে ছায়াদ্বারা আড়াল করা যায় না—ছায়া সর্বদা আলোকের বিপরীতেই পড়ে। সূর্যকে আড়াল করে সশরীরে চন্দ্র।

বৎসরে পাঁচটি পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ হতে পারে, কিন্তু দুটি হবেই। সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণ মিনিট কয়েকের অধিক স্থায়ী হয় না। সূর্যের বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল কেবল পূর্ণ-গ্রাসের সময়েই দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

সূর্য

ঊষার অরুণোদয় মানুষের কাছে যেন দেবতার আবির্ভাব। রাত্রির অন্ধকারের অবসানে আলোকজ্জল প্রকৃতি মানুষের মনে জাগায় প্রেরণা, কর্মে যোগায় উদ্যম। তাই মানুষ যুগে যুগে সূর্যের আরাধনা করে এসেছে, আজও তার বিলুপ্তি ঘটে নি; সভ্যতার উন্মেষের সূত্রপাতেই মানুষ জেনেছিল সৌরশক্তি সকল পার্থিব প্রকৃতির নিয়ন্তা, জড় ও জীবের মূলে আছে সূর্যের তেজ। সূর্যের আলো গ্রহ-উপগ্রহদের দৃশ্যমান করে তোলে, প্রকৃতির ঘোমটা খুলে মানুষের রূপবোধ জাগ্রত করে। সূর্যের তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবাহ উৎপন্ন করে, সেই ঝড়-ঝঞ্ঝায় পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে মানুষের বাসোপযোগী সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়। সূর্যতাপে পর্বত-শৃঙ্গের তুষার গলে নদী জলপূর্ণ হয়। সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠে মেঘে পরিণত হয়, তার ধারাবর্ষণে ধরণী শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে। বৃক্ষাদিতে সংরক্ষিত সৌরতেজ কাঠ জ্বালিয়ে, কয়লা পুড়িয়ে মানুষ তাপ ও আলোকরূপে ব্যবহার করে। অথচ সূর্য চতুর্দিকে যে তেজ বিকিরণ করে পৃথিবী তার কতটুকুই বা আহরণ করে নিতে পারে! এক সেকেণ্ড সময়ে যে বিপুল পরিমাণ তেজ সূর্যদেহ থেকে বহির্বিশ্বে বিকীর্ণ হয়, মানুষ তার জীবনেতিহাসের আদি থেকে আজ পর্যন্ত ততটুকু মাত্র সৌরতেজও ব্যবহার করে উঠতে পারে নি।

এই মহাদ্যুতিময় সূর্য কি? কোথা থেকে আসে তার অমিত তেজঃপুঞ্জ? এ সব জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে আগ্রহাকুল বিজ্ঞানীদের কর্মোদ্যমের শেষ নেই।

সূর্য একটি নক্ষত্র। রাতের আকাশে দৃশ্যমান আলোকবিন্দুসকল যেমন নক্ষত্র, সূর্যও ঠিক তেমনই এক নক্ষত্র। কিন্তু সূর্যকে এত বড় দেখায় তার কারণ সূর্য পৃথিবীবাসী আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত—তার দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে মাত্র আট আলো-মিনিট। সূর্যকে ছেড়ে দিলে যে নক্ষত্র আমাদের নিকটতম তার দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে চার আলোকবর্ষ। ঐ দূরত্বে নিয়ে গেলে সূর্যও আমাদের চোখে এক আলোকবিন্দুতে পরিণত হবে।

সূর্যের দীপ্তিমাত্রা প্রায় ঋণ সাতাশ (—২৬৮)। জ্যোতিষ্কের ঔজ্জ্বল্যের পরম মাত্রা নির্ধারিত হয় যে দূরত্বে, সেই দশ পারসেক (Parsec) বা কিঞ্চিদধিক ৩০ আলোকবর্ষ দূরত্বে নিয়ে গেলে সূর্যকে আমরা এক ক্ষীণ পঞ্চম প্রভার নক্ষত্রের ন্যায় দেখতে পেতাম।

সূর্যের ব্যাস ৮৬৪০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। অতএব হিসেবে পাওয়া যায় ঘন-আয়তনে সূর্য পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ। অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবীর একত্র সমাবেশ ঘটলে যে ব্যাপ্তি হয় সূর্য তার সমায়তন। পৃথিবী দেহের গড়-ঘনত্ব ৫'৫, সূর্যদেহের গড়-ঘনত্ব ১'৪। তার মানে সূর্যদেহের গড়-ঘনত্ব পৃথিবীর গড়-ঘনত্বের চার ভাগের এক ভাগ। এজন্যে আয়তনে তের লক্ষ গুণ হলেও সূর্য ওজনে পৃথিবীর তিনলক্ষ ত্রিশ হাজার (৩৩০০০০) গুণ মাত্র।

সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে আরও বেশী। এই তাপে কঠিন বা তরল পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বস্তুমাত্রই এখানে গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেই সূর্যের গঠন-উপাদান সর্বৈব গ্যাস। পৃথিবীর উপরিভাগের স্থলাংশ সমতল হোক বা অসমতল হোক সব সময়েই স্থির শান্ত। কিন্তু সূর্যদেহের প্রচণ্ড তাপমাত্রায় তথাকার গ্যাস কোন সময়েই নিস্পন্দ বা স্থির থাকতে পারে না। উত্তুঙ্গ লেলিহান অগ্নিশিখার উত্থান-পতনে সূর্যপৃষ্ঠ সর্বদাই নিদারুণ বিক্ষুব্ধ। সেখানে চলছে আগুনের ঝড়ঝঞ্ঝা ঘূর্ণাবর্ত।

ভূপৃষ্ঠের উপর যেমন আবহমণ্ডল আছে, সূর্যপৃষ্ঠের উপরের দিকেও তেমনি গ্যাসীয় আবহমণ্ডল বর্তমান। এই আবহমণ্ডলের কয়েকটি বিভাগ আছে। তাদের নাম—আলোকমণ্ডল (Photosphere), বর্ণমণ্ডল (Chromosphere), ও ছটামণ্ডল (Corona)। সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, তার তীব্র ঔজ্জ্বল্যের জন্যে। এই অত্যুজ্জ্বল অংশকেই আলোকমণ্ডল বলে। আলোকমণ্ডল অনতিগভীর, এর বেধ মাত্র ২৫০ মাইল। এই মণ্ডল থেকেই আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হয়ে সৌরজগতের যাবতীয় বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে।

সূর্যের অভ্যন্তর থেকে অত্যুত্তপ্ত গ্যাস-প্রবাহ আলোকমণ্ডল ভেদ করে উপরে উঠে বুদ্বুদ সৃষ্টি করে। বুদ্বুদগুলি আয়তনে সুবৃহৎ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয়। এজন্যে খালি চোখে দৃষ্টিগোচর না হলেও সূর্যের উপরিভাগ সব সময়েই অতিশয় অশান্ত, সর্বদাই টগবগ করে ফুটছে। বুদ্বুদ সৃষ্ট আলো-আঁধারির

দরুণ দূরবীনের দৃষ্টিতে মনে হয় সূর্যপৃষ্ঠে যেন শস্যদানা ছিটানো আছে অর্থাৎ দূরবীনের দৃষ্টিতে সূর্যপৃষ্ঠ আতাফলের ত্বকের মতো (প্লেট-খ)। আলোক-মণ্ডলের উপরের দিককার গ্যাসীয় আবরণটিকে বর্ণমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলের গভীরতা কয়েক হাজার মাইল। সাধারণত দশ হাজার মাইলের বেশী নয়। সূর্যালোকের তীব্রতার দরুণ এই মণ্ডলটিকে খালি চোখে দেখা যায় না। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যের চতুর্দিকে লাল বা গোলাপী রঙের কঙ্কণ অথবা বলয়ের ন্যায় এই মণ্ডলটি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এবং তখন তার আলোকচিত্রও গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

বর্ণমণ্ডলের উপরে হাল্‌কা আর একটি গ্যাসীয় আবরণ সূর্যকে বেষ্টন করে আছে। এই বেষ্টকের (Halo) নাম ছটামণ্ডল (Corona)। সূর্যদেহের ঊর্ধ্বে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বর্ণমণ্ডল যেমন খালি চোখে দেখা যায় না, ছটামণ্ডলও তেমনি খালি চোখে অদৃশ্য। সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণের সময়ে আলোকচিত্র নিলে এই আলোকজ্জ্বল ছটামণ্ডলের ছবি ধরা পড়ে। পৃথিবীর যেখান থেকে সূর্যের পূর্ণ-গ্রহণ দৃশ্য সেখানেই গিয়ে জ্যোতির্বেত্তাগণ ভিড় করেন সূর্যের ছটামণ্ডল ও বর্ণমণ্ডলের আলোকচিত্র গ্রহণের অভিপ্রায়ে (প্লেট-গ)। আর যার জন্যে বিজ্ঞানীদের এই দূর-দূরান্তরে অভিযান সেই পূর্ণ-গ্রাস তো মাত্র মিনিট তিনেক স্থায়ী। তাই তাদের গবেষণা বিঘ্নিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বের্নার্ লিও (Bernard Lyot) একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটির নাম করোনাগ্রাফ (Coronagraph)। এই যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রেরই অভ্যন্তরে কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ ঘটিয়ে সূর্যের ছটামণ্ডল ও বর্ণমণ্ডলে দিনের বেলায় যতবার ইচ্ছা এবং যে কোনও সময়ে গবেষণা চালানো সম্ভব। অবশ্য মেঘলা দিনে তা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু মানমন্দিরে এই যন্ত্র বসানো হয়েছে এবং জ্যোতির্বেত্তাদেরও অনেক সুবিধা হয়েছে।

দেখা যায় সূর্যপৃষ্ঠ থেকে এক একটি অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যুৎবেগে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছুটে চলে যায়। শিখাগুলি কখনও কখনও ছিন্ন হয়ে অনন্ত আকাশে মিলিয়ে যায়, কখনও বা সূর্যপৃষ্ঠেই আছাড় খেয়ে পড়ে। এদের সৌরশিখা (Solar Prominence বা Solar Flares) বলে (প্লেট-ঘ)।

আলোকমণ্ডলকে আবৃত করে রেখেছে যে গ্যাসস্তর অথবা বর্ণমণ্ডলের সর্বনিম্নস্থ যে গ্যাসীয় স্তর তার তাপমাত্রা আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা অপেক্ষা

কম। এই গ্যাস স্তর বিশোষণস্তর (Reversing Layer) নামে আখ্যাত। আলোকমণ্ডল থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে এই স্তর ভেদ করে নির্গত হয়। এই সময়ে এই স্তরের পরমাণুসমূহ আলোকরশ্মি থেকে স্বজাতীয় রশ্মি শোষণ করে নেয়। এ কারণে বর্ণালীতে কৃষ্ণবর্ণ রেখার আবির্ভাব ঘটে। বর্ণালীর কৃষ্ণবর্ণ দাড়িগুলিকে বা ডোরাগুলিকে ফ্রন্‌হফার রেখা (Fraunhofer Lines) বলে (প্লেট-ঙ)।

চাঁদের পিঠে যেমন কলঙ্ক দেখা যায়, গাঢ় রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে সূর্যপৃষ্ঠেও তেমনি কালো কালো কলঙ্ক ক্ষেত্র দেখা যায়। এদের সৌর কলঙ্ক (Sun spots) বলে। এরা সব ছোট বড় নানা আকারের গহ্বর। কতকগুলি কলঙ্ক হয়তো মাত্র কয়েক শত বর্গমাইল জুড়ে অবস্থান করছে, আবার কতকগুলি কলঙ্কের গহ্বর এত বিরাট যে, গুটি কয়েক পৃথিবী স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে। অত্যধিক উত্তাপের দরুণ সূর্যপৃষ্ঠে যে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবর্ত ও বিস্ফোরণাদি ঘটছে তার ফলেই এই সকল সৌরকলঙ্কের উদ্ভব হয়। সৌরকলঙ্কের মধ্যে তাপমাত্রা ন্যূনাধিক ৪৭৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অথচ সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো স্থান—একটি অপরটির চেয়ে উজ্জ্বল। অধিক উজ্জ্বলের পাশে অল্পোজ্জ্বলকে অন্ধকার মনে হয়—তাই সৌরকলঙ্ককে হীনপ্রভ বা কৃষ্ণবর্ণ দেখায় (প্লেট-চ)।

সৌরকলঙ্ক স্থায়ী নয়। এক সময়ে এদের আবির্ভাব ঘটে, অন্য সময়ে এরা লয় পায়। কোন কোন সৌরকলঙ্ক মাত্র ৫।৬ দিন টিকে থাকে, আবার কোন কোনটা মাসাধিক কাল স্থায়ী হয়। আয়ুষ্কাল তিন চার মাস এমন সৌরকলঙ্কও দেখা যায়। সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধেই সাধারণত নিরক্ষবৃত্তের ৫ ডিগ্রী দূর থেকে আরম্ভ করে ৩০ ডিগ্রী দূরত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি হয়। এর ব্যতিক্রম অবশ্য ঘটে, তবে সে কদাচিৎ। নিরক্ষবৃত্তের ৩৫ ডিগ্রী দূরেও কখনও কখনও সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি হয় কিন্তু ৪০ ডিগ্রী পেরিয়ে যেতে দেখা যায় না। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল—নিরক্ষবৃত্তের ৫০ ডিগ্রী দূরে একদল সৌরকলঙ্কের উদ্ভব হয়েছিল।

লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় সৌরকলঙ্কসকল সূর্যপৃষ্ঠে যেন একস্থানে নিবদ্ধ নয়, তারা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যায়। নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ দীর্ঘায়ু সৌরকলঙ্ক সূর্যের পূর্ব প্রান্ত থেকে যাত্রা সুরু করে ১২।১৩ দিন পরে পশ্চিম প্রান্তে

গিয়ে অদৃশ্য হয়, আবার ১২।১৩ দিন বাদে পূর্ব প্রান্তে উদয় হয় (চিত্র-২১)। এতেই বোঝা যায় সূর্য মেরুদণ্ড অবলম্বনে আবর্তন করছে এবং আবর্তন কাল প্রায় ২৬ দিনে একবার। নিরক্ষবৃত্ত থেকে অপেক্ষাকৃত দূরস্থিত কলঙ্করাও ঐরূপ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমা করে, আবার পূর্ব প্রান্তে এসে উপস্থিত
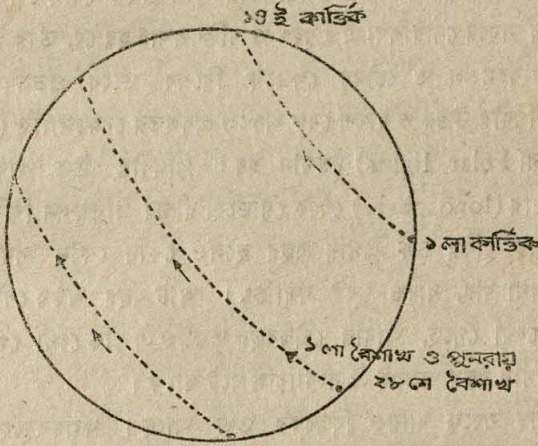
চিত্র-২১—সৌরকলঙ্কের গতি

হয়—কিন্তু এক্ষেত্রে ঘুরে আসার সময় নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ কলঙ্কের তুলনায় কিছু বেশী। অর্থাৎ এসব কলঙ্কের আবর্তন বেগ কিছুটা কম। এইরূপ নিরক্ষবৃত্ত থেকে কলঙ্কগুলি যত দূরস্থ অক্ষাংশে অবস্থিত হয় তাদের আবর্তন বেগ তত কম, ভাষান্তরে তাদের ঘুরে আসতে তত বেশী সময় লাগে। অতএব দেখা যাচ্ছে সূর্য মেরু অবলম্বনে আবর্তন করলেও তার দেহপৃষ্ঠের সকল অংশ একই বেগে আবর্তন করে না। সূর্য কঠিন গোলক নয়, গ্যাসে গঠিত—তাই এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। নদীর তীর-সন্নিহিত অঞ্চলে জলের যে স্রোতোবেগ তদপেক্ষা নদীর মাঝখানে স্রোতোবেগ বেশী, সেইরূপ গ্যাসে গঠিত বলে সূর্যেও মেরু অঞ্চল অপেক্ষা নিরক্ষবৃত্তের সন্নিহিত অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দ্রুত সঞ্চরণশীল। প্রকৃত পক্ষে ডপ্‌লার তত্ত্ব পরীক্ষায় (Doppler Effect) প্রমাণিত হয়েছে সূর্যের নিরক্ষবৃত্ত প্রায় ২৫ দিনে একবার ও মেরু অঞ্চল প্রায় ৩৪ দিনে একবার আবর্তন করছে। তবে সাধারণতঃ বলা হয়, প্রায় ২৬ দিনে সূর্য তার মেরু অবলম্বনে একবার আবর্তন করে।

সূর্যপৃষ্ঠে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সব সময়ে এক প্রকার থাকে না। সংখ্যাটি

প্রতি এগার বছর অন্তর সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির পর ৫.৬ বছর যাবৎ সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে কমে আসে, পরে ৫.৬ বছর ধরে আবার বাড়তে থাকে। এগার বছর পরে কলঙ্কের সংখ্যা সর্ববৃহৎ হয়ে আবার কমতে আরম্ভ করে। বৃদ্ধির সময়ে পৃথিবীর আবহাওয়ায়ও তার নানরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। কলঙ্ক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সৌরশিখার হ্রাস-বৃদ্ধির যোগাযোগ আছে। কলঙ্ক বৃদ্ধির সময়ে সৌরশিখা এত বৃহৎ ও শক্তি সম্পন্ন হয় যে, তার তেজঃকণা পৃথিবীর আবহমণ্ডল ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। সে সময়ে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে প্রবলতর মেরুজ্যোতি (Aurora Borealis বা Polar lights) দৃশ্যমান হয়। পৃথিবীর উচ্চ আবহমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) থেকে রেডিয়ো রশ্মির প্রতিফলন বিঘ্নিত হয়।

সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধির চক্র এগার বছর হলেও কোন কোন সময়ে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়, যদিও খুবই কদাচিৎ। আট বছর অন্তর সৌরকলঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা গেছে, আবার চৌদ্দবছর অন্তরও ঐ বৃদ্ধি দেখা গেছে, তবে সাধারণত এগার বছর অন্তরই ঐ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে আরও বিস্ময়কর তথ্য আছে। কলঙ্কসমূহে চৌম্বক-ধর্ম (Magnetic Properties) বর্তমান। এদের উৎপত্তি হয় সাধারণত জোড়ায় জোড়ায়। সূর্যের উত্তর গোলার্ধে জোড়ার প্রথমটি যদি হয় চৌম্বক উত্তর পোল (North Pole), তবে জোড়ার দ্বিতীয়টি হবে দক্ষিণ পোল (South Pole)। তার পরের জোড়াগুলিও ঠিক এই ভাবেই প্রথমটি উত্তর পোল ও দ্বিতীয়টি দক্ষিণ পোল। সূর্যের দক্ষিণ গোলার্ধেও অনুরূপ স্থানে জোড়ায় জোড়ায় কলঙ্ক দেখা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ পোল বিপরীত ভাবে সাজানো; অর্থাৎ জোড়ার প্রথমটি দক্ষিণ পোল ও দ্বিতীয়টি উত্তর পোল। এগার বছর পর এই ক্রমটি উল্টে যায়। তখন উত্তর গোলার্ধে জোড়ার প্রথমটি দক্ষিণ পোল ও দ্বিতীয়টি উত্তর পোল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে জোড়ার প্রথমটি উত্তর পোল ও দ্বিতীয়টি দক্ষিণ পোল। কলঙ্কের এ সকল চৌম্বক তথ্য এখনও বিজ্ঞানীদের গবেষণাধীন।

সৌরজগতের কাছে সূর্য যত মহিমময়ই হোক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সূর্য নিতান্তই একটি সাধারণ নক্ষত্র। ছায়াপথ বিশ্বের কেন্দ্র ও তার প্রান্তের প্রায় মধ্যস্থলে এর অবস্থিতি। ছায়াপথ দ্বীপজগৎটি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, কুমোরের চাকার মতো ঘুরছে। এর ফলে ছায়াপথ বিশ্বের

অন্তর্গত সমস্ত কিছুই তার কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে। অতএব সূর্যকেও তার সমগ্র সৌরজগৎসহ ছায়াপথ কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকার পথে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। এই কক্ষ পরিক্রমায় সূর্যকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দেড় শত মাইল অগ্রসর হতে হয়। এই প্রচণ্ড গতিবেগ সত্ত্বেও ছায়াপথ কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে তার সময় লাগে কুড়ি কোটি বছর। সূর্যের বয়স যদি হয়ে থাকে ৫০০ কোটি বছর তাহলে এ যাবৎ সে মাত্র ২৫ বার চক্কর দিয়েছে। পৃথিবী যেমন মেরু অবলম্বনে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করতে করতে ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্যও তেমনি মেরু অবলম্বনে ২৬ দিনে একবার আবর্তন করতে করতে ২০ কোটি বছরে একবার ছায়াপথ বিশ্বের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। অন্য ভাষায় বলা যায়, পৃথিবীর ২৬ দিনে সূর্যের এক দিন, পৃথিবীর কুড়ি কোটি বছর সূর্যের এক বছর।

পূর্বেই বলা হয়েছে সূর্য একটি গ্যাস পিণ্ড। বাঙ্গালী বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা সূর্যালোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন, ঘন-আয়তন হিসেবে সূর্যের গঠন-উপাদানের ৮১·৭ ভাগ হাইড্রোজেন, ১৮·১৭ ভাগ হিলিয়াম ও অবশিষ্ট মাত্র ০·০৭ ভাগ হচ্ছে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, লৌহ, নিকেল, তামা, দস্তা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক পদার্থের গ্যাস। সূর্যের বহির্ভাগ অপেক্ষা অভ্যন্তরের তাপ ও চাপ ক্রমান্বয়ে বেশী। সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেড, কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সূর্যদেহের গড়-ঘনত্ব জলের ১·৪ গুণ। কিন্তু তার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনত্ব এত বিরাট যে, তথায় চাপ ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুচাপের এক শত কোটি গুণেরও বেশী।

কেন্দ্রের দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পরমাণুরা তাদের গঠন-তন্ত্র ঠিক রাখতে পারে না, পারমাণবিক বিক্রিয়া (Nuclear Rcactions) হতে থাকে। এতে নানাবিধ বিবর্তনের ধারায় হাইড্রোজেন শেষ পর্যন্ত হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়। এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়া থেকেই তেজের উৎপত্তি এবং হিলিয়ামই হাইড্রোজন জ্বালানীর ছাই। সূর্যের কেন্দ্রাঞ্চলে প্রতি সেকেণ্ডে ৫৬ কোটি টনেরও বেশী হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে সূর্যের কেন্দ্রীয় স্থানে যে বিরাট পরিমাণ তেজ উৎপন্ন হয় সেই তেজ ক্রমান্বয়ে পরিবহনাদি সূত্রে সূর্যের উপরতলে চলে আসে ও

সেখান থেকে বহির্বিশ্বে বিকীর্ণ হয়ে যায়। পৃথিবী তার একটি অতি নগণ্য অংশই পায় কিন্তু তাও এত বৃহৎ যে, তার দ্বারাই সমস্ত পার্থিব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। বিগত ৫০০ কোটি বছর কিংবা তার চেয়েও বেশী কাল ধরে সূর্য এই হারে তেজ বিকিরণ করে আসছে, আরও ৫০০ কোটি বছর অথবা ততোধিক সময় সূর্য স্বচ্ছন্দে এই হারে তেজ বিকিরণ করতে পারবে কিন্তু পরে তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডার যত কমবে ততই তার জরা ও বার্ধক্য আসতে থাকবে, অমিত তেজ ক্রমে কমে আসবে, সূর্যদেহেরও নানা পরিবর্তন ঘটবে। অবশেষে একদিন নিভে যাবে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন সূর্যের সম্পূর্ণ নিভে যেতে এখনও ১০০০ কোটি বছর বিলম্ব আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌরজগৎ

সূর্য এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন নভোচারীদের নিয়ে সৌরজগৎ। সূর্যের সংসারে আছে নয়টি গ্রহ, একত্রিশটি উপগ্রহ, হাজার ত্রিশেক গ্রহাণু, অন্তত দশ হাজার ধূমকেতু, অগণিত উল্কা এবং তাছাড়া অদৃশ্য অবস্থায় হাল্‌কাভাবে সৌর-জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ধূলিকণা, গ্যাসীয় অণু-পরমাণু ও তাদের ভগ্নাংশ। মানুষের বাসভূমি পৃথিবী ঐ সৌর পরিবারস্থ নয়টি গ্রহের অন্যতম। আয়তনে সৌরজগৎ পৃথিবীর তুলনায় কোটি কোটি গুণ বড়। বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার মধ্যে সৌরজগৎ নিতান্তই নগণ্য, তবুও মানুষের দৃষ্টিতে তার বৈচিত্র্য অসাধারণ, আয়তন অসামান্য।

আপন আপন বিশিষ্ট কক্ষপথে গ্রহগণ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, উপগ্রহগণ গ্রহদের প্রদক্ষিণ করতে করতে সূর্যের চারদিক ঘুরে আসে, অনুরূপভাবে সৌরজগৎস্থিত গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু প্রভৃতি সকল জ্যোতিষ্কই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুত সৌরজগতের প্রত্যেকেই সূর্যের চতুর্দিক পরিক্রমা করে। এই ভাবে পরিক্রমা করে বলেই সৌরপরিবারের প্রত্যেকে টিকে আছে, নয়তো সূর্যের আকর্ষণে তারা সূর্য দেহে লীন হয়ে যেত।

গ্রহদের নাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, গ্রহাণুপুঞ্জ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই ক্রমানুবর্তিতায় গ্রহগণ সূর্য থেকে ক্রমান্বয়ে দূরতর ভ্রমণ কক্ষে অবস্থিত। যে গ্রহ যত দূরে তার ভ্রমণকক্ষ তত বড় এবং ভ্রমণ বেগও তত মন্থর (চিত্র-২২)। যে গ্রহের যে দূরত্ব তার পরবর্তী গ্রহের দূরত্ব তার প্রায় দ্বিগুণ—সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্বের এই একটা মোটামুটি নিয়ম পরিলক্ষিত হয় (প্লেট-ছ)।

অতি পুরাকালেও পৃথিবী ছাড়া অন্য পাঁচটি গ্রহের সন্ধান মানুষ জানতো। ভারতীয় আর্য জ্যোতিষে ঐ পাঁচটি গ্রহের নাম—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। অপর গ্রহ কয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আবিষ্কার। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হর্শেল ইউরেনাস গ্রহটির সন্ধান পান। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিসিলি দ্বীপের জ্যোতিষী পিয়াজী (Piazzi) গ্রহাণুপুঞ্জের বৃহত্তম

সিরিসকে (Ceres) আবিষ্কার করেন। সিরিসের ব্যাস ৫০০ মাইলেরও কম। এর পর একে একে বহু গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া যায়। এমনি প্রায় হাজার ত্রিশেক গ্রহকণার সমবায়কে গ্রহাণুপুঞ্জ বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম

চিত্র-২২—সৌর পরিবার

দশকে আডামস্‌ ও লেবেরিয়ার নেপচুন গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। লাওয়েল (P. Lowell) ও টমবাও (Tombough) ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্লুটোর সন্ধান পান।

গ্রহরা প্রত্যেকেই উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কাজেই এক সময় তারা সূর্যের নিকটস্থ হয়, অন্য সময়ে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হয়ে পড়ে। পৃথিবী সূর্যের নিকটস্থ হলে তার দূরত্ব হয় ৯ কোটি ১৪ লক্ষ মাইল, যখন দূরে যায় তখন ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল। সুতরাং সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সৌরজগতে সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধানকে দূরত্বের একক বলে গণ্য করা হয়। এই হিসেবে অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্ব ১ ধরে গ্রহগণের গড়-দূরত্ব এইরূপ—বুধ—০·৩৯, শুক্র—০·৭২, পৃথিবী—১, মঙ্গল—১·৬, গ্রহাণুপুঞ্জ—২·৮, বৃহস্পতি—৫·২, শনি—৯·৫৪, ইউরেনাস—১৯·২, নেপচুন—৩০·০, প্লুটো—৩৯·০।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বোড (Bode) ও তাঁর সহকর্মী টিসিয়াস (Titius) জ্যামিতিক প্রগতিতে সাজানো একটি বিশিষ্ট সংখ্যা-সারিতে ৪ যোগ করে গ্রহদের গড়-দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। তারা সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধকে 0 ও তারপর ৩ থেকে ক্রমে দ্বিগুণিত করে পরবর্তী গ্রহদের একে একে স্থান নির্দেশ করে সংখ্যা সারিটি সাজালেন—০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২, ৩৮৪, ৭৬৮। এদের সঙ্গে ৪ যোগ করলে হয়—

৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০, ১৯৬, ৩৮৮, ৭৭২

এখানে ১০ সংখ্যাটি পৃথিবীর নির্দেশক। ১০কে দূরত্বের একক ধরলে বুধ থেকে পর পর গ্রহগণের গড়দূরত্ব দাঁড়ায়—

০·৪, ০·৭, ১, ১·৬, ২·৮, ৫·২, ১০·০, ১৯·৬, ৩৮·৮, ৭৭·২

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন কালের পরিচিত গ্রহগণের গড়-দূরত্বের সঙ্গে সংখ্যাগুলির প্রায় হুবহু মিল আছে কিন্তু মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে ২৮ স্থানটি ফাঁকা, শনির পরের স্থানগুলিতেও কোন গ্রহ জানা নেই। পরে ক্রমে ১৯৬ সংখ্যার স্থানে ইউরেনাসকে পাওয়া গেল, ২৮ সংখ্যার জায়গায় গ্রহাণুপুঞ্জেরও অবস্থান প্রমাণিত হলো। কিন্তু সংখ্যা-সারিতে নির্ণীত নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্বের সঙ্গে তাদের প্রকৃত দূরত্বের একেবারেই মিল নেই।

সংখ্যাগত এই প্রণালীটি "বোড-টিসিয়াস ল" নামে বিখ্যাত। কিন্তু এই সংখ্যা-সারির কোনও বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক ভিত্তি আজও জানা যায় নি এবং উক্ত বিজ্ঞানীরাও কোনও ব্যাখ্যা দেন নি।

সূর্যের চারদিকে গ্রহদের প্রদক্ষিণ কক্ষ উপবৃত্তাকার। কিন্তু প্লুটো, মঙ্গল এবং বুধ ব্যতীত অন্যদের কক্ষপথ উপবৃত্ত থেকে এত সামান্য বিচ্যুত যে, তাদের বৃত্তাকার বলেই ধরে নেওয়া যায়। কক্ষগুলি সূর্যের নিরক্ষবৃত্তের প্রায় সমতলে অবস্থিত—সামান্য কিছু উপরে বা নীচে। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পরিক্রমা করে গ্রহগণ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আর মেরুদণ্ড অবলম্বনে গ্রহরা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে লাটুর মতো আবর্তন করে। কক্ষপথের উপর গ্রহগুলির অক্ষ সমকোণে দাঁড়ানো নয়—সকলেই কিছু না কিছু হেলে রয়েছে। পৃথিবীর বিষুব-সমতল কক্ষের উপর ২৩½ ডিগ্রী হেলে আছে। ইউরেনাস হেলে আছে প্রায় ৯০ ডিগ্রী ; অর্থাৎ ইউরেনাস যেন শুয়ে শুয়ে পাক খাচ্ছে আর কক্ষপথে অগ্রসর হচ্ছে এবং অন্যগ্রহরা কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাক খেতে খেতে কক্ষপথে এগিয়ে যাচ্ছে। ধূমকেতুর কক্ষপথ সুদীর্ঘ উপবৃত্ত,

তার ফলে তারা এক সময়ে সূর্যের অতি সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়, অন্য সময়ে সুদূরবর্তী হয়।

গ্রহগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল—এরা প্রধানত কঠিন বস্তুতে গড়া। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন অতিকায় বা বৃহৎ গ্রহ—এদের গঠনে গ্যাসীয় উপাদান বেশী। প্লুটো একটু খাপছাড়া—আয়তনে বুধ বা মঙ্গলের মতো হতে পারে। গ্রহাণুপুঞ্জের গ্রহকণা-গুলি কঠিন বস্তুতে গড়া—এরা সংখ্যায় হাজার ত্রিশেক। মঙ্গল ও বৃহস্পতির অন্তর্বর্তী স্থানে বিভিন্ন কক্ষপথে এদের বিচরণ—সমগ্র অঞ্চলটিকে এরা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন একটি বৃহৎ গ্রহ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে এই পরিণতি ঘটেছে কিংবা আদিতে সৃষ্ট টুক্‌রোগুলি অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টির প্রণালী মতো একত্র সন্নিবদ্ধ হয়ে একটি বৃহৎ গ্রহে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় নি। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে আছে বুধ ও শুক্র গ্রহ—তাই এ দুটিকে অন্তঃকক্ষ গ্রহ বলা হয়; পৃথিবী থেকে সূর্যের বিপরীতে আছে মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এদের বহিঃকক্ষ গ্রহ বলা হয়

বুধ

নয়টি গ্রহের মধ্যে বুধ আয়তনে ক্ষুদ্রতম এবং অবস্থিতিতে সূর্যের নিকটতম। সূর্যের চতুর্দিকে এর ভ্রমণকক্ষ দীর্ঘ-উপবৃত্ত। সে কারণে নিকটস্থ হলে বুধ সূর্যের ২৮ কোটি মাইলের মধ্যে চলে আসে, দূরতম অবস্থায় তাদের মধ্যে ব্যবধান হয় ৪.৩ কোটি মাইল। সৌর এককে সূর্য থেকে বুধের গড়-দূরত্ব ০.৩৯ অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধানের ০.৩৯ গুণ।

বুধ ৮৮ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, ঠিক ঐ সময়ে মেরু অবলম্বনে একবার আবর্তনও করে। কাজেই বুধের বছর ও দিনমান সমান। এ কারণে বুধের এক পিঠ সর্বদাই সূর্যের দিকে ফিরানো থাকে, অন্য পিঠে চির রাত্রি। সূর্য থেকে দূরতম অবস্থায় সম্মুখস্থ বুধপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, নিকটতম অবস্থায় ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এমন তাপমাত্রায় সীসা প্রভৃতি ধাতুও গলে যায়,—কাজেই বুধে কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, আবার অপর পিঠ সূর্যতেজ বঞ্চিত বলে তথাকার তাপমাত্রা এত কম যে, সে স্থানও প্রাণী বাসের অযোগ্য।

বুধের ব্যাস ২৯০০ মাইল। এর গঠন-উপাদান প্রধানত লৌহ, শিলা

প্রভৃতি কঠিন ভারী বস্তু। ফলে এর ঘনত্বও নেহাৎ কম নয়, গড় ঘনত্ব ৬.১। বুধের ওজন পৃথিবীর প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ এবং অভিকর্ষীয় টান পৃথিবীর আকর্ষণের এক-চতুর্থাংশের বেশী। বুধ থেকে কোনও বস্তু সেকেণ্ডে ২.৪ মাইল বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলে সে বস্তু আর বুধে ফিরে আসবে না, মহাশূন্যে পালিয়ে যাবে। অর্থাৎ বুধপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর প্রস্থান বেগ সেকেণ্ডে ২.৪ মাইল। সূর্যের সান্নিধ্যবশত যে অত্যধিক তাপ তাতে অণু-পরমাণুদের গতিবেগ বেড়ে গিয়ে ঐ সামান্য প্রস্থান বেগ অতিক্রম করা খুবই সহজ, ফলে বুধের উপর যদি কোনও আবহমণ্ডল কোনদিন থেকেও থাকে এখন আর তার কোনও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং কোনও আবহমণ্ডল নেই বলেও বুধ-পৃষ্ঠে প্রাণিবাস সম্ভব নয়।

সান্নিধ্যহেতু বুধের গতিবিধি সর্বদাই সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে। এ কারণে বুধকে খালি চোখে বড় একটা দেখা যায় না, দূরবীনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। সূর্যের পূর্বদিকে থাকলে প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আগে বুধ স্বল্প সময়ের জন্যে দিগ্বলয়ের উপর পূর্বাকাশে দৃশ্য হয়, তেমনি সূর্যের পশ্চিমে থাকলে বুধ সূর্যাস্তের পর স্বল্প সময় পশ্চিম দিগ্বলয়ের উপর দৃশ্যমান থাকে। সূর্যের পশ্চাতে থাকলে তাকে দেখা যায় না, সম্মুখে থাকলে তাকে সূর্যের কপালে কালো টিপের মতো দেখায়। খুব শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া এই অবস্থায় বুধকে দেখার চেষ্টা নিরাপদ নয়।

ইদানীং বেতার-জ্যোতিষীরা বলছেন বুধের বছর ও দিন সমান নয়—বুধ তার প্রদক্ষিণ সময় ৮৮ দিনে হয়তো বার দুই আবর্তন করে, অর্থাৎ হয়তো তার দুই দিনে এক বছর। এরূপ হলে বুধপৃষ্ঠে চিরদিন বা চিররাত্রি কথা-গুলি খাটে না, বুধপৃষ্ঠে প্রতি অংশই কোন না কোন সময়ে সূর্যালোক পায়।

শুক্র

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে অনেক সময় যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিকে দেখা যায় তাকে বলা হয় সন্ধ্যাতারা। আবার কিছু দিন পর, পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের আগেও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখা যায়—একে বলা হয় শুকতারা। প্রকৃতপক্ষে সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা নক্ষত্র নয় এবং বিভিন্ন নয়, উভয়ই এক। এটিই শুক্রগ্রহ। শুক্রের গাত্রাবরণে মেঘমণ্ডল থেকে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আসে বলেই তাকে এত উজ্জ্বল দেখায়।

বুধের ন্যায় শুক্রও অন্তঃকক্ষ গ্রহ। সূর্য থেকে দেখলে বুধের স্থান প্রথম, শুক্র দ্বিতীয়। শুক্র সূর্যের সবচেয়ে কাছে এলে তার দূরত্ব ৬'৬৫ কোটি মাইল, সব চেয়ে দূরে গেলে ৬'৭৫ মাইল। তার মানে শুক্রের কক্ষটি প্রায় বৃত্তাকার। সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধানকে ১ ধরলে, সূর্য থেকে শুক্রের গড় দূরত্ব ০'৭২। বুধ ও পৃথিবীর কক্ষের অন্তর্বর্তী স্থানে শুক্রের কক্ষ। শুক্র যখন পৃথিবীর নিকটতম হয় তখন তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র ২'৪ কোটি মাইল।

শুক্রের ব্যাস ৭৬০০ মাইল এবং ঘনত্ব ৫'০৬। সকল বিষয়েই গ্রহটি পৃথিবীর প্রায় সমতুল্য। শুক্রের ভর পৃথিবীর ভরের চার-পঞ্চমাংশ এবং পৃথিবীর যে অভিকর্ষীয় টান শুক্রের টান তার দশ ভাগের নয় ভাগ। শুক্র-পৃষ্ঠ থেকে বস্তুর প্রস্থান বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৬'৫ মাইল। প্রতি সেকেণ্ড ৬'৫ মাইল বেগে ধাবিত হওয়া গ্যাসীয় অণু-পরমাণুদের পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে শুক্রপৃষ্ঠে একটা আবহমণ্ডল বন্দী হয়ে আছে; এই আবহমণ্ডলের গঠন-উপাদান কি তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। কেউ কেউ বলেন এখানে অক্সিজেন নেই, আছে জলীয় বাষ্প ও আঙ্গারিক গ্যাসের প্রাচুর্য।

২২৪ দিনে শুক্র সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়ের মধ্যে শুক্র একবার পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে আসে, তারপর ক্রমে সূর্যের বিপরীতে চলে যায়। সূর্যের বিপরীতে গেলে পৃথিবী থেকে পূর্ণ-শুক্রকে দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের পাশে থাকলে শুক্রের অংশ-বিশেষ থেকে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন পৃথিবীতে দৃশ্য হয়, কাজেই তখন সে চন্দ্রের ন্যায় কলাবিশিষ্ট। দূরবীনের দৃষ্টিতে শুক্রের কলা দৃশ্যমান হয়। সূর্যের সম্মুখে এলে পৃথিবীর দিকে তার অন্ধকার পিঠ ফিরানো থাকে সুতরাং খালি চোখে মানুষের অদৃশ্য। শুক্র পৃথিবী ও সূর্য এক সমতলে অবস্থিত নয়, নতুবা শুক্র যদি আয়তনে আরও বড় হতো কিংবা পৃথিবীর অনেক কাছে থাকতো তাহলে শুক্র দ্বারা সূর্যগ্রহণ আমরা দেখতে পেতাম।

শুক্র ২২৪ দিনে যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, অনুমান করা হয় মেরু অবলম্বনে শুক্রের আবর্তন বেগও ঐ ২২৪ দিনে একবার, অর্থাৎ এই তার একদিনের পরিমাপ। এরূপ হলে শুক্রের এক দিক সর্বদাই সূর্যের দিকে ফিরানো আছে।

গাঢ় সাদা মেঘের মতো একটি আবহমণ্ডল শুক্রদেহকে আবৃত করে

রেখেছে। এই আবরণ ভেদ করে যন্ত্র সাহায্যেও মানুষ শুক্রপৃষ্ঠ দেখতে পায় না। আবার ঐ মেঘের উপরেও কোনও স্থায়ী বা স্থির নিশানা পাওয়া যায় না—এর ফলে শুক্রের আবর্তনবেগ সঠিক জানা যায় না। এখানে বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যও তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। ব্যোমযানে উর্দ্ধাকাশে যন্ত্র পাঠিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় শুক্র প্রায় ২৫০ দিনে একবার আবর্তন করে। তার মানে শুক্রে বছরের চেয়ে দিন বড়।

১৯৬৭ সনের ১৮ই অক্টোবর বুধবার রাশিয়া প্রেরিত একটি মহাকাশ-যান শুক্রপৃষ্ঠে অক্ষতদেহে অবতরণ করে। মহাকাশযানটির নাম দেওয়া হয়েছিল ভেনাস-৪। এই অভিযানে মহাকাশযানটিকে ১২৯ দিন অবিরাম পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে—পৃথিবী থেকে তার যাত্রা সুরু হয় ১২ই জুন। পৃথিবী থেকে শুক্রের নিকটতম দূরত্ব প্রায় আড়াই কোটি মাইল—মহাকাশযানটিকে পথ চলতে হয়েছে তার অনেক বেশী। রাশিয়া এর পূর্বে ১৯৬১ সন থেকে আরম্ভ করে এ যাবৎ ভেনাস-১, ভেনাস-২, ভেনাস-৩ নামক আরও তিনটি মহাকাশযান শুক্র অভিমুখে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ভেনাস-৪-ই প্রথম শুক্রে অবতরণে সাফল্যমণ্ডিত হলো। ১৯৬৬ সনে মার্চ মাসে ভেনাস-৩ শুক্রের পৃষ্ঠভূমির উপর সজোরে পতিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবী থেকে যাত্রা সুরু করে ভেনাস-৪-কে প্রথমে বায়ুশূন্য পথে প্রচণ্ড মহাজাগতিক শৈত্য সহ্য করে ছুটতে হয়েছে, তারপর শুক্রের আবহমণ্ডলের প্রচণ্ড চাপ ও তাপ ভেদ করে শুক্রদেহ স্পর্শ করতে হয়েছে। এর যান্ত্রিক পরিকল্পনা এত নিখুঁত হয়েছিল যে, ঐ সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে এটি ধীরে ধীরে নেমে শুক্রপৃষ্ঠে গিয়ে বসে এবং এর মধ্যেকার যন্ত্রপাতিও নিপুণভাবে কাজ করে চলে। ভেনাস-৪ যে সব বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়েছে পৃথিবীর বহু বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্রে সেগুলি ধরা পড়েছে। ইংলণ্ডের জোড্রেল ব্যাঙ্কের মহাকাশ-বিজ্ঞানী স্যার বার্ণার্ড লোভেল সেই বেতার-বার্তা ধরে রাশিয়ার প্রতিভাধরদের উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন সমগ্র সভ্যজগৎ।

১৯৬২ সনে মার্কিন বিজ্ঞানীরা শুক্র অভিমুখে ম্যারিনার-২ নামক একটি মহাকাশযান পাঠিয়েছিল। সেটি শুক্রদেহ স্পর্শ করতে পারে নি, তার নিকট দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সময়ে যেসব বেতার-বার্তা পাঠিয়েছিল, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেসব ধরে শুক্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করেছিলেন। এ সকল তথ্য

থেকে ভেনাস-৪-এর প্রেরিত তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক। ভেনাস-৪-এর শুক্রে অবতরণের দেড়দিন পর মার্কিন বিজ্ঞানীদের ম্যারিনার-৫ নামক যানটি শুক্রের নিকট দিয়া যাওয়ার সময়ে শুক্র সম্বন্ধে আরও কিছু বেতার-বার্তা পাঠিয়েছে।

ভেনাস-৪ যে বেতার-বার্তা পাঠিয়েছে তাতে জানা যায় শুক্রপৃষ্ঠে আবহস্তরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ২৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফারেনহীট স্কেলে ১০২ ডিগ্রী থেকে ৫৩৬ ডিগ্রীর মধ্যে ওঠা-নামা করে। শুক্রপৃষ্ঠে তার আবহমণ্ডলেব চাপ সম্বন্ধে ভেনাস-৪ খবর দিয়েছে ঐ চাপ ভূপৃষ্ঠের চাপের সমান থেকে ১৫ গুণ। ভেনাস-৪ বলে শুক্রগ্রহের কোনও উল্লেখযোগ্য চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। পৃথিবীর ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের মতো শুক্রগ্রহের কোনও বিকিরণ বলয়ও নেই। ভেনাস-৪-এর অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য এই যে, শুক্রের আবহমণ্ডলেয় প্রায় সবটাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড —শতকরা ০'৪ ভাগ মাত্র অক্সিজেন গ্যাস। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের পূর্ব অনুমিতি অনুসারে সামান্য জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসও থাকা সম্ভব। এই সব তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, শুক্রপৃষ্ঠ মানুষের মতো প্রাণীর বাসের অযোগ্য। তথাপি এ কথা জোর করে বলা যায় না যে, শুক্রগ্রহে অপর কোনও জীবকোষের বাঁচা সম্ভব নয়।

পৃথিবী

শুক্রের পরবর্তী গ্রহ আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চন্দ্রের কথা অন্য বিশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মঙ্গল

সূর্য থেকে পর পর সাজালে মঙ্গল চতুর্থ গ্রহ। পৃথিবীর কক্ষ পেরিয়ে মঙ্গলের কক্ষ—তাই মঙ্গল বহিঃকক্ষ গ্রহ। নিকট ও দূর অবস্থায় সূর্য ও মঙ্গলের ব্যবধান যথাক্রমে ১২'৮ ও ১৫'৫ কোটি মাইল। সূর্যের এপাশে থাকলে পৃথিবী ও মঙ্গলের সর্বনিম্ন দূরত্ব দাঁড়ায় ৩'৪ কোটি মাইল, সূর্যের ওপাশে গেলে পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব সর্বাধিক—তখন ব্যবধান ২৫'০ কোটি মাইল। সৌরমাপে সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধানকে একক ধরলে সূর্য থেকে মঙ্গলের গড়-

দূরত্ব ১'৫২। পৃথিবী থেকে দূরত্ব যখন সর্বাপেক্ষা কম তখন জ্যোতির্বেত্তাদের মঙ্গল পর্যবেক্ষণের সবচেয়ে অনুকূল সময়।

৬৮৭ দিনে মঙ্গল একবার তার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে আর মেরু অবলম্বনে তার আবর্তন কাল ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার। অর্থাৎ মঙ্গলের দিন রাত্রির পরিমাপ পৃথিবীর দিবারাত্রির প্রায় সমান এবং পৃথিবীর প্রায় দুই বছরের মাপে তার এক বৎসর। মঙ্গলের কক্ষের উপর তার বিষুববৃত্তের সমতল প্রায় ২৫ ডিগ্রী হেলে আছে,—পৃথিবীর যেমন আছে ২৩½ ডিগ্রী। অতএব মঙ্গলে ঠিক পৃথিবীর মতোই ঋতু পরিবর্তন ঘটে তবে প্রতি ঋতুই পৃথিবীর তুলনায় অনেক দীর্ঘস্থায়ী। মঙ্গলগ্রহ সূর্য থেকে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক দূরতর স্থানে আছে—এ জন্যে সূর্যতেজ অপেক্ষাকৃত কম পায় এবং সে কারণে সেখানকার তাপমাত্রাও কম। সূর্যোদয়ে নিরক্ষ অঞ্চলে তাপমাত্রা – ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, দুপুরে তাপমাত্রা বেড়ে ৩০ ডিগ্রী হয়। নৈশ তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে ৯০ ডিগ্রী নেমে যায় বলে অনুমিত হয়।

মঙ্গলের ব্যাস ৪২০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকের কিছু বেশী এবং এর গড়-ঘনত্ব ৪·১২। মঙ্গলের ভর পৃথিবীর ভরের এক-দশমাংশ এবং অভিকর্ষীয় টান পৃথিবীর টানের ০'৩৮ অংশ। এ কারণে মঙ্গলের উপর থেকে পদার্থের প্রস্থান বেগ প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ৩'২ মাইল। এই সামান্য প্রস্থান বেগ সত্ত্বেও মঙ্গলের উপর যে একটা আবহমণ্ডল বর্তমান আছে এটাই বিস্ময়কর। তবে এ আবহমণ্ডল নিরতিশয় হাল্‌কা। পৃথিবীর প্রায় এক লক্ষ ফুট ঊর্ধ্বে বায়ুর যে চাপ মঙ্গলপৃষ্ঠে আবহের চাপ তদনুরূপ।

মঙ্গলের আবহমণ্ডলে কখনও কখনও মেঘ দেখা যায়, তবে পার্থিব মেঘের তুলনায় খুবই কম। এতেই অনুমিত হয় মঙ্গলগ্রহে কিছু পরিমাণ জল আছে। ইদানীং জানা গিয়েছে মঙ্গলের আবহমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ সর্বাধিক, তারপর আঙ্গারিক গ্যাস এবং অল্প কিছু আছে আর্গন গ্যাস। অক্সিজেন প্রায় নেই। একদা অবশ্যই প্রচুর অক্সিজেন ছিল কিন্তু মঙ্গলের পৃষ্ঠস্থিত লৌহ, শিলা প্রভৃতির সঙ্গে রাসায়নিক যৌগিক সংগঠনে সেই অক্সিজেন ক্রমে হ্রাস পেতে পেতে বর্তমানে তার পরিমাণ মঙ্গলে নামমাত্র।

অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় লৌহ মরিচায় পরিণত হয়েছে বলেই বোধ হয় আকাশে মঙ্গলকে রক্তবর্ণ দেখায়। কিন্তু দূরবীনে এর গাত্রে বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানে স্থানে হলদেটে লাল, কোথাও বা নীলাভ সবুজ দেখায়।

চন্দ্র-পৃষ্ঠেও শিলা আছে কিন্তু তার গায়ের রং ধূসর। মঙ্গলের শিলা অক্সিজেনের যৌগিক ক্রিয়ায় হলদেটে লাল বর্ণ হয়ে গেছে, চন্দ্রে অক্সিজেন না থাকায় তার ধূসর বর্ণ বদলায় নি। নীলাভ সবুজ অঞ্চলটিকে আগে মঙ্গলের সমুদ্র মনে করা হয়েছিল এবং পৃথিবীবাসী তথাকার স্থান বিশেষকে যে সকল নামে চিহ্নিত করেছে তার বাংলা অনুবাদ যৌবন নির্ঝর, ভিনাস সাগর প্রভৃতি। বর্তমানে এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে। মঙ্গলের গাত্রপৃষ্ঠে সম্ভবত শ্যাওলা-জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় তাই সে জায়গা নীলাভ সবুজ (প্লেট-জ)।

সময় বিশেষে মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুকেই সাদা টুপি পরিহিত দেখা যায়, আর দেখা যায় তার গায়ের উপর ছক কাটা জ্যামিতিক রেখা। পৃথিবীর উভয় মেরুতেই যেমন বরফ জমা আছে, মঙ্গলের মেরুতেও তেমনি বরফ জমাট হয়ে থাকে বলে তাকে সাদা টুপি মনে হয়। মঙ্গলের গ্রীষ্ম ঋতুতে এই বরফ অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু মঙ্গলের বরফের বিস্তার বেশী নয় এবং গভীরতাও সামান্য কয়েক ফুট মাত্র। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এককালে কল্পনা করেছিলেন মঙ্গলের গাত্রস্থিত জ্যামিতিক রেখাগুলি তথাকার বুদ্ধিমান অধিবাসীদের দ্বারা কর্তিত কৃত্রিম খাল। বিষুব অঞ্চলের উষর ভূমিতে সেচ-কার্য দ্বারা কৃষি উৎপাদনের অভিপ্রায়ে মেরুর বরফ-গলা জল পরিবহনের জন্যে ঐ সমস্ত খাল কাটা হয়েছে। আবার অনেক বিজ্ঞানী ঐ সব খাল দেখতে পান নি এবং তাঁদের মতে যাঁরা দেখেছেন বলেন এটা তাদের দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। দূরবীনে এ ধরণের দৃষ্টিবিভ্রম খুবই স্বাভাবিক। জীব-বিজ্ঞানীরাও বলেন মঙ্গলের অক্সিজেন শূন্য ঐ প্রকার হাল্কা আবহমণ্ডলের মধ্যে কোন উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর জীবনধারণ এবং সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত ম্যারিনার-৪ নামক একটি রকেটযান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ২২৯ দিন ক্রমাগত ছুটে ১৩ কোটি মাইল অতিক্রম করে ১৯৬৫ সনের ১৪ই জুন মঙ্গলগ্রহের প্রায় ৬ হাজার মাইলের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। যন্ত্রপাতিগুলি সেখান থেকে ২১টি টেলিভিসন ফটো পাঠায়। সেই সব ফটো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মঙ্গলের চৌম্বক ক্ষেত্র অতিশয় দুর্বল; মঙ্গলের আবহমণ্ডলে জলীয় অংশ খুব কম এবং সে আবহে প্রধানত নাইট্রোজেন, আঙ্গারিক গ্যাস ও আর্গনের মিশ্রণ। চাঁদের পৃষ্ঠে খাদের মতো মঙ্গলের পৃষ্ঠেও উল্কাপতনের ক্ষতের অনুরূপ খাদ বর্তমান। ২১টি ফটোতে প্রায় ৭০টি খাদ, তাদের বৃহত্তমটির মুখের ব্যাস ৭৫ মাইল। সামান্য অঞ্চলের ফটোতে এত

খাদ থাকলে মঙ্গলের সমগ্র উপরতলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক হাজার। এত খাদের অস্তিত্ব দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন মঙ্গলের আবহ চিরদিনই হাল্কা বলে ভূমির অবক্ষয় বিশেষ ঘটে নি এবং সেজন্যে খাদও বিলুপ্ত হয় নি। কোন পর্বত শ্রেণী বা সমুদ্রের ছবিও ফটোতে নেই। সব মিলিয়ে বিজ্ঞানীদের অনুমান উচ্চশ্রেণীর কোনও প্রাণীর আবাস স্থল মঙ্গল হতে পারে না। শ্যাওলাজাতীয় গুল্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণুজাতীয় প্রাণী মঙ্গলে থাকা বিচিত্র নয়।

যে সব জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে বেড়ায় তাদের বলে উপগ্রহ, যেমন—চাঁদ পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ। মঙ্গলের আছে দুটি উপগ্রহ—তাদের নাম ফোবাস (Phobos) ও ডাইমস (Deimos)। মঙ্গল থেকে ফোবাসের গড়-দূরত্ব সাড়ে ছয় হাজার মাইল, ডাইমসের ১৪ হাজার মাইল। ফোবাস মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টায় একবার, ডাইমস প্রদক্ষিণ করে ৩০ ঘণ্টায় একবার। মঙ্গল যে দিকে আবর্তন করে সৌরজগতের সাধারণ নিয়মানুযায়ী ফোবাস এবং ডাইমসও সেই দিকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু ফোবাসের প্রদক্ষিণ বেগ মঙ্গলের আবর্তন বেগের চেয়ে বেশী হওয়ায় মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে দেখা যাবে ফোবাস সারাদিনে ৩।৪ বার পশ্চিমে উদিত হচ্ছে ও পূর্বে অস্ত যাচ্ছে। ডাইমসের ক্ষেত্রে এরূপ বিপরীত পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই।

আর্য জ্যোতিষে মঙ্গলকে যুদ্ধ, সৈন্য, যুবক, দুর্ঘটনা রক্তপাত ইত্যাদির প্রতীক বলা হয়। মঙ্গলগ্রহের ইংরেজী নাম মার্স (Mars)। গ্রীক পুরাণে মার্স যুদ্ধের দেবতা। আকাশে গ্রহটি দেখা দেয় লালবর্ণ নক্ষত্রের মতো, যেন ঐ ক্রুদ্ধ দেবতার রক্তচক্ষু। তার উপগ্রহদেরও অনুচর উপযোগী নামকরণ করা হয়েছে, আতঙ্কের অর্থ-বোধক শব্দদ্বয় ফোবাস ও ডাইমস।

গ্রহাণুপুঞ্জ

'বোড-টিসিয়াস ল' অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতির অন্তর্বর্তী স্থানে এক কক্ষে একটি গ্রহ থাকা উচিত—কিন্তু এই স্থানটি ফাঁকা বলেই অনুমিত হয়ে আসছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিসিলির জ্যোতিষী পিয়াজী (Piazzi) মঙ্গলের পরে একটি ক্ষুদ্র নভোচারীর সন্ধান পান। রোমক দেবতার নাম অনুকরণে তার নাম দেওয়া হলো সিরিস (Ceres)। জ্যোতিষ্কটির ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। দূরত্ব মেপে দেখা গেল বোড-টিসিয়াস যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন জ্যোতিষ্কটির কক্ষ ঠিক সেই দূরত্বেই অবস্থিত—সৌরমাপের এককে যার গড়-

দূরত্ব ২'৮ অর্থাৎ সূর্য থেকে প্রায় ২৭ কোটি মাইল দূরে। তারপর ঐ অঞ্চল ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে আরও অনেক ছোট ছোট জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হলো। এরা সকলেই উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আচরণে গ্রহের মতো অথচ আয়তনে ক্ষুদ্র—তাই এদের প্রত্যেককে বলা হয় গ্রহাণু বা গ্রহকণা, যৌথ নাম গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)। এদের মধ্যে সিরিস সবচেয়ে বড়, দ্বিতীয় বৃহৎটির ব্যাস মাত্র ৩০০ মাইল। ১০০ মাইল, ৫০ মাইল, ১০ মাইল, ১ মাইল ব্যাসের এবং আরও ক্ষুদ্রতর গ্রহকণার অভাব নেই। একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না যাদের ব্যাস তাদের সংখ্যা বর্তমানে অনুমিত হচ্ছে হাজার ত্রিশেক। তাছাড়া আরও ক্ষুদ্র গ্রহকণা আছে অগণিত—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে। এ যাবৎ প্রায় দুই হাজার গ্রহকণা সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, এরাই তালিকাভুক্ত গ্রহাণু। গ্রহকণাদের মধ্যে যাদের নামকরণ করা হয়েছে তাদের কয়েকটি সিরিস, ঈরস (Eros), ভেষ্টা (Vesta), পেলাস (Pallas) হিডালগো (Hidalgo) প্রভৃতি নামে পরিচিত।

গ্রহাণুদের কক্ষপথ প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেকের কক্ষ অত্যন্ত বেশী উপবৃত্তাকার। তার ফলে কোন গ্রহকণা বুধের সীমানা পেরিয়ে সূর্য সন্নিধানে চলে যায়, কেউ বা এদিকে নেপচুনের কক্ষকেও অতিক্রম করে; বৃহস্পতির সান্নিধ্যে চলে যায় চৌদ্দটি গ্রহকণা, পৃথিবীর কাছে আসে ঈরস; হিডালগো শনির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। তবে অধিকাংশ সংখ্যক গ্রহাণুই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে থাকে (চিত্র-২২)। কক্ষগুলি এক সমতলে অবস্থিত নয় এবং কোন কোন কক্ষ সমতল রবিমার্গের সঙ্গে এত হেলানো যে, ৪৩ ডিগ্রী পর্যন্ত কোণ উৎপন্ন হয়ে যায়।

গ্রহকণাদের আকৃতি সকলের এক রকম নয়—কেউ গোলক, কেউ দীর্ঘ-বৃত্তাণ্ড, কেউ ভগ্ন পর্বত চূড়ার মতো। পৃথিবীর খুব কাছে আসে বলে ঈরসের আকৃতি-প্রকৃতি একটু ভালভাবে জানা গেছে। ঈরস আকৃতিতে নোড়ার মতো, ১৫ মাইল লম্বা ও ৫ মাইল প্রশস্ত, গড়িয়ে গড়িয়ে ঘোরে না, পাঁচ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে চরকির মত; সূর্য প্রদক্ষিণ করে ২১ মাসে। গ্রহকণাদের প্রত্যেকেরই আবর্তন গতি ও প্রদক্ষিণ গতি বিভিন্ন। আবর্তন গতি কারও ৮।১০ ঘণ্টা, কারও এর চেয়ে বেশী, কারও কম। গঠন-উপাদানে অধিকাংশ গ্রহাণুই পাথর, বড়গুলি সাধারণত লৌহ ও নিকেলের মিশ্রণ।

অনেক বিজ্ঞানী বলেন নির্দিষ্ট কক্ষটিতে এককালে একটিমাত্র গ্রহই ছিল

কিন্তু কোনও কারণে সেটা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। আবার অনেক বিজ্ঞানীদের ধারণা গ্রহ সৃষ্টির প্রাক্কালে যে সব ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড সৃষ্ট হয়েছিল তারা জমাট বেঁধে একটি মাত্র বৃহৎ পিণ্ড বা গ্রহে রূপান্তরিত হওয়ায় কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই তারা ক্ষুদ্রাকারেই রয়ে গেছে।

কোনও বৃহৎ গ্রহ বা উপগ্রহদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের অভিকর্ষীয় টানে গ্রহকণারা কক্ষচ্যুত হয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে ঐ সব গ্রহাণু উল্কার মতো ছুটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রহ-উপগ্রহদের গায়ে আঘাত করতে পারে। মঙ্গলপৃষ্ঠের খাদ বা চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্ষত যে বহুলাংশই গ্রহাণুর আঘাতের ফল তাতে সন্দেহ নেই। গ্রহকণা দ্বারা সৃষ্ট খাদ ভূপৃষ্ঠেও অনেক থাকা সম্ভব ছিল কিন্তু আবহমণ্ডল দ্বারা ভূমির অবক্ষয় হয় বলে সে সব ক্ষতচিহ্নের অস্তিত্ব বেশী দিন থাকে না। ভূপতিত গ্রহকণা যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের রাসায়নিক পরীক্ষায় লৌহ, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি পাওয়া গেছে। ইউরেনিয়াম বিশ্লেষণে গ্রহকণাদের বয়স নির্ধারিত হয়েছে ৪৫ কোটি বছর, অর্থাৎ এরা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহদের সমবয়সী।

মানুষের পক্ষে সোনা, রূপা, হীরা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি দ্রব্য বড় লোভনীয়। কোনও দিন কোন গ্রহাণুতে যদি ঐ সকল দ্রব্যের প্রাচুর্য প্রমাণিত হয় তাহলে সেই গ্রহাণুকে ধরে বেঁধে পৃথিবীতে টেনে আনার চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা বিরত থাকবেন না নিশ্চয়ই।

বৃহস্পতি

হিন্দু জ্যোতিষে বৃহস্পতিকে বলা হয় দেবগুরু। বৃহস্পতির ইংরেজী নাম জুপিটার (Jupiter)। জুপিটার গ্রীক পুরাণে দেবরাজ। গুরু এবং রাজা দুটি আখ্যাই বৃহস্পতিতে প্রযোজ্য। সৌরজগতে অন্যান্য সকল গ্রহ-উপগ্রহদের সম্মিলিত ভর অপেক্ষা বৃহস্পতির একার ভর প্রায় দ্বিগুণ। আয়তনে বিরাট, বৃহস্পতির অভ্যন্তরে ১৩০০ পৃথিবী স্থান পেতে পারে। এর দীপ্তিমাত্রা-২·৫। ১ম প্রভার নক্ষত্রকে বহুগুণে হার মানায় যদিও সে ঔজ্জ্বল্য নিজের নয়, সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মি মাত্র।

গ্রহাণুপুঞ্জের পরের কক্ষে বৃহস্পতির অবস্থান। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে বৃহস্পতির ১১ বছর ৯ মাস সময় লাগে। কক্ষপথের উপর বৃহস্পতির গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৮ মাইল। সূর্য থেকে তার সর্বনিম্ন দূরত্ব

৪৭ কোটি মাইল। সর্বাধিক দূরত্ব ৫০৬ কোটি মাইল। সৌর মাপের এককে তার গড়-দূরত্ব ৫'২০। বৃহস্পতির বিরাট দেহটি তার মেরু অবলম্বনে ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে একবার আবর্তন করে। এমন দ্রুত আবর্তনের ফলে তার মেরুদেশ কিছুটা চেপে গিয়ে বিষুব-প্রদেশ ফুলে উঠেছে। নিরক্ষবৃত্তে বৃহস্পতির ব্যাস ৮৯০০০ মাইল আর দুই মেরুর মধ্যেকার ব্যাস ৮৩০০০ মাইল। বিষুব ও মেরু প্রদেশের ব্যাসের পার্থক্য পৃথিবীর যেখানে ২৬ মাইল, বৃহস্পতির সেখানে প্রায় ৬০০০ মাইল। বৃহস্পতির গড়-ঘনত্ব ১'৩৪। এ কারণে আয়তনে বৃহস্পতি পৃথিবীর ১৩০০ গুণ হলেও ওজনে মাত্র ৩২০ গুণ বেশী। পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতির অভিকর্ষীয় টান কয়েক গুণ বেশী এবং বৃহস্পতির পৃষ্ঠ থেকে পদার্থের প্রস্থান বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮ মাইল। এ কারণে বৃহস্পতির জন্মসময়ে যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাস তার আবহমণ্ডলে বন্দী হয়ে পড়েছিল তাদের কেউই ঐ প্রস্থান বেগ অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে পালাতে পারে নি। গ্যাসগুলির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বর্তমানে বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের প্রাধান্য।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন বৃহস্পতির আবহমণ্ডল ৬০০০ মাইল গভীর কিন্তু এ সিদ্ধান্তে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আবহমণ্ডলে যৌগিক ক্রিয়ায় সৃষ্ট জলীয় বাষ্প শৈত্যহেতু জমাট বেঁধে বরফের স্তূপে পরিণত হয়ে আছে কেন্দ্রীয় অষ্টির উপর এবং তার গভীরতা হাজার হাজার মাইল। কেন্দ্রের অষ্টির ব্যাস গ্রহটির সম্পূর্ণ ব্যাসের অর্ধেক বলে অনুমতি হয়েছে।

বৃহস্পতির কেন্দ্রীয় অষ্টির গঠন-উপাদান কি সঠিক ভাবে বলা যায় না। সূর্য থেকে আরম্ভ করে গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান অবধি লৌহ শিলা অঞ্চল। তারপরেও কিছু লৌহশিলা থাকা সম্ভব কিন্তু প্রাচুর্য নেই। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে বৃহস্পতির কেন্দ্রে কিছু পরিমাণ লৌহশিলার সঙ্গে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের বস্তু সকল কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে আছে; তাদের মধ্যে সম্ভবত তেল ও জলের প্রাধান্য।

বৃহস্পতির আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে ১৩০° ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেড। এই তাপমাত্রায় ও ঐ ধরণের আবহে কোন প্রাণীর বাস সম্ভব বলে মানুষ ভাবতে পারে না। গ্রহটির অভ্যন্তরে কোনও তাপ-উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় নি—কাজেই তার বিকীর্ণ-দীপ্তি বোধহয় সর্বতোভাবেই রবি-রশ্মির প্রতিফলন।

বৃহস্পতির উপরিভাগে আছে ঘন গ্যাসের সুগভীর আবহমণ্ডল। এই আবরণ ভেদ করে দূরবীনের দৃষ্টি কোন সময়েই গ্রহটির কঠিন পৃষ্ঠদেশ অবধি পৌছায় না। কাজেই শুক্রপৃষ্ঠের মতো বৃহস্পতির পৃষ্ঠও মানুষের অদৃশ্য। আবরণটির উপরিতলে নিরক্ষবৃত্তের ১০° ডিগ্রী উত্তরে ও ১০° ডিগ্রী দক্ষিণে দুইটি প্রশস্ত গ্যাসীয় কটিবন্ধ সমান্তরাল ভাবে গ্রহটিকে বেষ্টন করে আছে। এদের বর্ণ হলদেটে। মেরু অঞ্চলেও এ ধরণের গ্যাসীয় ফিতার আংশিক আবির্ভাব দেখা যায়। আকৃতি ও আয়তনে এরা সবাই পরিবর্তনশীল। কঠিন বস্তুর উপর যখন তখন এমন পরিবর্তন সম্ভব নয় কাজেই নিঃসন্দেহে গ্যাসের উপরেই কোন কারণে পরিবর্তন ঘটছে। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও বিশদ তথ্য এখনও জানা যায় নি (প্লেট-ঝ)।

বৃহস্পতির বারোটি উপগ্রহ আছে। তাদের মধ্যে আইয়ো (Io), ইউরোপা (Europa), গ্যানিমিড (Ganymede) ও ক্যালিষ্টো (Callisto) প্রধান। গ্যানিমিড ও ক্যালিষ্টোর ব্যাস ৩০০০ মাইল অর্থাৎ আমাদের চন্দ্রের ব্যাসের প্রায় দেড় গুণ। গ্যানিমিড আয়তনে বুধগ্রহটির চেয়েও বড়। এদের কারোরই কক্ষ-সমতল বৃহস্পতির কক্ষ-সমতল ও রবিমার্গের কক্ষ-সমতলের সঙ্গে বিশেষ হেলানো নয়, সে কারণে বৃহস্পতির ছায়ায় প্রবেশ করে উপগ্রহদের ঘন ঘন গ্রহণ লাগে। পৃথিবী থেকে দূরবীনে এ-সব গ্রহণ দৃশ্যমান হয়। হিসেব মত সময়ে গ্রহণ না লাগার কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোর গতিবেগের সন্ধান পান। জ্যোতির্বিদের গণনায় উপগ্রহগুলিতে গ্রহণ লাগার যে সময় নিরূপিত হতো তার বেশ কিছুক্ষণ পরে গ্রহণ দেখা যেত। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল গ্রহণ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তা দেখতে পাই না, কিছুক্ষণ পরে দেখি। অর্থাৎ আলোকের এসে পৌছাতে ঐ সময়টা লেগেছে। এর থেকে হিসেব করেই আলোর গতিবেগ পাওয়া গেল সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

শনি

বৃহস্পতির পরে শনির কক্ষ। শনিও আয়তনে বিরাট—বৃহস্পতিরই সমগোত্রীয়। কিন্তু এর ভর নিতান্তই কম। দশ ঘণ্টা চৌদ্দ মিনিটে শনি মেরু অবলম্বনে একবার আবর্তন করে। দ্রুত আবর্তনের জন্যে তার মেরু প্রদেশ চ্যাপ্টা হয়ে বিষুব অঞ্চলে ফুলে উঠেছে। বিষুব-বৃত্তে শনির ব্যাস

৭৫০০০ মাইল আর দুই মেরুতে ব্যবধান ৬৭০০০ মাইল—অর্থাৎ দুই ব্যাসে প্রায় ৮০০০ মাইলের তফাৎ।

সূর্য থেকে শনির সর্বনিম্ন দূরত্ব ৮৪·১ কোটি মাইল এবং সর্বাধিক দূরত্ব ৯৩·১ কোটি মাইল। এ থেকেই বোঝা যায় তার উপবৃত্ত কক্ষটি প্রায় বৃত্তাকার। সৌর মাপের এককে শনির গড়-দূরত্ব ১০। সূর্যের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে আসতে শনির ২৯½ বৎসর সময় লাগে। শনি অত্যন্ত হাল্‌কা গ্রহ, গড়-ঘনত্ব মাত্র ০·৭। কোন বিরাট জল-সায়রে শনিকে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারলে সে ভেসে থাকতো, অন্য গ্রহদের মতো ডুবে যেত না। এই হাল্‌কা গঠন থেকেই বুঝা যায় শনির গ্যাসীয় আবহমণ্ডল খুব গভীর এবং দূরবীনে শুধু তার আবহই দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহস্পতির আবহের গঠন-উপাদানের মতো শনির আবহেও অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের প্রাচুর্য। এই আবহের নীচে আছে গভীর বরফ-স্তর ও তার নীচে শিলার অস্থি। আবহের উপরে বৃহস্পতির অনুরূপ রঙীন কটিবন্ধও দেখা যায় কিন্তু তাতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না এবং দূরত্ব হেতু আব্‌ছা দেখায়। শনির উপরতল থেকে পদার্থের প্রস্থান বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৩ মাইল।

শনি গ্রহের বৈশিষ্ট্য তার বলয়ত্রয়। শনিপৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ মাইল দূরে একটি চ্যাপ্টা বলয় তার নিরক্ষবৃত্তকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে। বলয়টি প্রসারে ১১৫০০ মাইল। তারপর ১০০০ মাইল ফাঁকা। এরপরে একই সমতলে আবার একটি চ্যাপ্টা বলয় ১৬০০০ মাইল প্রশস্ত। অতঃপর প্রায় ৩০০০ মাইল ফাঁকার পরে আবার ১০০০০ মাইল প্রশস্ত আর একটি বলয় ঐ একই সমতলে অবস্থিত। বলয়গুলির গভীরতা নির্ণয় করা খুবই শক্ত, অনুমান করা হয় এদের গভীরতা ১০ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যে। শনিকে মধ্যে রেখে বলয়ত্রয়ের এদিকের বহিঃপ্রান্ত থেকে বিপরীত দিকের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব ১৭১০০০ মাইল। শনির কক্ষভ্রমণের সময় বলয়গুলি আমাদের চোখের সমতলে এসে উপস্থিত হলে শুধু একটা সরু উজ্জ্বল রেখার মতো দেখা যায়, অন্য সময়ে যখন বলয়ত্রয়ের সম্পূর্ণ প্রসারটা দেখা যায় তখন দূরবীনে দৃশ্যটি অতি মনোহর। বলয়গুলি গ্যাস সৃষ্ট নয়, বালুকণা থেকে খেলার বল পর্যন্ত ছোট বড় নানা আকারের পিণ্ড মৌমাছির ঝাঁকের মতো শনির চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন শনির কোনও এক উপগ্রহ তার অতি সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছিল বলে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ঐ অবস্থায় রয়েছে। এ বিষয়ে ১৮৫০

খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী রচি (Roche) এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রদক্ষিণশীল উপগ্রহ যদি কেন্দ্রীয় গ্রহের ব্যাসার্ধের ২'৪৫ গুণ দূরে এসে পড়ে তাহলে উপগ্রহটি ভেঙ্গে গিয়ে ঐ প্রকার বলয়ে রূপান্তরিত হয়। গ্রহের ব্যাসার্ধের ২'৪৫ গুণকে রচির সীমানা বলা হয়। স্থতরাং শনির কোন উপগ্রহ এককালে নিঃসন্দেহে রচির সীমানার মধ্যে এসে পড়েছিল এবং তারপর তার ঐ দুর্দশা। বলয়ের স্থরম্য দৃশ্যাদি দেখলে দুর্ভাগ্য উপগ্রহটির জন্যে কেউ সমবেদনা জানাবে না। শনির আর একটি উপগ্রহ মিমাসের (Mimas) দিনও আসন্ন, সে এখন শনির ব্যাসার্ধের ৩'১ গুণ দূরে আছে (প্লেট-ঞ)।

বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটির ঐ রূপান্তর গ্রহণের দিন ঘনিয়ে আসছে, এখন সে বৃহস্পতির ব্যাসার্ধের মাত্র ২'৫৪ গুণ দূরে আছে। চন্দ্রের ভবিষ্যৎ এরূপ হলেও নিকট ভবিষ্যতে কোন আশঙ্কা নেই—সে এখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধের বহু গুণ দূরে। তাছাড়া চন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্তী না হয়ে দূরবর্তী হচ্ছে বলেও কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন।

শনির নয়টি উপগ্রহ। নিকটতমটির নাম মিমাস (Mimas)। দূরতমটির নাম ফিবি (Phoebe)। প্রায় ৮০ লক্ষ মাইল দূরস্থিত কক্ষে ফিবি ৫৫০ দিনে শনিকে প্রদক্ষিণ করে। ফিবির বিশেষত্ব এই যে, সে তার আবর্তন গতির বিপরীত দিকে কক্ষ প্রদক্ষিণ করে। শনি থেকে ষষ্ঠ স্থানে আছে তার সর্ববৃহৎ উপগ্রহ টাইটান (Titan)। শনি থেকে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল দূরে টাইটানের ব্যাস ৩৫৫০ মাইল,—শনিকে প্রদক্ষিণ করে ১৬ দিনে। পঞ্চমস্থ রিয়ার (Rhea) ব্যাস ১১৫০ মাইল। বাকী উপগ্রহদের ব্যাস ১০০০ মাইলের কম।

ইউরেনাস

শনির পরবর্তী কক্ষের গ্রহটির নাম ইউরেনাস। আগে শনির পরে কোন গ্রহ আছে কি না জানা ছিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম হর্শেল মিথুন রাশি পর্যবেক্ষণ কালে গ্রহটির সন্ধান পেয়ে প্রথমে ধূমকেতু মনে করেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। বোড-টিসিয়াস ল অনুসারে শনির পরবর্তী কক্ষ যেখানে হওয়া উচিত গ্রহটির কক্ষ ঠিক সেখানেই আছে। অর্থাৎ সৌর এককে কক্ষের গড়-দূরত্ব ১৯'৬ অথবা প্রায় ১৮০ কোটি মাইল। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ইউরেনাস সময় নেয় ৮৪ বছর। গ্রহটির ব্যাস

৩১০০০ মাইল, আপন মেরু অবলম্বনে আবর্তন করে প্রায় ১১ ঘণ্টায় একবার। ইউরেনাস-দেহের গড়-ঘনত্ব ১°৩৬ এবং দেহপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর প্রস্থান বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৩ মাইল। এর আবহমণ্ডলও গভীর এবং তার গঠন-উপাদান প্রধানত মিথেন গ্যাস। ইউরেনাসের পৃষ্ঠতাপ হিমাঙ্কের নীচে ১৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহ আছে। ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের সঙ্গে ইউরেনাসের বিষুব সমতল প্রায় সমকোণে অবস্থিত। এ জন্যে মনে হয় গ্রহটি যেন শুয়ে শুয়ে পাক খেতে খেতে কক্ষপথে এগিয়ে চলেছে। ইউরেনাসের উপগ্রহদের কক্ষসমতলসমূহও ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত।

নেপচুন

বৃহস্পতি শনি ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের অভিকর্ষীয় টান হিসেব করে ইউরেনাসের যেমন গতিবিধি হওয়া উচিত প্রকৃত গতিবিধিতে তার বৈষম্য লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন ইউরেনাসের পর অপর কোনও গ্রহের অবস্থান এ বৈষম্যের কারণ হতে পারে। অঙ্কবিদ আডাম্‌স্ ও লেভেরিয়ারের হিসেব মত স্থানে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নেপচুনকে পাওয়া যায়। গ্রহটি ১৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে মেরু অবলম্বনে একবার আবর্তন করে ও ১৬৫ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। সূর্য থেকে এর গড়-দূরত্ব ২৭৯·৩ কোটি মাইল, সুতরাং এখানে বোড-টিসিয়াস ল-এর গড়মিল দেখা যাচ্ছে।

নেপচুনের ব্যাস ৩৩০০০ মাইল এবং গড়-ঘনত্ব ১·৩২। নেপচুনপৃষ্ঠ থেকে পদার্থের প্রস্থান বেগ সেকেণ্ডে ১৩°৬ মাইল। এজন্যে নেপচুনের উপর থেকেও আবহমণ্ডল পালাতে পারে নি। আবহমণ্ডলটিতে ইউরেনাসের মতো প্রায় সর্বাংশই মিথেন গ্যাস। ইউরেনাস যে সূর্যতাপ পায়, নেপচুন আরও দূরে বলে তার চেয়ে কম তাপ পায় এবং এজন্যে তার গাত্রতাপও অপেক্ষাকৃত কম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সে তাপের পরিমাপ করা সম্ভব হয় নি। নেপচুনের দুটি উপগ্রহ। ট্রাইটন (Triton) নামক উপগ্রহটি আপন আবর্তনের বিপরীত দিকে কক্ষ পরিক্রমা করে। অপর উপগ্রহটির নাম নেরিড (Nereid)।

প্লুটো

বিজ্ঞানী পার্সিভাল লাওয়েল (Percival Lowell) বলেছিলেন

নেপচুনের পরে আর একটি গ্রহ আছে। আকাশের আলোকচিত্র পরীক্ষা করতে করতে টমবাউ (Tombough) ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ এই গ্রহটির সন্ধান পান। তাই ঐ দুই বিজ্ঞানীর নাম জড়িয়ে গ্রহটির নাম রাখা হয় প্লুটো (Pluto)। প্লুটোর প্রদক্ষিণ কক্ষটি অত্যন্ত বেশী উপবৃত্তাকার—সূর্য থেকে এর সর্বনিম্ন দূরত্ব ২৭৫·২ কোটি মাইল ও সর্বাধিক দূরত্ব ৪৫৮·৭ কোটি মাইল। সুতরাং সূর্য থেকে গ্রহটির গড়-দূরত্ব দাঁড়ায় ৩৬৭ কোটি মাইল। এ ক্ষেত্রেও বোড-টিসিয়াস ল-এর গড়মিল হচ্ছে। এর মেরু আবর্তন বেগ জানা যায় নি, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ২৪৮ বছরে একবার। প্লুটোর ব্যাসও মাপা যায় নি তবে মনে হয় মঙ্গলের সমান হতে পারে। এর কোনও উপগ্রহ আছে কিনা এবং অন্যান্য তথ্যও এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। দূরত্ব পর্যালোচনায় সহজেই বুঝা যায় প্লুটো কোনও সময়ে সূর্যসন্নিধানে নেপচুন অপেক্ষাও নিকটতর হয়।

ধূমকেতু

ধূমকেতুর আবির্ভাব অনিয়মিত। তার আগমনের আকস্মিকতা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতো। তাই পুরাকালে মানুষ ধূমকেতুকে অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত মনে করতো। এখনও সে মনোভাব হয়তো একেবারে কাটে নি যদিও তার মূলে একটি মাত্র যুক্তি এই যে, ধূমকেতুর মুণ্ডটি পৃথিবীগাত্রে কোথাও লেগে গেলে অল্প বিস্তর ধ্বংসলীলার সম্ভাবনা। আমাদের আকাশে নৈসর্গিক বৈচিত্র অনেক আছে কিন্তু উজ্জ্বল একটি ধূমকেতুর দৃশ্য যেমন মনোহর ও রোমাঞ্চকর তেমন আর কিছু নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খালি চোখে দেখা যায় যেসব ধূমকেতু তাদের আবির্ভাব বিরল।

আগে মনে করা হতো সকলে না হলেও কোন কোন ধূমকেতু বহির্বিশ্ব থেকে এসে সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং ছুটতে ছুটতে আবার সৌরজগৎ পেরিয়ে যায়। কিন্তু এ ধারণা ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানীরা এখন নিঃসংশয় যে, ধূমকেতু মাত্রই সৌরজগতের স্থায়ী অধিবাসী, তারা কেউ বহির্বিশ্ব থেকে সৌরজগতে আগন্তুক নয়। কিন্তু ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে তারা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। প্রশ্ন উঠেছে কোনও বৃহৎ গ্রহের দেহ থেকে বিশেষত বৃহস্পতি ও শনির দেহ থেকে এরা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে কি? না কি সূর্যপৃষ্ঠের বিক্ষোভের সময় এরা বিচ্ছুরিত হয়? না কি অন্য কোন নক্ষত্রের সূর্যসন্নিধানে আসার ফলে তাদের বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ থেকে এদের উৎপত্তি?

ধূমকেতুর দেহ-গঠন তিনটি আঙ্গিকে ভাগ করা যায়। প্রথমত এর মুণ্ড বা অষ্টি, দ্বিতীয় এর বহিরাবরণ, তৃতীয় এর পুচ্ছ।

মুণ্ডটি একটি মাত্র পিণ্ড নয়। অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে বিশ পঁচিশ গজ ব্যাসবিশিষ্ট সর্ববিধ আকারের শিলাখণ্ড লক্ষ লক্ষটি একত্র জড়ো হয়ে ধূমকেতুর অষ্টি বা মুণ্ড সৃষ্ট। কাজেই এ মুণ্ডটির সঙ্গে পৃথিবীর কোথাও সংঘর্ষ হলে অবশ্যই কিছু ধ্বংসের চিহ্ন থেকে যাবে। হিসেব অনুযায়ী হ্যালির ধূমকেতুর মুণ্ডের ভর তিন কোটি টন অনুমিত হয়েছে—অন্যান্যদের মুণ্ডের ভর অবশ্য অনেক কম হতে পারে, আবার বেশীও হতে পারে।

মুণ্ডটিকে ঘিরে আছে অত্যন্ত হাল্‌কা নীহারের আবরণ। এই নীহারের গঠন-উপাদান জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস। আবরণটির জন্যেই ধূমকেতুকে নক্ষত্র বা গ্রহাণু থেকে পৃথক করে চেনা যায়। আবরণের গভীরতা সকলের সমান নয়, সাধারণত এদের গড়-আয়তন বৃহস্পতি গ্রহের সমান। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর দেখা পাওয়া গিয়েছিল তার আবরণের ব্যাস দশ লক্ষ মাইলেরও বেশী ছিল, তবে এটা সাধারণের বড় বেশী ব্যতিক্রম।

ধূমকেতুর পুচ্ছের উৎপত্তি হয় সূর্যের কাছে এলে। ধূমকেতু সূর্যসান্নিধ্যে যত এগিয়ে আসে পুচ্ছও তত দীর্ঘ হয়ে পড়ে, আবার যখন দূরে চলে যেতে থাকে পুচ্ছও তত ক্ষুদ্রাকার হতে হতে অবশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সকল ধূমকেতুরই যে পুচ্ছ গজায় তা নয়, আবার কোন কোন ধূমকেতুর দুই বা ততোধিক পুচ্ছও সৃষ্ট হয়। মুণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাসমূহ ও গ্যাস সূর্যরশ্মির চাপে ধূমকেতুর গাত্র থেকে পুচ্ছরূপে বহির্গত হয় (প্লেট-ট)। কণার উপর থেকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে আসে বলে পুচ্ছকে এত উজ্জ্বল দেখায়। তাছাড়া পৃথিবীতে দৃষ্ট আলেয়ার অনুরূপ নৈসর্গিক ক্রিয়াও পুচ্ছকে উজ্জ্বল করে ফেলতে পারে। ধূমকেতুর পুচ্ছ অনেক সময় বহু লক্ষ মাইল দীর্ঘ হয়ে থাকে। হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছ এক সময়ে প্রায় দুই কোটি মাইল দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল—সেই অবস্থায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে পৃথিবী তার কক্ষ ভ্রমণকালে ঐ পুচ্ছকে ভেদ করে চলে যায়, কিন্তু তাতে ভূপৃষ্ঠে বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নি। বস্তুত ধূমকেতুর গাত্রে ও পুচ্ছে পদার্থ এত বিরল যে, কয়েক লক্ষ মাইল দীর্ঘ একটি পুচ্ছের ভর হয়তো মাত্র কয়েক শত গ্রাম। একখানা মেঘ সূর্যকেও আড়াল করে রাখতে পারে কিন্তু ধূমকেতুর গাত্র বা পুচ্ছের ভিতর দিয়ে অনায়াসে নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হয়

এবং নক্ষত্রের দীপ্তি কিছুমাত্র ম্লান হয় না। ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্বদাই সূর্যের বিপরীত দিকে প্রলম্বিত থাকে (প্লেট-ঠ) গ্রহাণুপুঞ্জের কোন কোনটা হয়তো এককালে ধূমকেতু ছিল। সূর্যসন্নিধানে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে ধূমকেতুর মুণ্ড থেকে সূক্ষ্ম কণাসমূহ সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেলে তার আর পুচ্ছ উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং তাকে আর ধূমকেতু বলেও চেনা যায় না এবং তার পরিচয় হয় গ্রহাণু।

সৌরজগতের অধিবাসী হয়েও সৌরজগতের সাধারণ নিয়ম-কানুন ধূমকেতুরা মেনে চলে না, যেন কতকটা উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। কোন কোন ধূমকেতুর কক্ষ সমতল ক্রান্তিবৃত্ত-সমতলের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নয়, কারও বা ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের সমকোণে, অন্যদের এই দুই প্রান্তীয় সীমার অন্তর্বর্তী স্থানে। এদের কক্ষপথ অত্যন্ত বেশী উপবৃত্তাকার, কোনটা ছোট, কোনটা অতিশয় দীর্ঘ। এর ফলে কোন ধূমকেতু হয়তো বা অল্প কয়েক বছরেই সূর্য প্রদক্ষিণ শেষ করে, আবার অন্য কারও একবার সূর্য প্রদক্ষিণ শেষ করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যায়। এই দুই কাল-প্রান্তের মধ্যে আছে অন্য সকলের প্রদক্ষিণ সময়। গ্রহগণ যে অভিমুখে সূর্য প্রদক্ষিণ করে অনেক ধূমকেতু সেই দিকেই সূর্যের চার দিকে পথ পরিক্রমা করে, আবার অনেক ধূমকেতু তার বিপরীত অভিমুখে সূর্য প্রদক্ষিণ করে।

অস্ট্রেলিয়াবাসী ব্যায়েলা (Biella) কর্তৃক আবিষ্কৃত বলে একটি ধূমকেতুর নাম ব্যায়েলার ধূমকেতু। এর সূর্য প্রদক্ষিণকাল ৬⅔ বছর। পূর্ণাবয়বে তাকে আকাশে দেখা যায় ১৮৩২ ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। পুনরায় ১৮৪৫ সনে সে যখন সূর্য-সকাশে এল তখন তার আর পুচ্ছ নেই, আকৃতি মোচার মতো হয়ে গেছে। তখনই এটি ভেঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর পর ১৮৫২ সনে একটি মাত্র খণ্ড ফিরে এল, অপর খণ্ডটি তখন অনেক দূরে। ১৮৫৮ সনে কোনটিকেই আর দেখা গেল না। ১৮৬৬ সনেও দেখা গেল না। ১৮৭২ সনে ২৭শে নভেম্বর তারিখে তার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে পৃথিবীর দেখা হয়ে গেল উল্কারূপে। সেই থেকে প্রতি বছর ঐ তারিখে উল্কারূপে আমরা তার দেখা পাই।

নয়নাভিরাম হ্যালির ধূমকেতু মানুষের সামনে এসেছিল ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। কিঞ্চিদধিক ৭৫ বছরে ধূমকেতুটি সূর্য প্রদক্ষিণ করে। আবার এর দেখা পাওয়া যাবে ১৯৮৫-'৮৬ সনে। গ্রহগণ যে অভিমুখে চলে হ্যালির ধূমকেতুর

গতি তার উল্টা দিকে। কক্ষপথে এখন তার অবস্থিতি সূর্য থেকে অনেকটা দূরে তাই গতিও কিছুটা মন্থর। সূর্যের যত কাছে আসবে গতিও তত দ্রুত হবে। আর কুড়ি বছরও বাকী নেই যখন দেখা যাবে প্রকাণ্ড একটা পুচ্ছ নিয়ে হ্যালির ধূমকেতু প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসে সূর্যকে চক্কর দিয়ে আবার ব্যাকুল বেগে প্রস্থান কালে পুচ্ছটিকেও গুটিয়ে নিচ্ছে।

হ্যালির ন্যায় উজ্জ্বল ধূমকেতু খুবই বিরল। দূরবীনে দেখা যায় আকাশে অনুজ্জ্বল ধূমকেতুর অভাব নেই। তাদেরই মধ্যে কোন কোনটা উজ্জ্বল হয়ে খালি চোখের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। ১৯৪৩ সনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের কাছে হুইপল ধূমকেতুটিকে (Comet Whipple) খালি চোখে দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৬ সনের নভেম্বর মাসে দূরবীনের দৃষ্টিতে আরেণ্ড-রোলাণ্ড (Arend Roland) নামক ধূমকেতুটিকে আকাশে দেখা যায়—১৯৫৭ সনের এপ্রিলে এটি এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে, খালি চোখেও দেখতে পাওয়া যেত।

উল্কা

রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায় হঠাৎ একটা নক্ষত্র যেন ছুটে চলে গেল। পৃথিবীর যে কোনও স্থান থেকেই মানুষ তার আকাশে এ দৃশ্য দেখতে পায়। একে আমরা বলি নক্ষত্র-পতন বা নক্ষত্র-খসা। শুধু রাত্রে নয় দিনের বেলায়ও নক্ষত্র-পতন ঘটছে—যদিও দিনের আলোয় তা অদৃশ্য। দিবাভাগের নক্ষত্র-পতন রেডারের গোচরে আসে। বস্তুত এরা নক্ষত্র নয়—এদের নাম উল্কা।

মহাশূন্যে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থান ধূলিকণায় ভর্তি। সৌরজগতেও শূন্য বলতে যা বুঝায় সে স্থান ধূলিকণায় ভর্তি। নগণ্য আয়তনের জন্যে এ-সব ধূলিকণা খালি চোখে তো দেখা যায়ই না, শক্তিশালী দূরবীনেও এদের বেশীর ভাগ অগোচর। সৌরজগতের ধূলিকণাগুলি যেখান সেখান থেকে আপন আপন কক্ষে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তারপর যে সব ধূমকেতু নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের ধ্বংসাবশেষ সৌরজগতেই আছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ধূমকেতুর বস্তুকণাসমূহ তাদের পূর্বেকার কক্ষপথে থেকেই সূর্যপ্রদক্ষিণ করছে। সৌর-জগতের গ্রহাণুপুঞ্জে আছে হাজার হাজার গ্রহকণা ও রাশি রাশি ধূলিকণা। এরাও প্রত্যেকে আপন আপন কক্ষে সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমা করছে। এত সব আবর্জনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে নিজের কক্ষপথে চলতে হয়। এদের

মধ্যে অনেক বস্তুই পৃথিবীর অভিকর্ষীয় শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ভূকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠের ৭০ মাইল উপরে থাকতেই সেই সব বস্তুকণা বায়ুর ঘর্ষণে জ্বলতে আরম্ভ করে এবং ভূপৃষ্ঠের ৪০ মাইল ঊর্ধ্বে পৌছাতে পৌছাতেই তারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত বড় কণা হয়তো ভূপৃষ্ঠের আরও একটু কাছে আসতে পারে। এর চেয়ে বৃহত্তর বস্তুপিণ্ড জ্বলতে জ্বলতে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে, কোন কোনটা সম্ভবপর ক্ষেত্রে মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। এগুলি আয়তনে সাধারণত একটা ডিমের মতো, কিংবা তার চেয়ে একটু ছোট বা বড়। মানুষ সন্ধান পেলে এদের সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে তাদের যাদুঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। কদাচিৎ হলেও এদের চেয়ে বৃহত্তর বস্তুপিণ্ড কখনও কখনও জ্বলন্ত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে এবং তথায় নানা ধ্বংসের চিহ্ন রেখে দেয়। হাজার পাঁচেক বছর পূর্বে আমেরিকার আরিজোনায় ২০।২৫ গজ ব্যাসের ও প্রায় দুই লক্ষ টন ওজনের একটা পিণ্ড এসে পড়েছিল। তার ফলে সেখানে যে খাদ সৃষ্ট হয় তার মুখের ব্যাস প্রায় ৪২০০ ফুট ও গভীরতা ৫৭০ ফুট। এই পিণ্ড থেকে উৎক্ষিপ্ত লৌহখণ্ডসকল ছয় মাইল দূরেও আহৃত হয়েছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন জনবিরল মধ্য-সাইবেরিয়ার বন-ভূমিতে এমনই একটা প্রকাণ্ড পিণ্ড এসে পড়েছিল। তার ফলে তিন চার হাজার বর্গমাইল স্থান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শতাধিক মাইল দূর থেকে দিনের বেলাতেও মানুষ এটিকে জ্বলন্ত গোলার ন্যায় পড়তে দেখেছিল, ৫০ মাইল দূরের লোক এর তাপ অনুভব করেছিল। কিন্তু পিণ্ডটি পড়তে পড়তে বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছিল কিংবা একটি মাত্র না হয়ে বহু সংখ্যক পিণ্ড একত্র সমষ্টিবদ্ধ হয়ে এসেছিল, কারণ পতন-স্থানে অনেকগুলি খাদের সৃষ্টি হয় এবং তন্মধ্যে বৃহত্তমটির মুখের ব্যাস মাত্র ১৫০ ফুট। আলোকচিত্রে চাঁদ ও মঙ্গলের যে খাদের ছবি দেখা যায় সেগুলি নিঃসন্দেহে এই জাতীয় বিপর্যয়ের ফল।

আবহমণ্ডলের বাইরে থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান ঐ সকল পদার্থকেই উল্কা বলে। বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে যেগুলি পুড়ে যায় তাদের আমরা উল্কা বলি, ইংরাজীতে বলে মেটিওর (Meteor) বা ছুটন্ত তারা (Shooting star)। ছোট বা বড় যে পিণ্ডগুলি জ্বলতে জ্বলতে এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ে তাদেরও আমরা উল্কাই বলি, ইংরেজীতে বলে মেটিওরাইট (Meteorite)। গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে কক্ষচ্যুত করে যেসব গ্রহকণাকে পৃথিবী স্বদেহে আকর্ষণ করে আনে তারাই মেটিওরাইট।

প্রতি বছরেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ তারিখে উল্কাপাতের পরিমাণ বাড়ে। তারিখগুলি ইং ১২।১৩।১৪ই জুলাই এবং ইং ১৪।১৫।১৬ই নভেম্বর। এই সব তারিখে বোধ হয় পৃথিবী কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত ধূমকেতুর কক্ষে আবর্জনা রাশির মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। বর্ষে বর্ষে ২৭শে নভেম্বর (১৩ই অগ্রহায়ণ) তারিখে পৃথিবী ব্যায়েলার ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করে, সেজন্যে এই তারিখেও পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অজস্র উল্কপাত হয় (চিত্র-২৩)।
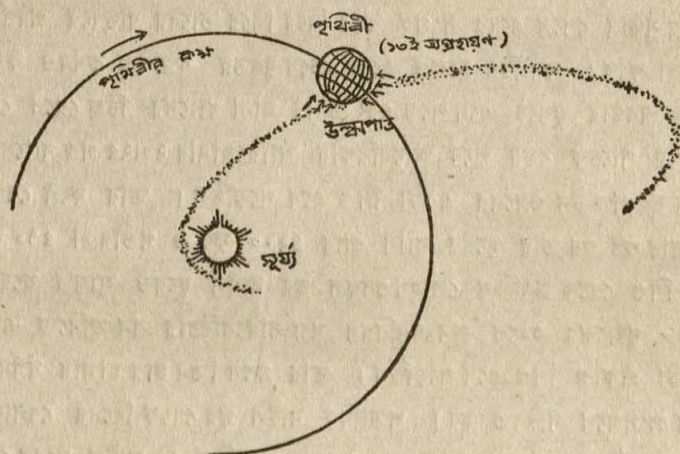
চিত্র-২৩—২৭শে নভেম্বরের উল্কাপাত

এক এক সময়ে এত অধিক উল্কা পড়ে যে, মনে হয় আকাশ থেকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষাধারার ন্যায় পৃথিবীর দিকে ঝরে পড়ছে। এরই নাম উল্কা-বর্ষণ (Meteor shower)। উক্ত উল্কাবর্ষণগুলি ছাড়া প্রতি বছর আর যে সব তারিখে যে সব নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে দৃষ্টি রাখলে পৃথিবীর আকাশে উল্কাবর্ষণ দেখা যেতে পারে তার তালিকা—

৩রা জানুয়ারী —বুটস নক্ষত্রের দিকে শেষ রাত্রে
৪-১৬ আগষ্ট —পারসিউস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে
১৫-২৫ অক্টোবর—কালপুরুষের অভিমুখে
১২-১৩ ডিসেম্বর—মিথুন রাশির দিকে

সপ্তম অধ্যায়

রাশিচক্র

একটি গৃহের চারি দেয়ালে চারিখানি চিত্র টাঙ্গানো রয়েছে—পূর্ব দেয়ালে বুদ্ধদেবের চিত্র; উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে যথাক্রমে কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিবেকানন্দ ও তাজমহলের। গৃহের মধ্যভাগে টেবিলের উপর একটি প্রদীপ জ্বলে, তার সম্মুখে বসে একটি বালক রাত্রিকালে পড়াশুনা করে। বালকটি টেবিলের সম্মুখে তার ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করে বসে। যেদিন সে টেবিলের পশ্চিমদিকে বসে পূর্বমুখী হয়ে সেদিন সে দেখে দীপটি জ্বলছে বুদ্ধদেবের ছবির সম্মুখে। এইরূপ, দক্ষিণ দেয়ালে বসলে উত্তর দেয়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবির সামনে এবং টেবিলের পূর্ব ও উত্তর দিকে বসলে বিবেকানন্দ ও তাজমহলের সম্মুখে দীপটিকে দেখতে পায়। চিত্রগুলি স্থান পরিবর্তন করে না, প্রদীপও স্থির থাকে, স্থান পরিবর্তন করে শুধু বালকটি—যে জন্যে দীপকে বিভিন্ন চিত্রের সম্মুখে দেখতে পায়।

এখন মনে করা যাক, দেয়ালের চিত্রগুলি আকাশের নক্ষত্র, সম্মুখস্থ দীপটি সূর্য ও বালকটি পৃথিবী। চিত্রগুলির ন্যায় নক্ষত্ররাজি আকাশে স্থির থাকে। প্রদীপের ন্যায় সূর্যও স্থির, পৃথিবী শুধু স্থান পরিবর্তন করে, সূর্যের চতুষ্পার্শে ঘুরতে থাকে।

দিবাভাগে যদি নক্ষত্র দেখা যেত, তাহলে পৃথিবী থেকে আমরা দেখতাম সূর্য দিনের পর দিন স্থিরনক্ষত্রগুলির উপর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছে। সূর্য ঠিক একস্থানেই রয়েছে—বর্ষকাল ধরে পৃথিবী তার কক্ষের উপর যত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যায়, আমরাও সূর্যকে নক্ষত্রদের উপর দিয়ে তত পূর্বাভিমুখে যেতে দেখি। এমনি করে পৃথিবী যখন বৎসরান্তে সূর্যকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করলো, আমরা দেখলাম কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের উপর দিয়ে সূর্য আকাশে পৃথিবীর চারিদিকে একটি বৃত্তপথে ঘুরে এল।

নূতন করে আমাদের বর্ষচক্র আরম্ভ হয়। গত বছর ১লা বৈশাখ সূর্য যে নক্ষত্র থেকে যাত্রা স্থরু করেছিল, এ বছরের ১লা বৈশাখও ঠিক সেই নক্ষত্রের নিকট থেকেই তার যাত্রা স্থরু হলো। যে সকল নক্ষত্রের উপর দিয়ে

গত বছর সূর্য ভ্রমণ করেছিল, এবারেও ঠিক সেই সব নক্ষত্রের উপর দিয়েই তার গতিপথ। এই প্রতীয়মান রবিপথটির নাম ক্রান্তিবৃত্ত।

ক্রান্তিবৃত্ত ও রাশিচক্র অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু, এরা এক নয়। ক্রান্তিবৃত্তটি আকাশের বেষ্টনী রেখা। রাশিচক্র বেষ্টনী রেখামাত্র নয়, পাশের দিকেও এর একটি বিস্তৃতি আছে। রাশিচক্র যেন গগনমণ্ডলের নক্ষত্রখচিত কটিবন্ধ; আকাশে ক্রান্তিবৃত্তের ৯° ডিগ্রী উত্তর থেকে ৯° ডিগ্রী দক্ষিণ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। ক্রান্তিবৃত্তকে মধ্যস্থলে রেখে ১৮° ডিগ্রীর যে প্রশস্ত পথ আকাশকে বেষ্টন করে আছে তাই রাশিচক্র।

পূর্বেই বলেছি, বুধ শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ তাদের উপগ্রহদের নিয়ে পৃথিবীর ন্যায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে যেমন আমরা ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণ করতে দেখি, পৃথিবী থেকে গ্রহ-উপগ্রহগণকেও তেমনি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। পৃথিবী থেকে এদের সবার দূরত্ব সমান নয়, প্রত্যেকরই পৃথক পৃথক গতিপথ; তথাপি এরা আমাদের এতদূরে যে, এদের দূরত্বের কোন তারতম্য আমরা বুঝতে পারি না। আমরা দেখি, গ্রহ-উপগ্রহগুলি সকলেই সূর্যের মতো রাশিচক্রের নক্ষত্রসমূহের উপর দিয়ে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং এমনি করে তাদের প্রত্যেকেই কেউ বা অল্প কিছুদিনে, কেউ বা সুদীর্ঘকালে এক-একটি বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আসে। এদের কারো ভ্রমণকক্ষ ক্রান্তিবৃত্তের সামান্য উত্তরে, কারো বা সামান্য দক্ষিণে। কিন্তু, সকলের পথই রাশিচক্রের অন্তর্গত। পাশের দিকে রাশিচক্রের যে বিস্তৃতি, সেই ১৮° ডিগ্রীর সীমা ছাড়িয়ে উত্তরে বা দক্ষিণে, গ্রহ-উপগ্রহগুলি কোন সময়েই যায় না।

রাশিচক্রকে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে—এক এক অংশ এক এক রাশি। প্রতি রাশিতে সূর্য একমাস করে থাকে। দ্বাদশ মাসে সূর্যের রাশিচক্রে পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়। এই বিভাগ বহু প্রাচীনকালের। খুব সম্ভব কোন চীনদেশবাসী সর্বপ্রথম রাশিচক্রকে ভাগ করেন, যদিও তিনি একে ২৮ ভাগে ভাগ করেছিলেন। দ্বাদশ ভাগে ভাগ করা হয় সূর্যের অবস্থিতি অনুসারে,—চীনে ২৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি অনুসারে।

প্রতি রাশির উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি নিয়ে প্রাচীন জ্যোতিষী এক একটি আকৃতি কল্পনা করে সেই আকৃতির নামে প্রতি রাশির নামকরণ করেছেন

(চিত্র-২৪)। যেমন, মেষরাশির নক্ষত্রগুলিকে রেখাযুক্ত করলে কতকটা মেষের আকৃতি পাওয়া যায়। দ্বাদশ রাশির নাম এদেশে কারো অজানা নয়—তাদের নাম ক্রমান্বয়ে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু,
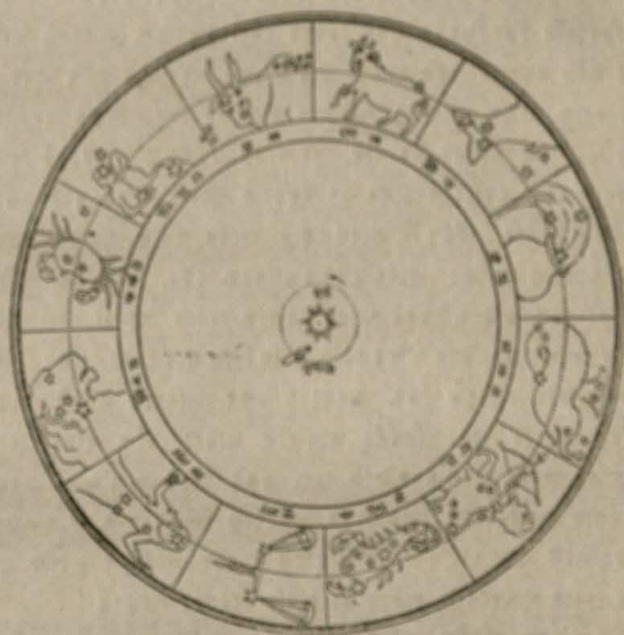
চিত্র-২৪—রাশিচক্র

মকর, কুম্ভ ও মীন। বৈশাখ মাসে সূর্য মেষরাশিতে থাকে, জ্যৈষ্ঠ মাসে থাকে বৃষতে, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে মিথুন ও কর্কটে, কার্তিক মাসে তুলা রাশিতে, মাঘ মাসে মকরে ও চৈত্রে মীন রাশিতে। একটি বৃত্তকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগকে এক এক ডিগ্রী বা অংশ বলা হয়। রাশিচক্রকেও ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়েছে। এক এক রাশিতে ৩০ ডিগ্রী করে আছে। প্রতি মাসেও সাধারণতঃ ৩০ দিন আছে। সূর্য দিনে এক ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে। ১লা বৈশাখ সূর্য মেষরাশির ১ ডিগ্রীতে থাকে, ২রা ২ ডিগ্রীতে, ৩০ তারিখে সূর্য বৃষরাশিতে প্রবেশ বা সংক্রমণ করে, তাই ঐ দিনকে বৃষসংক্রান্তি

বলে। পরদিন ১লা জ্যৈষ্ঠ সূর্য বৃষরাশির ১ ডিগ্রীতে থাকে। প্রতি মাসেরই শেষদিনটিকে সংক্রান্তি বলে, কারণ ঐ দিনে সূর্যকে একটি নূতন রাশিতে সংক্রমণ করতে দেখা যায়।

গ্রহ-উপগ্রহগুলিও বিভিন্ন গতিতে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে বলে তাদের ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের নিকটে দেখা যায় এবং তাদেরও আপন আপন গতি অনুসারে রাশি সংক্রমণ হয়ে থাকে। এক এক রাশি ভ্রমণ বা ভোগ করতে চন্দ্রের লাগে ২¼ দিন, বুধের লাগে ১৮ দিন, শুক্রের ২৮ দিন, সূর্যের ৩০ দিন, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বৃহস্পতির ১ বছর, শনির ২½ বছর, ইউরেনাস-এর ৭ বছর, নেপচুনের ১৪ বছর ও প্লুটোর লাগে ২২½ বছর। রাশিচক্র-পরিভ্রমণে এইরূপ গতিবেগ ছাড়া সূর্যের সহিত গ্রহদের অন্যরূপ একটি পার্থক্যও আছে। সূর্যের বেলায় রাশিচক্র স্থির, সূর্যও স্থির, পৃথিবী শুধু স্বীয় কক্ষে স্থান পরিবর্তন করে। এজন্যে সূর্যকে আমরা সর্বদা একই গতিতে রাশিচক্রের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে সরে যেতে দেখি। কিন্তু গ্রহদের বেলায় রাশিচক্র স্থির, গ্রহগণ গতিশীল, পৃথিবীও গতিশীল। গ্রহ ও পৃথিবী উভয়েই স্থান পরিবর্তন করে বলে পৃথিবী থেকে আমরা দেখি, রাশিচক্রের গ্রহগণ সর্বদা সমগতিতে এবং একই দিকে চলে না। কখনও দেখি কোন গ্রহ বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভ্রমণ করে—তখন বলা হয় গ্রহটি বক্রী হয়েছে। কোন গ্রহকে সাধারণ গতিবেগ অপেক্ষা দ্রুত চলতে দেখলে আমরা বলি তার অতিচার-গতি হয়েছে; এইরূপ।

এ তো গেল পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্যে রাশিচক্রে সূর্য ও গ্রহাদির আপেক্ষিক গতিবিধি। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের জন্যে ভূপৃষ্ঠের প্রতিবিন্দু প্রত্যহ একবার চতুর্দিকের সকল নক্ষত্রের সম্মুখীন হয় বলেও আবার আমাদের আকাশের দৃশ্যপট প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে। দৃশ্যত, সূর্য যেমন এক দিবারাত্রিতে পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসে, তেমনি যে নক্ষত্র সন্ধ্যায় পূর্বাকাশে থাকে, নিশাশেষে তাকে দেখা যায় পশ্চিম অস্তাচলে, পরদিন সেই নক্ষত্র পুনরায় পূর্বদিগন্তে উদিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে আমরা দেখি, প্রতি জ্যোতিষ্ককে নিয়ে সমস্ত আকাশ যেন একটি মেরু অবলম্বনে ২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তন করে। আকাশের এই মেরুরেখা তার উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দুর ভিতর দিয়ে, তাই কেবল তাদেরই কোন স্থান-পরিবর্তন হয় না; তাছাড়া, আকাশের

প্রতি বিন্দুই এক দিবারাত্রিতে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে। সেই সঙ্গে রাশিচক্রও ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণ আপন আপন ভ্রমণবেগ অনুসারে রাশিচক্রের উপর ক্রমশঃ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে সরে যেতে থাকে এবং আহ্নিক গতির জন্যে রাশিচক্র নিজেই তাদের সবাইকে নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রত্যহ একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আসে।

চব্বিশ ঘণ্টায় রাশিচক্র পৃথিবীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে। এজন্যে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিই একে একে সূর্যের মতো প্রত্যহ একবার উদিত হয়, অস্তও যায়। পূর্ব দিগন্তে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এক একটি নূতন রাশির আবির্ভাব দেখা যায়। সকাল ছয়টায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে যদি মেষরাশির উদয় হয়, তার দুই ঘণ্টা পরে বৃষরাশির উদয় হবে, বেলা ১২টায় হবে কর্কটরাশির। তেমনি সন্ধ্যা ছয়টায় মেষরাশি পশ্চিমে অস্ত যাবে; রাত্রি ৮টা ও ১০টায় বৃষ এবং মিথুন রাশিরও অস্ত।

বছরে বিভিন্ন দিনে আমাদের আকাশপট নানাভাবেই পরিবর্তিত হতে থাকে। বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় আকাশে যে সকল নক্ষত্রকে যে স্থানে দেখি, শ্রাবণ মাসে তাদের সে স্থানে দেখি না—এদিকে কতকগুলি নূতন নক্ষত্রও দেখতে পাই। কার্তিক মাসের আকাশের দৃশ্য তো বৈশাখ মাস থেকে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। বৈশাখ মাসে সূর্য থাকে মেষরাশিতে, সুতরাং মেষরাশির নক্ষত্রসমূহ তখন দিবাভাগেই আকাশে উদিত থাকে। সূর্যালোকে সেগুলি আমরা তখন একেবারেই দেখতে পাই না। কার্তিক মাসে সূর্য থাকে তুলা-রাশিতে। রাত্রিকালে সূর্যের বিপরীত দিকে যখন আমরা থাকি, তুলারাশির বিপরীত দিকে অবস্থিত মেষরাশির নক্ষত্রপুঞ্জ তখন আমরা আকাশে দেখি। এইরূপে রাশিচক্রে সূর্যের ভ্রমণের জন্যে আকাশপটের দৃশ্য-পরিবর্তন হয়। আবার রাশিচক্রে গ্রহ-উপগ্রহের ভ্রমণের জন্যে এবং রাশিচক্রের নিজেরও আহ্নিক ভ্রমণের জন্যে আকাশপট অবিরাম আমাদের সম্মুখে নূতন নূতন রূপসজ্জা গ্রহণ করতে থাকে।

রাশিচক্রের নক্ষত্ররাজিকে পশ্চাৎপটে রেখে তাদের সামনে দিয়ে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহরা যেভাবে আকাশে পরিভ্রমণ করে পৃথিবীবাসী মানুষ খালিচোখে বা বাইনোকিউলারের সাহায্যে তা স্পষ্টই দেখতে পায়। কোনদিন যদি মেষরাশিস্থ অশ্বিনী নক্ষত্রের সামনে চন্দ্রকে দেখা যায় তাহলে সেদিন

সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তর দিকে ধ্রুবতারা অভিমুখে কিংবা তার সন্নিকটে লক্ষ্য রেখে পথ চলছে, কিন্তু কালক্রমে পৃথিবীর লক্ষ্য আর ধ্রুবনক্ষত্রে থাকবে না, অন্যত্র সরে যাবে (চিত্র-২৭)। শিবি
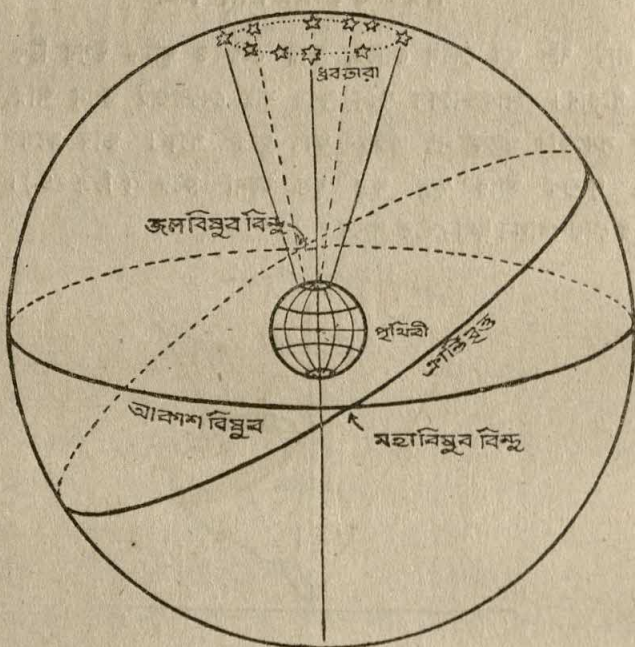
চিত্র-২৭—পৃথিবীর অয়নগতি

(Cepheus), আল্‌ফা ছায়াগ্নি (A Cygni), অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি একে একে পৃথিবীর উত্তর দিকে থাকবে। ২৫।২৬ হাজার বছর পরে ধ্রুবনক্ষত্রকে আবার এখনকার মতো আমাদের উত্তরে দেখা যাবে।

পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল যে বেষ্টনীরেখা আকাশে কল্পিত হয়, তার নাম আকাশ-বিষুব। পৃথিবীর মেরু উক্তপ্রকারে একটি বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে, তাই এর নিরক্ষবৃত্ত সর্ব্বদা একই সমতলে নিবদ্ধ থাকতে পারে না। সুতরাং আকাশ-বিষুবেরও স্থান পরিবর্তন ঘটে।

ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গের সহিত আকাশ-বিষুবের দুই বিন্দুতে ছেদ হয়। এই ছেদবিন্দুদ্বয়ের নাম মহাবিষুব ও জলবিষুব (চিত্র-২৭)। ভ্রমণকালে সূর্য

যেদিন মহাবিষুব কিংবা জলবিষুব বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয়, সেদিন ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র দিবাভাগ ও রাত্রিমান সমান।

ক্রান্তিবৃত্ত ও আকাশ-বিষুব উভয়ে স্থির থাকলে তাদের ছেদবিন্দুরও স্থান পরিবর্তন হতো না। কিন্তু পৃথিবীর মেরুদোলন হেতু আকাশ-বিষুব সামান্য সঞ্চরণশীল। এ কারণে উভয়ের ছেদবিন্দুদ্বয়ও ক্রান্তিবৃত্তের উপর একটু একটু করে সরে যায়। মহাবিষুব বিন্দু যে সময়ে এবং যে দিকে যতটুকু যায়, তদ্বিপরীতস্থ জলবিষুব বিন্দুও সেইদিকে ততটুকু সরে আসে। ক্রান্তিবৃত্তে এরা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে। এদের গতি বছরে মাত্র ৫০"·২৪ বিকলা বা সেকেণ্ড। অর্থাৎ এরা প্রায় ৭২ বৎসরে ক্রান্তিবৃত্তের এক ডিগ্রী পরিমিত স্থান পরিভ্রমণ করে। যেমন, যদি ১৮২১ শকাব্দে (১৮৯৯ খৃঃ) ৮ই চৈত্র ও ৮ই আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হয়ে থাকে, এখনও তেমনি চলছে; আবার ১৮৯২ শকাব্দ থেকে তার পরের ৭২ বৎসর পর্যন্ত ৭ই চৈত্র ও ৭ই আশ্বিন দিবারাত্র সমান হতে থাকবে। পৃথিবীর মেরু-দোলন হেতু ক্রান্তিবৃত্তে বিষুব-বিন্দুদ্বয় ঐরূপ ধীরে ধীরে ভ্রমণ করে। একে অয়ন-গতি বা অয়ন-চলন নাম দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দু-জ্যোতিষে অশ্বিনী নক্ষত্রের আদি বিন্দু থেকে রাশিচক্র গণনা করা হয়। আকাশের নক্ষত্রগণের পরস্পরের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। নক্ষত্রসান্নিধ্য থেকে গণনা করা হয় বলে হিন্দু-জ্যোতিষে রাশিচক্র স্থির—এর কখনও স্থান পরিবর্তন হয় না।
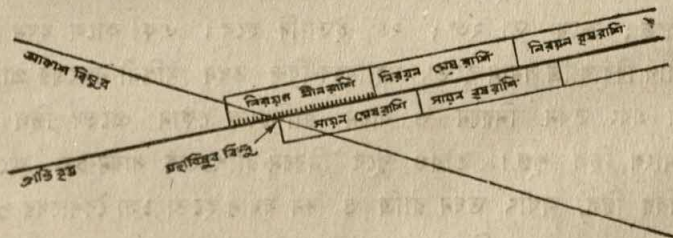
চিত্র-২৮—বর্তমান সায়ন ও নিরয়ন রাশি

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে রাশিচক্র গণিত হয় মহাবিষুব-বিন্দু থেকে। মহা-বিষুব-বিন্দু ৭২ বৎসর এক ডিগ্রী পশ্চিমে সরে যায়—এজন্যে পাশ্চাত্য

রাশিচক্রও প্রতি ৭২ বৎসর অন্তর এক এক ডিগ্রী পশ্চিমে অপসারিত হয়।

সম্প্রতি ৮।৯ চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি; অর্থাৎ আমাদের মীন রাশির অষ্টম ডিগ্রীতে যেদিন সূর্য অবস্থান করে সেদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে এখন ঐ মীনের অষ্টম ডিগ্রী থেকে রাশিচক্র গণনা আরম্ভ করা হয়েছে। সুতরাং হিন্দু রাশিচক্রের মীনের ৮° থেকে মেষের ৭° পর্যন্ত স্থান পাশ্চাত্য মতে মেষরাশি; তারপর ক্রমান্বয়ে বৃষ, মিথুন ইত্যাদি। এই হিসাবে পাশ্চাত্য রাশিচক্র ভারতীয় রাশিচক্র অপেক্ষা ২২° অগ্রসর রয়েছে (চিত্র-২৮)।

হিন্দু-জ্যোতিষে রাশিচক্রের সহিত পৃথিবীর অয়নগতি হিসাব করা হয় না বলে' এই নিরপেক্ষ গণনাকে নিরয়ন-রাশিচক্র বলে। অয়নগতিযুক্ত পাশ্চাত্য রাশিচক্রকে সায়ন-রাশিচক্র বলা হয়।

আমাদের পঞ্জিকায় নিরয়ন রাশিচক্র অনুসারে গ্রহাদির অবস্থিতি লিপিবদ্ধ থাকে। এদের স্থিতাংশে ২২° যোগ করলে সায়ন রাশিচক্রে তাদের স্থিতি অবগত হতে পারা যায়। যেমন বুধগ্রহ নিরয়ন-মেষের ১৬° ডিগ্রীতে থাকলে তাকে সায়ন-বৃষের ৮° ডিগ্রীও বলা যেতে পারে। এগুলি শুধু স্থিতিস্থানের নামের পার্থক্য, এতে সত্যিকারের স্থিতিস্থানের কোন প্রভেদ হয় না।

নিরয়ন-মেষের প্রথম বিন্দু থেকে মহাবিষুব-বিন্দু যত দূরে তার নাম অয়নাংশ; অর্থাৎ সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্রের পার্থক্য ঐ ২২° ডিগ্রীকে অয়নাংশ বলে। বিষুব-বিন্দুর পশ্চিম গতির নিমিত্ত অয়নাংশ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে; ক্রমে তা ২৩°; ২৪° ইত্যাদি হবে। এক কালে যখন ১লা বৈশাখ দিবারাত্রি সমান হতো, মহাবিষুব-বিন্দু তখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে ছিল এবং তখন নিরয়ন ও সায়ন রাশিচক্রে কোন প্রভেদ ছিল না, অয়নাংশ ছিল শূন্য। তারও পূর্বে নিরয়ন-রাশিচক্রই সায়ন-চক্র অপেক্ষা অগ্রসর ছিল, অর্থাৎ তখন রাত্রি ও দিন সমান হতো ১লা বৈশাখের পূর্বের তারিখে নয়, পরের তারিখসমূহে।

বৈদিক যুগের শেষাংশে মহাবিষুব-বিন্দু রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। রোহিণী নক্ষত্রের এলাকা নিরয়ন বৃষরাশির ১০° থেকে ২৩$\frac{১}{৩}$° ডিগ্রী পর্যন্ত। সেই যুগে এরই কোন একটা অংশে মহাবিষুব-বিন্দু ছিল। সেই অংশ

থেকে মহাবিষুব বর্তমানে মীনরাশির ৮° ডিগ্রীতে এসেছে। বৈদিক কাল থেকে এ পর্যন্ত মহাবিষুব-বিন্দু মাত্র কিঞ্চিদধিক ৬০° ডিগ্রী ভ্রমণ করতে পেরেছে।

রাশিচক্রে গ্রহগণ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়, বিষুববিন্দু ভ্রমণ করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। এজন্যে রাশিচক্রের উপর বিষুব-বিন্দুদ্বয়ের গতি সর্বদাই বক্রী।

নবম অধ্যায়

গ্রহের জন্মকথা

গ্রহ-জন্মের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রথমে স্যার জেমস জীন্‌সের মতবাদ জ্যোতির্বিদ-গণ সাদরে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে বিজ্ঞানের নিকষপাথরে টাইড্যাল থিওরীর (Tidal Theory) ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লো। কাজেই জীন্‌সের মতবাদ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

গ্রহ-জন্মের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আবার নতুন করে চিন্তাধারা আরম্ভ হলো। এবার আর চেম্বারলেন, মুল্টন এবং জীন্‌সের কল্পনানুযায়ী অন্য কোনও বিরাট নক্ষত্রের সূর্যের সন্নিধানে আগমন নয়। এবারকার চিন্তাধারা প্রবাহিত হলো ক্যান্ট, লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের অনুরূপ পথে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইৎসেকার (Carl von Weitzsacker) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি অবলম্বনে প্রচার করলেন—সূর্য-সৃষ্টির আদিম যুগে গ্যাস ও ধূলিকণা মিশ্রিত যে মেঘপুঞ্জ তার দেহলগ্ন হয়ে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই গ্যাস ও ধূলিকণা থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ মতবাদ নাকি রুশীয় বিজ্ঞানী অটো স্মিথও (Otto Schmidt) ঠিক ঐ সময়েই প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তখন মহাযুদ্ধের সময়ে সংবাদটি বিশ্বের দরবারে পৌছুতে পারে নি।

পার্থিব বস্তুর বিশ্লেষণে দেখা যায়—অক্সিজেন, সিলিকন, লৌহ ও অল্প পরিমাণ অন্যান্য ভারী মৌলিক পদার্থ এবং তাদের সংশ্লেষণে সৃষ্ট যৌগিক পদার্থ পৃথিবী-গঠনের প্রধান উপাদান। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি হাল্কা গ্যাস এখানে কমই আছে এবং নিয়ন, আর্গন প্রভৃতিও যৎসামান্য। পৃথিবী-গঠনের প্রধান উপাদানগুলিকে আমরা সংক্ষেপে পার্থিব কণা বা পার্থিব পদার্থ বলতে পারি।

যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে, সূর্য থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি, সেহেতু তাঁরা ভেবেছিলেন যে, সূর্যে এবং অন্যান্য নক্ষত্রেও ঐ সব উপকরণেরই প্রাচুর্য। কিন্তু পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঐ সকল পদার্থের পরিমাণ সূর্যদেহে মাত্র শতকরা একভাগ, অবশিষ্ট নিরানব্বই শতাংশ প্রায় সবই

হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। শুধু সূর্য নয়, অন্যান্য নক্ষত্রেও শতকরা নিরানব্বই ভাগ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম, বাকী একভাগ মাত্র ঐ সব পার্থিব পদার্থ। বর্তমানে জানা গেছে যে, সমগ্র নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যে বিরাট দূরত্বের ব্যবধান, সে স্থানও একেবারে শূন্য নয়—সেখানেও আছে সূক্ষ্ম ধূলিকণা মিশ্রিত গ্যাস অতি বিরলভাবে অবস্থিত—এত বিরল যে, দশ লক্ষ ঘনমাইলের বস্তুর ওজন গড়ে মাত্র এক মিলিগ্রাম। লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরস্থিত নক্ষত্রের বর্ণালী পরীক্ষার সময়ে তার রশ্মি এই সূক্ষ্ম ধূলিমিশ্রিত গ্যাস ভেদ করে আসে। তাতে দেখা যায়—এই ধূলিমিশ্রিত গ্যাসেও ঠিক নক্ষত্রের উপাদানের মতো শতকরা একভাগ পার্থিব পদার্থ এবং অবশিষ্ট সব হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।

মহাশূন্য সম্পর্কে উক্ত লব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইৎসেকার গ্রহগুলির জন্মবৃত্তান্ত অনুমান করেন। গ্যাস ও ধূলি মেঘপুঞ্জের মধ্যে সূর্য যখন প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঐ মেঘপুঞ্জের একটা বিরাট অংশ সূর্যের বহিরাবরণস্বরূপ তাকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। বর্তমানে সমুদয় গ্রহ-উপগ্রহে সর্বযোগে যে পরিমাণ বস্তু আছে, ঐ বহিরাবরণে হয়তো তার শত-গুণ বস্তু ছিল। ঐ ঘূর্ণ্যমান বহিরাবরণে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অন্যান্য গ্যাস যেমন ছিল, তেমনি সেই গ্যাস-সমুদ্রে মগ্ন পার্থিব পদার্থের সূক্ষ্মকণা অর্থাৎ লৌহভস্ম (**Iron Oxide**), লৌহ, সিলিকেট, জলীয় বাষ্প প্রভৃতিও ছিল। এই সকল পার্থিব কণাই ক্রমে ক্রমে একত্রিত হয়ে সৌরজগতের জ্যোতিষ্কসমূহের সৃষ্টি করেছে। গ্রহ-উপগ্রহগুলির গড়ে উঠতে হয়তো দশ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

অনুমানভিত্তিক হলেও এভাবে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মের সম্ভাব্যতা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ। গ্রহ-জন্মের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়, তাই বিজ্ঞানসম্মত অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যদি এই প্রণালীতে গ্রহাদির জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিটি নক্ষত্রেরই এইরূপ এক-একটি গ্রহ-জগৎ থাকা সম্ভব। সুতরাং আমাদের এই ছায়াপথ-দ্বীপজগতেই অন্ততঃ দশ হাজার কোটি গ্রহ-জগৎ বর্তমান। কিন্তু গ্রহ কখনই নক্ষত্রের মত বিরাট আকৃতির নয়, আর তারা নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত করতে পারে, নিজের কিন্তু নিষ্প্রভ। এই কারণে আজ পর্যন্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভাব্য ঐ বিপুল সংখ্যক গ্রহের একটিরও অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

অধুনা পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে, মহাশূন্যে গ্যাসের মেঘলোকে সঞ্চরমান ধূলিকণা থেকে গ্রহগুলির জন্ম হয়েছে। কিন্তু জন্মের প্রণালী সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। উইৎসেকার, হুইপ্‌ল্ (Whipple), কুইপার (Kuiper), ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গ্রহ-জন্মের প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যাখ্যাই অবশ্য বিজ্ঞানভিত্তিক, কিন্তু প্রতিটি খুঁটিনাটির সমাধান কোনও প্রণালীতেই নেই।

বর্তমানে দুটি মতবাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়; যথা—(১) উল্কা মতবাদ ও (২) বলয় মতবাদ।

(১) উল্কা মতবাদ (Meteorite Theory)

ধূলি-মিশ্রিত গ্যাস-সমুদ্রের মধ্যে সূর্য নিমগ্ন ছিল। তার বহির্ভাগে অবস্থিত গ্যাসরাশি সূর্যদেহ কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন আরম্ভ করলো। সূর্যের বহিরাবরণরূপী এই ঘূর্ণ্যমান গ্যাসলোকে ধূলিকণাগুলি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল এবং কোনটিই এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ ছিল না। মহাকর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এই জড় ধূলিকণাগুলি প্রত্যেকে আপন আপন বৃত্তাভাস পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছিল।

কিন্তু ধূলিকণাগুলি কি এবং কোথা থেকে এল ?

যাবতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুই ঐ গ্যাসলোকে গ্যাসীয় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। পদার্থের স্বভাবই এই যে, তারা অতিরিক্ত তাপমাত্রায় গ্যাসে পরিণত হয় এবং অত্যধিক শীতল হলে ক্রমে ক্রমে তরল ও কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু সকল পদার্থ একই তাপমাত্রায় গ্যাস হয় না বা একই তাপমাত্রায় তরল কিংবা কঠিনও হয় না। প্রত্যেকেরই এই প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্তির তাপমাত্রা বিভিন্ন। আবার যথাযোগ্য তাপমাত্রা ও উপযুক্ত পরিবেশে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরমাণু অন্য এক বা একাধিক পরমাণুর সঙ্গে মিলে যৌগিক পদার্থের অণু সৃষ্টি করে; যেমন—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে জল, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মিলে অ্যামোনিয়াম গ্যাস, কার্বন ও অক্সিজেন মিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলে মিথেন গ্যাস, লৌহ ও অক্সিজেন মিলে লৌহভস্ম, সোডিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেন মিশলে সোডিয়াম

সিলিকেট প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। গ্যাসপুঞ্জ যখন অত্যন্ত উত্তপ্ত তখন তথাকার সকল মৌলিক বা যৌগিক পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। বিকিরণের ফলে গ্যাসলোকে তাপ ক্রমে কমতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক যে, যেরূপ তাপমাত্রায় যে সকল গ্যাসীয় অনু কঠিন বা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে, তারা ঐ গ্যাসরাশির মধ্যেও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিলো। এরাই গ্যাস-সমুদ্রের জড় ধূলিকণা।

ধূলিকণার সংখ্যা অগণিত এবং তাদের সূর্য-পরিক্রমার পথও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের বৃত্তাভাস। কিন্তু এই সকল বৃত্তাভাস ভ্রমণকক্ষ এক সমতলে অবস্থিত নয় (চিত্র-২৯)। এর ফলে কক্ষগুলি বহু ক্ষেত্রেই একে অন্যকে ছেদ

চিত্র-২৯
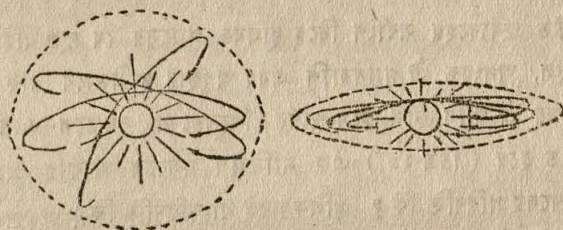
বামে—বিভিন্ন সমতলে ভ্রাম্যমান ধূলিকণা; ডানে—গ্যাস ও ধূলিকণা ধীরে ধীরে সূর্যের বিষুববৃত্তের সমতলে এসে উপস্থিত হলো

করতে বাধ্য। প্রচণ্ডবেগে ধাবমান বিপুল সংখ্যক পথচারীদের মধ্যে এই অবস্থায় মুহুর্মুহু সংঘর্ষ অনিবার্য। দুটি ক্ষুদ্র কণায় সংঘর্ষ ঘটলে তারা উভয়েই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যে তাপের সৃষ্টি হবে, তাতে হয়তো তারা গ্যাসে পরিণত হবে এবং পরে আবার যখন ঠাণ্ডা হবে, তখন এক বা একাধিক জড়কণায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। একটি বড় কণার সঙ্গে একটি ছোট কণার সংঘর্ষ ঘটলে তার ফল হবে অন্যরূপ। বড়টির সঙ্গে ছোটটি সংলগ্ন হয়ে থাকবে কিংবা বড়টির দেহাভ্যন্তরে ছোটটি প্রবেশ করে যাবে। তার ফলে বড়টির আয়তন আরও একটু বাড়বে। এইভাবে একটু একটু করে বড় হয়ে কাল-ক্রমে এমন একটা জড়পিণ্ড গড়ে উঠবে যে, সন্নিহিত অঞ্চলে স্বীয় মাধ্যাকর্ষণের

প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে। তখন নিকটস্থ সঞ্চরমান ক্ষুদ্র কণাগুলিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আপন কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকবে (চিত্র-৩০)।
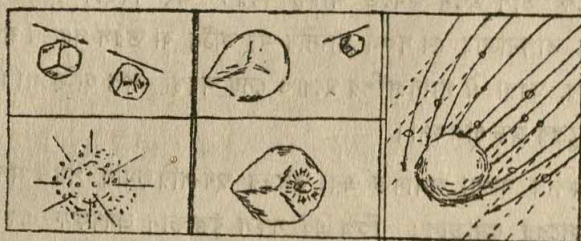
চিত্র-৩০
বামে—ছোট কণাগুলির সংঘর্ষ ; মধ্যে—বড় কণার সঙ্গে ছোট কণার সংঘর্ষ ;
ডানে—পিণ্ডদ্বারা আকৃষ্ট ছোট কণা

নবগঠিত সূর্যদেহের সর্বাংশ ঘিরে ধূলিময় গ্যাসের যে পুরু বহিরাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল, অসংবদ্ধ ঐ গ্যাসরাশি এমন অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। ধূলিময় ঐ গ্যাস ক্রমে ক্রমে সূর্যের বিষুববৃত্তের সমতলে এসে পাশের দিকে বিস্তৃত হয়ে (চিত্র-২৯) এক নাতিস্থূল বলয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে গ্যাসের পরিণতি কি ? ধূলিকণারই বা পরিণতি কি ?

চ্যাপ্টা বলয়টি আবর্তনশীল সূর্যের সঙ্গেই ঘূর্ণ্যমান। এই কারণে বলয়ের বহিঃপ্রান্তের গতিবেগ এত বেশী হয়ে দাঁড়ায় যে, তথাকার গ্যাসরাশি সূর্যের আকর্ষণ অতিক্রম করে শূন্যে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। অন্তঃপ্রান্তের গ্যাস ক্রমে ক্রমে সূর্যে বিলীন হয়। আবার যে সব স্থানে গ্যাসের তাপমাত্রা কমে যাচ্ছিলো, সে সকল জায়গায় নতুন নতুন জড়কণার আবির্ভাব সম্ভব হচ্ছিলো।

গ্যাসরাশিতে এসব পরিবর্তন ঘটলেও ধূলিকণার জীবনে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে নি। পূর্বে যেমন একটু একটু করে তাদের দেহবৃদ্ধি হচ্ছিলো অর্থাৎ ভর (Mass) বাড়ছিলো, সূর্যের বিষুববৃত্তের সমতলে এসেও অনুরূপভাবেই তাদের ভর বাড়ছিলো এবং নিকটে বা দূরে যে যেখানে ছিল, সেখান থেকেই বৃত্তাভাস পথে সূর্য-পরিক্রমা করছিলো। ভর যত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, পিণ্ডগুলির মহাকর্ষের ভূমিও তত প্রসারিত হচ্ছিলো এবং তার ফলে ক্রমান্বয়ে দূরস্থিত ক্ষুদ্রতর পিণ্ড ও জড়কণাগুলিকে স্বদেহে আকর্ষণ করে নিয়ে নিজেদের আয়তন বৃহত্তর করছিলো। এভাবে তাদের দেহের বেধ ক্রমে এক সেন্টিমিটার,

দুই সেন্টিমিটার, এক মিটার, এক কিলোমিটার, এক মাইল, দশ মাইল, শত মাইল এবং ধীরে ধীরে আরও বেশী হয়ে দাঁড়ালো। ধূলিকণা এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পিণ্ড প্রত্যেককেই গ্যাসরাশি ভেদ করে অর্থাৎ গ্যাসের বাধা অতিক্রম করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে হচ্ছিলো। এর ফলে তাদের বৃত্তাভাস কক্ষ ক্রমে বৃত্তাকার হয়ে উঠলো। বহু কণা একত্র সন্নিবিষ্ট হচ্ছিলো বলে ভ্রমণ-কক্ষের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে কমে এল। অবশেষে ঐ সব নাতিবৃহৎ পিণ্ড, যাদের ভ্রমণ-কক্ষ একে অন্যের সমীপবর্তী ছিল, তারা সকলে মহাকর্ষের দ্বারা একত্র সমষ্টিবদ্ধ হয়ে পৃথক পৃথক অঞ্চলে এক-একটা সুবৃহৎ পিণ্ডে পরিণত হলো। এরাই গ্রহ নামে অভিহিত হয়েছে।

এই গ্রহগুলি আবার একত্র সম্মিলিত একটিমাত্র অতিবৃহৎ জ্যোতিষ্কে পরিণত না হয়ে পৃথক পৃথক অস্তিত্বের অধিকারী হলো কেন—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। উইৎসেকার এরও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরে কুইপার, চন্দ্রশেখর, টের হার (Ter Herr) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলের উপর নির্ভর করে প্রমাণ করেছেন যে, এরূপ অবস্থায় ঐ প্রকার কতকগুলি পৃথক গ্রহের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁরা আরও বলেছেন—একটি গ্রহ থেকে সূর্য যতটা দূরে, পরবর্তী গ্রহের দূরত্ব সূর্য থেকে হবে তার দ্বিগুণ। বস্তুত দেখা যায়, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সূর্য থেকে গ্রহগুলির দূরত্ব মোটামুটি এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। দীর্ঘকাল পূর্বে গ্রহগুলির পারস্পরিক দূরত্ব সম্পর্কে বোড্‌স্ (Bodes) যে সংখ্যা-প্রণালী ধার্য করেছিলেন, বর্তমান উক্ত গাণিতিক নিয়মের সঙ্গে তার খুব বেশী গরমিল নেই।

সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলির প্রদক্ষিণ-পথ ছোট; সুতরাং তাদের স্বল্প পরিসর স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হয়েছিলো। স্বল্প পরিসরে পার্থিব কণা কম এবং গ্যাসও কম, তাই গ্রহগুলি ছোট। সূর্যের নিকটস্থ বলে এখানে ভারী কণারই বেশী প্রাচুর্য। এজন্যে তাদের সম্মিলিত ভরে সৃষ্ট এই গ্রহগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গুরুভার। সূর্যের প্রান্তের নিকটবর্তী বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ও গ্রহাণুপুঞ্জ—সকলেই আয়তনে ক্ষুদ্র। সৌরজগতের অপর প্রান্তে প্লুটো সুবৃহৎ পরিসরের মধ্যে গঠিত হলেও সেখানে পার্থিব কণা কম ও গ্যাসের পরিমাণ বেশী থাকায় গ্রহটি বৃহদায়তনের হতে পারে নি। অধিকাংশ গ্যাসই শূন্যে মিলিয়ে গেছে—ক্ষুদ্র প্লুটোর সামান্য মাধ্যাকর্ষণ তাদের বন্দী করে রাখতে পারে নি। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন সৌরজগতের মধ্যবর্তী

স্থানে অবস্থিত; সে জন্যে তারা আকারেও বৃহৎ। তাদের কেন্দ্রে আছে দৃঢ়বদ্ধ পার্থিব কণা, বহির্ভাগে হাজার হাজার মাইলব্যাপী তরল পদার্থ ও গ্যাসরাশির আবরণ।

গ্রহগুলির জন্মের পর তাদের চারদিকের আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হয় নি। ধূলিময় গ্যাস ও এতকাল ধরে যে সব ছোট-বড় জড়পিণ্ড সৌরসীমানার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, সূর্যের মহাকর্ষ অতিক্রম করে গ্রহগুলি তাদের অনেককে আপন আপন দেহ-সংলগ্ন করতে পারে নি। সূর্য ও গ্রহ উভয়েরই আকর্ষণের লব্ধিতে তারা গ্রহদিগকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। সূর্য প্রদক্ষিণ করতে করতে যেভাবে গ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল, গ্রহ প্রদক্ষিণ করতে করতে তেমনি করেই আবার উপগ্রহের জন্ম হলো। গ্রহগুলির ভর অনুসারেই তাদের উপগ্রহদের আয়তন ও সংখ্যা। বুধ ও শুক্রের উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর আছে চন্দ্র, মঙ্গলের আছে দুটি উপগ্রহ, তারপরের গ্রহটি ভেঙ্গে গেছে, বৃহস্পতির বারোটি উপগ্রহ, শনির নয়টি, ইউরেনাসের পাঁচটি, নেপচুনের দুটি এবং প্লুটোর কোনও উপগ্রহ নেই।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আমরা যে উল্কা দেখতে পাই, সেগুলি বস্তুত ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান বহিরাকাশের পার্থিব কণা ও জড়পিণ্ড। এদেরই সমাবেশে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি বলে এই মতবাদকে উল্কা মতবাদ (Meteorite Theory) বলা হয়।

ক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহের সংহতির আরম্ভ থেকে সুরু করে গ্রহগুলির সৃষ্টি হতে অন্তত দশ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল।

(২) বলয় মতবাদ (Disc Theory)

উল্কা মতবাদে গ্রহ-জন্মের সকল সমস্যা মেটে নি, ত্রুটি রয়ে গেছে। কণাগুলি একত্র সংলগ্ন হয়ে পিণ্ড হলো, পিণ্ডগুলি একে অন্যের সহিত যুক্ত হয়ে বড় বড় পিণ্ডের সৃষ্টি করলো, এরূপ ক্রমে বৃহত্তর পিণ্ড হতে হতে শেষ পর্যন্ত হলো গ্রহ। কিন্তু ওরা এভাবে একত্র সংলগ্ন থেকে গেল কেন? দ্রুতবেগের আবর্তন ছিল, আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পথ-পরিক্রমা ছিল—তবুও ওরা আবার বিছিন্ন হয়ে পড়লো না কেন? এর উত্তর চাই।

দ্বিতীয়তঃ, সূর্যের যে ভর, তাতে তার আবর্তনের গতিবেগ অনেক দ্রুত হওয়া উচিত ছিল—হিসেব মতো বারো ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসা উচিত।

অথচ দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ ছাব্বিশ দিনে মাত্র একবার ঘোরে। এই মন্থর গতির জন্যে সৌরজগতের গ্রহগুলিই নিশ্চয় দায়ী। কিন্তু কি ভাবে? এরও উত্তর চাই।

প্রশ্নগুলির সমাধানকল্পে ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) যে মতবাদ রচনা করেছেন, তাকে বলয় মতবাদ (Disc Theory) নাম দেওয়া যেতে পারে।

সূর্য জন্ম নিয়েছিল এক বিশাল গ্যাস-স্তূপ থেকে। স্তূপটির বেধ ছিল দশ লক্ষ কোটি মাইল, আর তথায় গ্যাস ছিল অত্যন্ত বিরলভাবে অবস্থিত। আভ্যন্তরীণ কোনও অস্থিরতার দরুণ স্তূপটি ধীরে ধীরে আবর্তন করছিল। আবর্তনের ফলে স্তূপটি ক্রমে সঙ্কুচিত হচ্ছিলো। সঙ্কোচনের ফলে আবার স্তূপের আবর্তন-বেগ যেমন বাড়ছিলো, তাপমাত্রাও তেমনি বাড়ছিলো। স্তূপটি ক্রমে বর্তুলাকার প্রাপ্ত হলো। এইটিই আদিম সূর্য। আবর্তন যত বৃদ্ধি পেল আদিম সূর্যের মেরুদ্বয় ততই চেপ্টে যেতে লাগলো, যার ফলে তার বিষুববৃত্ত, স্ফীত হয়ে উঠে একটি চাক্‌তি বা বলয় সৃষ্টি করলো (চিত্র-৩১)। আদিম সূর্য
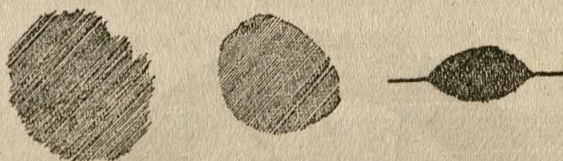
চিত্র-৩১

আদিম সূর্যের আবর্তনের ফলে ক্রমে তার সঙ্কোচন ও বিষুব বৃত্তে বলয়ের সৃষ্টি

এই বলয়ে আপন আবর্তন-বেগ সঞ্চালিত করে দিচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে বলয়টিকে দূরেও ঠেলে ফেলছিলো। একদিকে ঘূর্ণ্যমান বলয়টিকে দূরে অপসারণ, অন্য দিকে সূর্যদেহের আবর্তনজনিত সঙ্কোচন—একই সময়ে এই যুগ্মক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো এই যে, বলয়টি সূর্য থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়লো, উভয়ের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হলো।

কিন্তু সূর্যের বিষুববৃত্তে এমন একটা বলয় সৃষ্টি কি সম্ভব? সম্ভব, যদি সূর্যের আবর্তন-বেগ বেশী হয়। সৌরজগতে বর্তমানে সর্বযোগে যে বস্তু আছে, তার ভর ৪৫০টি পৃথিবীর সমান। সূর্যে যদি এখন এই সমস্ত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার আবর্তন-বেগ বৃদ্ধি পেয়ে বিষুববৃত্ত কিছুটা স্ফীত হয়ে উঠবে এই মাত্র—বেগ এতটা বাড়বে না, যাতে সেই বিষুববৃত্তে একটা বলয় সৃষ্টি হতে পারে। সূর্যের আবর্তন-বেগ বাড়িয়ে তার বিষুববৃত্তে একটি বলয় সৃষ্টি করতে হলে অন্ততঃ তিন হাজার পৃথিবীর সমপরিমাণ ভর সূর্যদেহে যোগ

করা দরকার। কাজেই বলয় মতবাদের সমর্থনে এই যুক্তির প্রয়োজন যে, সূর্যে এক কালে ঐ পরিমাণ বস্তুই ছিল। পরে বলয়রূপে বেরিয়ে এসে গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মের পরে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশ মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। বিজ্ঞানী এই তথ্যের সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। উক্ত অবশিষ্টাংশ প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস। গ্রহ-উপগ্রহ গঠনের বস্তুসমূহ ত্যাগ করে সৌর-জগতের সুদূর প্রান্তে উপনীত গ্যাসরাশিকে সূর্য তার মহাকর্ষ দিয়ে আর ধরে রাখতে পারে নি—বহির্ভাগ থেকে গ্যাস সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। সৌরজগৎ থেকে গ্যাসরাশির বিলোপের পক্ষে মহাকর্ষীয় দুর্বলতাই একমাত্র কারণ নাও হতে পারে, সেই সঙ্গে হয়তো অন্যান্য কারণও বিদ্যমান ছিল। যেমন—ভ্রাম্যমান অপর কোনও নক্ষত্রের সামীপ্য ঘটলে ঐ গ্যাস সৌর সীমানার বাইরে সেই দিকেই আকৃষ্ট হবে।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যপৃষ্ঠে একটি বলয়ের আবির্ভাব বিজ্ঞানীদের
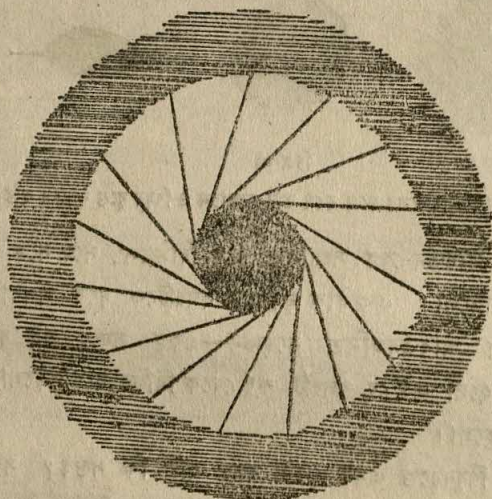
চিত্র-৩২—সূর্য ও গ্যাস বলয়ের মধ্যে চৌম্বক বন্ধন

মতে অসম্ভব নয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঐ বলয় হয়েছিল এবং সূর্যদেহের সঙ্গে তার একটা ব্যবধানও সৃষ্টি হয়েছিল। সূর্যদেহ থেকে বিচ্যুত বলয়টি এখন আর সূর্যের আবর্তন-বেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না—গতি মন্থর হয়ে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু যতটা পিছানো উচিত ততটা

পিছোবে না। তার কারণ সূর্যের মহাকর্ষ ছাড়া এস্থলে আর একটি শক্তি সক্রিয় ছিল। সেটি হচ্ছে বলয়ের গ্যাসরাশি ও সূর্যদেহের মধ্যে অবস্থিত চৌম্বক শক্তি। যে কোন চাকার নাভি বা কেন্দ্র (Hub) কতকগুলি দৃঢ় শলাকা বা অর-এর (Spokes) দ্বারা তার বেড়ের (Rim) সঙ্গে যুক্ত। ফলে চক্র-কেন্দ্র ও চক্র-বেড় একই গতিতে চলে—তাদের পারস্পরিক গতিবেগে তারতম্য হবার উপায় নেই। বলয় ও সূর্যের মধ্যে এমন কোনও অর না থাকলেও আছে অদৃশ্য চৌম্বক শক্তি। এই শক্তিকে অদৃশ্য স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে (চিত্র-৩২)। চিত্রে সূর্য যেন চক্র-কেন্দ্র ও বলয় যেন চক্র-বেড়। মধ্যেকার ফাঁকা স্থানে আছে চৌম্বক ক্ষেত্র, যার কাজ উভয়কে অদৃশ্য রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ রাখা। স্থিতিস্থাপক রজ্জুর অবস্থা চিত্রে দেখানো হয়েছে। সূর্য দ্রুত ঘুরতে চায়, কিন্তু বলয়ের সঙ্গে তার ভাগ্য বাঁধা। রজ্জু প্রসারিত হয় সত্য কিন্তু দ্রুতগামী সূর্যে পড়ে তার পিছু টান ; ফলে সূর্যের আবর্তন-বেগে মন্থরতা আসে। আবার বলয়ের গতি ধীর হতে চায়, কিন্তু সূর্যসংলগ্ন রজ্জু তাকে দ্রুত করে তোলে। এইভাবে সূর্যের গতি ক্রমে মন্থর হবার ফলে তার আবর্তনকাল শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ছাব্বিশ দিনে একবার। এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে, সূর্যের আবর্তন-বেগ যত কমলো, বলয়টিরও তত দূরে সরে যাওয়া সম্ভব হলো।

যত দূরে যাবে, বলয়টির উপর সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবও তত কমবে ; সুতরাং বলয়টি আরও দূরে অপসৃত হবে। এভাবে বলয়টি ক্রমে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যেতে লাগলো। জলন্ত অগ্নিগোলক সূর্য থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব হেতু বলয়ের তাপমাত্রাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকলো।

যাবতীয় মৌলিক পদার্থ ও তাদের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন বিবিধ যৌগিক পদার্থ উত্তপ্ত বলয়টির মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। সূর্যের নিকট থেকে দূরে সরে যেতে যেতে বলয়ের তাপমাত্রা যত কমলো, উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের (High boiling point) বস্তু থেকে আরম্ভ করে ক্রমে নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের বস্তুসমূহ ততই ঐ গ্যাস-বলয়ের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে কঠিন ও তরল পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকলো। উচ্চতাপে যে সকল অণু ঘনীভূত হতে পারে, সূর্যসন্নিহিত স্থানে তারাই সর্বপ্রথম কঠিন ও তরল পদার্থে পরিণত হলো। এদের মধ্যে প্রধান হলো লৌহ ও অন্য কতকগুলি ধাতু,

সিলিকন, ধাতব অক্সাইড এবং ধাতব সিলিকেট জাতীয় পাথর, ভারী হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি। সূর্যের নিকটস্থ বুধগ্রহ থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলগ্রহ পেরিয়ে আরও কিছুদূর পর্যন্ত এই সব বস্তু ঘনীভূত হয়েছিল। প্রাচুর্য ছিল লৌহ এবং পাথরের। এজন্যে এই স্থানকে লৌহ-শিলা অঞ্চল বলা যেতে পারে। অবশ্য লৌহ-শিলার গণ্ডী শুধু এই অঞ্চলটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সকল স্থানেই সর্ববিধ বস্তু অল্প-বিস্তর বর্তমান থাকা সম্ভব। যে অঞ্চলে যে জাতীয় বস্তুর পরিমাণ বেশী, সেই অঞ্চলকে সেই নামে অভিহিত করা হয়। পূর্বোল্লিখিত চৌম্বক শক্তির সম্পর্ক বিশেষ করে গ্যাসরাশির সঙ্গে, তরল বা কঠিন পদার্থের সঙ্গে ততটা নয়। এজন্যে লৌহ, পাথর প্রভৃতি পদার্থগুলিকে ঐ অঞ্চলেই ত্যাগ করে গ্যাস-বলয়টি বহির্মুখে ভেসে চললো। এভাবে তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকায় যখন যে অঞ্চলে যেসব কঠিন ও তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সে স্থানে রেখেই গ্যাসরাশি আরও দূরে সরে গেছে। লৌহ-শিলা অঞ্চলের পরবর্তী স্থানে তেল, জল, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হয়েছিল। তার পরের অঞ্চলে নিয়ন ও মিথেনের প্রাচুর্য। অবশেষে গ্যাসরাশিতে অবশিষ্ট থাকলো প্রধানতঃ হাইড্রোজেন। সৌর-জগতে এখন আর সেই অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব নেই, মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। কি করে হাইড্রোজেনের এরূপ বিলুপ্তি সম্ভব হলো, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রণালীর বিষয় অনুমান করেছেন। এখানে সে আলোচনার আবশ্যক নেই।

উক্ত ক্রম-অনুযায়ী সৌরজগতে সূর্যসন্নিহিত স্থানে সৃষ্টি হয়েছে প্রধানতঃ লৌহ ও পাথর দিয়ে গড়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ও গ্রহাণুপুঞ্জের। এদের সীমানা ছাড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে তেল-জল-অ্যামোনিয়া-প্রধান বৃহস্পতি ও শনির। তার পরের গ্রহদ্বয় ইউরেনাস ও নেপচুনের প্রধান উপাদান নিয়ন ও মিথেন গ্যাস।

গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ঘনীভূত হয়ে কঠিন ও তরল পদার্থসমূহ প্রথমে ক্ষুদ্র কণা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর পিণ্ডরূপে আবির্ভূত হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেকেই তারা বৃত্তাভাস পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য। সঙ্কীর্ণ স্থানে এরূপ অগণিত পথচারীর ভিড়ে কেউ গা বাঁচিয়ে চলতে পারে না। উল্কাবাদে প্রদর্শিত ঘটনাপঞ্জীর মতো এখানেও ক্ষুদ্রকণা এবং জড়পিণ্ডগুলির মধ্যে সংঘর্ষ ও সংহতি অবশ্যই ছিল। কিন্তু

প্রচণ্ড গতিবেগ সত্ত্বেও তারা সমষ্টিবদ্ধ থাকলো কি করে? আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো না কেন? অধিকন্তু পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃহদাকার ধারণ করতে থাকলো। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, নিশ্চয়ই কোনও আঠালো বস্তু বর্তমান ছিল, যা গায়ে লেগে থাকলে সংঘর্ষের পর আর ওরা পৃথক হয়ে যেতে পারে না। লৌহ-শিলা অঞ্চলে ভারী হাইড্রোকার্বন জাতীয় দ্রব্য ঘনীভূত হয়ে তৈল উৎপাদন করা সম্ভব। কণা ও পিণ্ডগুলির গায়ে এই তেল লেগে থাকলে অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় পিচ্ জাতীয় আঠালো পদার্থে পরিণত হবে। এই অবস্থায় সংঘর্ষ ঘটলেও কণা বা পিণ্ডগুলির আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে না, ক্রমে ক্রমে একতাবদ্ধ হয়ে আকারে বড় হয়ে উঠবে। তারপর মহাকর্ষের প্রভাবই ওদের আর বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না বরং নিকটস্থ ক্ষুদ্রদের আত্মসাৎ করে নিয়ে দেহ বৃদ্ধি করবে (চিত্র-৩০)।

গ্যাস-বলয়টি লৌহ-শিলার সীমানা পেরিয়ে এলে জল ও অ্যামোনিয়া ঘনীভূত হলো। এই অঞ্চলের গ্রহদ্বয় বৃহস্পতি ও শনি। সম্ভবতঃ জল ও অ্যামোনিয়া একত্রিত হয়ে এই গ্রহদ্বয়ের গোড়াপত্তন করেছিল। গ্যাস-বলয়ে লৌহ ও শিলার তুলনায় জল ও অ্যামোনিয়া অনেক বেশী ছিল; সে কারণে পূর্ববর্তী গ্রহচতুষ্টয় অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি আয়তনে অনেক বড় হলো। তথাপি শুধু আঞ্চলিক জল ও অ্যামোনিয়ার দ্বারা গঠিত হলে এই গ্রহ দুটি এত বৃহদাকারের হতে পারে না। তাই অনুমিত হয় গ্যাস-সমুদ্রে নিমজ্জিত অবস্থায় গ্রহদ্বয় প্রচুর হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা নিজেদের দেহপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রেখেছে। এদের পরবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট হয়েছে ইউরেনাস ও নেপচুন। তখন গ্যাসবলয়ে জল ও অ্যামোনিয়া আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই সম্ভবত কোনও হাল্কা হাইড্রোকার্বন থেকে এই গ্রহদ্বয়ের জন্মের সূত্রপাত হয় এবং পরে অন্যান্য পদার্থ যুক্ত হয়ে এদের দেহবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। এদের মহাকর্ষ প্রবল হবার আগেই হাইড্রোজেন এই অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে, নতুবা এদের পৃষ্ঠদেশে হাইড্রোজেনের আবরণ অবশ্যম্ভাবী হতো। নিয়ন ও মিথেন গ্যাস হাইড্রোজেনের মতো সৌরজগৎ ত্যাগ করে যেতে পারে নি। এজন্যে মহাকর্ষের দ্বারা ইউরেনাস ও নেপচুন প্রভূত পরিমাণ নিয়ন ও মিথেন গ্যাস আপন আপন দেহে বন্দী করে রেখেছে।

লৌহ-শিলা অঞ্চলে হাইড্রোজেন থাকাকালে কোনও আঠালো পদার্থ উৎপন্ন

হতে পারে না। তাই হাইড্রোজেন সে অঞ্চল থেকে দূরে সরে গেলে পর তথাকার গ্রহগুলির জন্ম শুরু হয়। কণা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে পিণ্ড, বড় পিণ্ড ও গ্রহের আকারে আসতে যে সময় অতিবাহিত হয়, ততদিনে বলয়ের গ্যাসের অতি সামান্য অংশই এই স্থানে অবশিষ্ট ছিল। এ জন্যে কোনও গভীর গ্যাসীয় আবরণ অর্থাৎ আবহমণ্ডল তাদের পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ হতে পারে নি। বুধের তো কোনই আবহমণ্ডল নেই, পৃথিবী ও মঙ্গলের পৃষ্ঠে আবহমণ্ডল আছে, কিন্তু বৃহস্পতির তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

বহু ছোট ছোট জড়পিণ্ড ক্রমান্বয়ে একত্রিত হয়ে একটি গ্রহের উদ্ভব হলো— নাকি ছোট পিণ্ডগুলি প্রথমে গুটিকয়েক বড় পিণ্ড হলো ও পরে কয়েকটি বড় পিণ্ডের যোগে একটি গ্রহ হয়ে দাঁড়ালো? এসব প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নি। তবে মনে হয় উভয়ই সম্ভব। যে সব গ্রহের মেরু তাদের ভ্রমণকক্ষের উপর খাড়াভাবে অর্থাৎ সমকোণে বা প্রায় সমকোণে অবস্থিত, সেগুলি বোধ হয় ছোট ছোট পিণ্ডের সমষ্টি। আর যাদের মেরু ভ্রমণকক্ষের সঙ্গে অনেকটা হেলানো, সেগুলি বোধ হয় একাধিক বড় পিণ্ডের সংযোগে গঠিত।

তারপর উপগ্রহ হলো কি ভাবে? যে সব বৃহৎ পিণ্ড নিকটস্থ বৃহত্তর পিণ্ডের অর্থাৎ গ্রহের সঙ্গে মিশে যেতে না পেরে সূর্য এবং গ্রহ উভয়ের মহাকর্ষের প্রভাবের মধ্যে দোটানায় পড়ে গেল, সেগুলিই উপগ্রহ হয়ে রইলো। উপগ্রহের সৃষ্টি সম্বন্ধে এরকম উত্তর দেওয়া চলে, কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়। পৃথিবীর উপগ্রহ একমাত্র চাঁদ কেন? আরও কয়েকটা কেন নয়? বৃহস্পতির উপগ্রহ বারোটা কেন? আরও কম কিংবা বেশী কেন নয়? ইত্যাদি। এসব প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নি।

সূর্যের নিকটস্থ বুধগ্রহ থেকে আরম্ভ করে মঙ্গল পেরিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত লৌহ-শিলার ক্ষেত্র বিস্তৃত। দুই সীমানায় অবস্থিত বুধ ও মঙ্গল খুব বেশী লৌহ এবং পাথর সংগ্রহ করবার সুযোগ পেতে পারে না, তাই তারা ক্ষুদ্রায়তন। মধ্যস্থলে অবস্থিত শুক্র এবং পৃথিবী প্রচুর লৌহ ও শিলা সঞ্চয় করে আকারে অনেকটা বড় হয়েছে। মঙ্গল পেরিয়ে গ্রহাণুপুঞ্জে যে তিন সহস্রাধিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ জড়পিণ্ড অর্থাৎ অণু-গ্রহ আছে, তারা একত্র যুক্ত হলেও বড়জোর চন্দ্রের সমায়তন হতো।

উপগ্রহগুলির ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে বলয় মতবাদের যুক্তিপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। যে গ্রহ সূর্য থেকে যত দূরে তাদের উপগ্রহগুলির ঘনত্বও তত

কম। কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এটাই সাধারণ নিয়ম। চন্দ্র লৌহ-শিলা অঞ্চলে গঠিত। বৃহস্পতির উপগ্রহ আইয়ো ও ইউরোপার গঠন-উপাদান সম্ভবত গ্রহাণুপুঞ্জের ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। বৃহস্পতির অপর দুইটি বিরাটাকার উপগ্রহ গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টোতে কম ঘনত্বের উপাদান বেশী। সে উপাদান সম্ভবত জল। শনির উপগ্রহগুলিতে বোধহয় জল ও অ্যামোনিয়ার প্রাচুর্য।

উল্কাবাদ ও বলয়বাদ দুটি মত-ই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এখনও বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

দশম অধ্যায়

জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্বের একক

ছোট খাটো দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব মাপতে হলে আমরা ইঞ্চি, ফুট, গজ, মিটার প্রভৃতি একক ব্যবহার করি। দূরত্ব বেশী হলে মাইল, কিলোমিটার ইত্যাদি একক ব্যবহৃত হয়। বেশী দূরত্বের ক্ষেত্রে ইঞ্চির ব্যবহার নিঃসন্দেহে অসুবিধা-জনক। কলকাতা থেকে দিল্লী কত ইঞ্চি দূরে—এ হিসেব ব্যবহারিক জগতে অচল। সৌরজগতে সূর্য থেকে গ্রহ-উপগ্রহদের দূরত্ব কিংবা কোনও গ্রহ থেকে তার উপগ্রহ বা অন্য গ্রহের দূরত্ব মাইল অথবা কিলোমিটার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

সৌরজগতের সীমানার মধ্যে দূরত্ব মাপার জন্যে জ্যোতির্বিদ্‌রা অপর একটি একক ব্যবহার করেন। সেটি হচ্ছে সূর্য থেকে পৃথিবীর গড়-দূরত্ব ; অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধান ৯৩০০০০০০ মাইল অথবা ১৪৯৫০০০০০ কিলোমিটার দূরত্বকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ে একক রূপে ব্যবহার করেন। একে জ্যোতিষিক একক (Astronomical Unit বা A. U.) বলে। জ্যোতিষিক একক কেবল সৌরজগতের মধ্যস্থিত দূরত্ব মাপের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হয়, এ জন্যে একে সৌর-এককও বলা যেতে পারে। এই হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১ জ্যোতিষিক বা সৌর-একক। তেমনি সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব ০·৩৯ জ্যোতিষিক একক, বৃহস্পতির ৫·২, শনির ৯·৫৪ ইত্যাদি।

কিন্তু দূর গগনের নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপার পক্ষে উপরের কোনও এককই সুবিধাজনক নয়। তাতে ১-এর পিঠে বিশ পঞ্চাশটা শূন্য বসিয়ে তাকেও আবার কিছু দিয়ে গুণ করার আবশ্যক হবে। মারাত্মক ব্যাপার! অঙ্কের এ দীর্ঘ সারি পড়া, লেখা, মনে রাখা এবং সর্বোপরি এ থেকে দূরত্বের ধারণা করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। এ জন্যে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে অপর দুইটি একক ব্যবহার করেন,—একটি আলোকবর্ষ, অন্যটি পারসেক।

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ড সময়ে ১৮৬০০০ মাইল। এই গতিবেগে এক মিনিটে আলোকরশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলে আলো-মিনিট, এক বৎসরে আলোক রশ্মি যে দূরত্ব পরিক্রমণ করে তাকে বলে আলোকবর্ষ।

এক বৎসরে আলোকরশ্মি ছয় লক্ষ কোটি মাইল বা নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। কাজেই এক আলোকবর্ষের পরিমাপ ৬০০০০০০০০০০০০ (৬×১০^{১২}) মাইল বা ৯৪৬০০০০০০০০০০ (৯৪৬×১০^{১০}) কিলোমিটার।

সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধানকে অতিক্রম করতে আলোকের আট মিনিট সময় লাগে, তাই এইমাত্র যে সূর্যরশ্মিটি আমাদের গাত্রস্পর্শ করলো সেই রশ্মিটি সূর্য থেকে যাত্রা করেছিল আট মিনিট আগে। বস্তু থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে আসে বলেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই, নয়তো সে আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যেত। আকাশে আমরা যত জ্যোতিষ্ক দেখতে পাই তাদের কাছ থেকে আলোকরশ্মি রওনা হয়ে পৃথিবীতে পৌছুতে কারও লেগেছে দূরত্ব অনুযায়ী কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, কয়েক মাস কিংবা দশ, বিশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কিংবা কোটি কোটি বছর। আবার, কোটি কোটি বছর ধরে ঐ গতিবেগে ছুটতে ছুটতে যে নক্ষত্রালোক আজও পৃথিবীতে এসে পৌছুতে পারে নি সে নক্ষত্র আজও আমাদের অদৃশ্য রয়ে গেছে, ভবিষ্যতে কোনদিন তার দেখা পাওয়া যাবে।

নাক্ষত্রিক দূরত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই আলোকবর্ষ এককটির ব্যবহার প্রচুর। বর্তমানে পারসেক একক ধীরে ধীরে আলোকবর্ষের স্থান অধিকার করে নিচ্ছে।

পারসেক কথাটি এসেছে Parallax ও Second এই দুটি ইংরেজী শব্দকে সংক্ষেপ করে ও সন্ধি করে। পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের দুই প্রান্তকে ঊর্ধ্বাকাশের কোনও নক্ষত্রের সঙ্গে রেখাযুক্ত করলে সেই নক্ষত্রে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাকে বলে বর্ষভিত্তিক বা বার্ষিক লম্বন (Annual Parallax)। যত দূরে গেলে এই লম্বনের পরিমাপ ডিগ্রির মাপে এক সেকেণ্ড (Second) পরিমিত কোণ উৎপন্ন হয় সেই দূরত্বকে বলে পারসেক (Parsec)। তাহলেই দাঁড়াচ্ছে এই যে, ঊর্ধ্বাকাশের কোনও নক্ষত্রকে যদি সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে রেখাযুক্ত করা হয় এবং তখন যদি নক্ষত্রে এক সেকেণ্ড পরিমিত কোণ উৎপন্ন হয় তবে পৃথিবী ও নক্ষত্রের মধ্যেকার দূরত্ব এক পারসেক।

কোনও বিন্দুতে এক সেকেণ্ড পরিমিত কোণ উৎপন্ন করে তার সম্মুখে যদি এক ইঞ্চি দীর্ঘ ভূমি দেখতে হয় তবে ঐ ভূমিকে বিন্দু থেকে ২০৬২৬৫ ইঞ্চি দূরে অবস্থিত হতে হবে।

তেমনি এক মিটার ভূমির সম্মুখে এক সেকেণ্ড পরিমিত কোণ উৎপন্ন

হবে ২০৬২৬৫ মিটার দূরস্থিত বিন্দু থেকে। পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের উপরও যে বিন্দু থেকে এক সেকেণ্ড কোণ উৎপন্ন হয় সেই বিন্দু ঐ ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের ২০৬২৬৫ গুণ দূরে।

পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ মানে সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধান অর্থাৎ ৯৩০০০০০০ মাইল। সুতরাং ঐ ব্যাসার্ধ থেকে যে বিন্দু ৯৩০০০০০০ × ২০৬২৬৫ মাইল দূরে সেই বিন্দু থেকে ব্যাসার্ধের দুই প্রান্ত অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবী যুক্ত করলে এক সেকেণ্ড পরিমিত কোণ উৎপন্ন হয়। অতএব এক পারসেক হচ্ছে ৯৩০০০০০০ × ২০৬২৬৫ মাইল। অথবা আঙ্কিক হিসেবটি এই—

১ পারসেক—মোটামুটি ১৯২০০০০০০০০০০০০ মাইল বা ১৯২ × ১০^{১১} মাইল।
=৩০৮ × ১০^{১১} কিলোমিটার মোটামুটি।
= প্রায় ৩·২৬ আলোকবর্ষ।

অর্থাৎ আলোকবর্ষ অপেক্ষা পারসেক প্রায় সওয়া তিন গুণ বেশী দূরত্বের পরিচায়ক।

এ তো গেল বৃহৎ দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব পরিমাপের কথা। অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারের মাপ অসুবিধাজনক। যেমন—কতকগুলি রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এই ভগ্নাংশের ব্যবহার নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। তাই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে অ্যাঙস্ট্রম (Angstrom) নামক একটি একক ব্যবহৃত হয়। ১০^{-৮} সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগকে বলে এক অ্যাঙস্ট্রম। বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট আলোর বেগুনী রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ অ্যাঙস্ট্রম এবং লাল রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০০ অ্যাঙস্ট্রম। অতিবেগুনী, রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও অনেক ছোট, কোন কোনটা এত ছোট যে, অ্যাঙস্ট্রমকে ভগ্নাংশে পরিণত করা দরকার। কাজেই অনেক বিজ্ঞানী ক্ষুদ্র দূরত্বের ক্ষেত্রেও কোন সময়েই অ্যাঙস্ট্রম একক ব্যবহার না করে সোজাসুজি সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশই ব্যবহার করেন। যেমন, বেগুনী রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪০০০ অ্যাঙস্ট্রম না লিখে এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ অর্থাৎ ৪ × ·০০০০০১ বা ৪ × ১০^{-৫} সেন্টিমিটার লেখা হয়। সাধারণত বর্ণালীর দৃশ্য অংশের রঙীন আলোকরশ্মিসমূহের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিবৃতিতে অ্যাঙস্ট্রম একক ব্যবহৃত হয়। অ্যাঙস্ট্রম এককের সাঙ্কেতিক চিহ্ন Å. U।

বর্ণালীর অবলোহিত অংশের বিবৃতিতে মাইক্রন (Micron) এককের ব্যবহার হয়। মাইক্রন মানে এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ $১০^{-৪}$ সেন্টিমিটার। রেডিও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণত মাইক্রন একক দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। মাইক্রনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন μ। তাছাড়া মিলি মাইক্রন (Milli-micron) অর্থাৎ মাইক্রনের সহস্র ভাগের এক ভাগ এককটির ব্যবহারও আছে। এক মিলিমাইক্রন $১০^{-৭}$ সেন্টিমিটারের সমান, সাঙ্কেতিক চিহ্ন $\mu\mu$।

এগুলি ছাড়া X-একক নামক অপর একটি এককও বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন। X-এককের ব্যবহার হয় বর্ণালীর রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিবৃতির ক্ষেত্রে। X-একক মানে $১০^{-১১}$ সেন্টিমিটার। X-এককের সাঙ্কেতিক চিহ্ন X. U।

একাদশ অধ্যায়

জ্যোতিষ্কের দীপ্তিমাত্রা

প্রাচীনকালে জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন—তাদের ঔজ্জ্বলের তারতম্য অনুসারে। সে যুগে দৃষ্টির সহায়ক কোনও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয় নি, কাজেই খালি চোখের দৃষ্টিশক্তির উপরই জ্যোতিষীদের নির্ভর করতে হতো। সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার প্রারম্ভে যে নক্ষত্রদের উদয় হতে দেখা যায় তারা নিঃসন্দেহে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এদের তাঁরা বললেন প্রথম প্রভার নক্ষত্র। এর পর যে নক্ষত্রদের উদয়,—তারা দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র। তারপর ক্রমান্বয়ে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্রদের উদয়। ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্র এত ম্লান যে, খালিচোখে দেখা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। এদের চেয়ে ম্লানতর নক্ষত্র খালিচোখের দৃষ্টিবহির্ভূত।

প্রথম প্রভার নক্ষত্ররা যে সকলে সমান দীপ্তিশালী তা নয়। সকলে তারা একই মাত্রা বা মানের কাছাকাছি—কেউ একটু বেশী উজ্জ্বল, কেউ একটু কম। তাই তারা সকলেই একই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি প্রতি প্রভার নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও এই একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ নির্ধারিত মানাঙ্ক থেকে কেউ একটু কম বা একটু বেশী উজ্জ্বল হলে তাকে ঐ নির্দিষ্ট মানাঙ্কযুক্ত প্রভাব নক্ষত্রই বলা হয়। প্রথম প্রভাব নক্ষত্র সংখ্যা কুড়ি, দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র সংখ্যা চল্লিশের বেশী তৃতীয় প্রভার আরও বেশী। এইভাবে যত বেশী ম্লান, সেই শ্রেণীর নক্ষত্র সংখ্যাও তত বেশী।

পরবর্তীকালে দৃষ্টিসহায়ক দূরবীনের আবিষ্কারের পর দেখা গেল নক্ষত্রদের প্রভা বা দীপ্তিমাত্রার এই ক্রমিক শ্রেণী বিভাগে একটা জ্যামিতিক প্রগতি **(Geometrical Progression)** বর্তমান। জ্যামিতিক ব্যবধান উঁচু থেকে নীচের দিকে ২·৫ ভাগ, ভাষান্তরে নীচ থেকে উপরের দিকে ২·৫ গুণ। অর্থাৎ ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্রের তুলনায় পঞ্চম প্রভার নক্ষত্র ২·৫ গুণ বেশী দীপ্তিশালী, পঞ্চম থেকে চতুর্থ আরও ২·৫ গুণ, এইভাবে বাড়তে বাড়তে ষষ্ঠ প্রভার

নক্ষত্রের তুলনায় প্রথম প্রভার নক্ষত্রের দীপ্তি দাঁড়ায় প্রায় একশত গুণ। প্রায় একশত গুণ, ঠিক ঠিক একশত গুণ নয়। এতে কিছু আঙ্কিক অসুবিধা আছে, তাই ঠিক ঠিক একশত গুণের নিকটতম সংখ্যা পাওয়ার জন্যে পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণ ঐ জ্যামিতিক ব্যবধানকে ২·৫ না রেখে ২·৫১২ করে নিলেন। অর্থাৎ নিম্নতর প্রভার নক্ষত্রের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর নক্ষত্রের প্রভা ২·৫১২ গুণ বেশী। যেমন, দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রের চেয়ে প্রথম প্রভার নক্ষত্র ২·৫১২ গুণ বেশী দীপ্তিশালী। এই হিসেবে ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্রের তুলনায় প্রথম প্রভার নক্ষত্রের দীপ্তি ১০০ গুণ বেশী। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি ১০০ অপেক্ষা এত সামান্য বেশী যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

দূরবীনের চোখে আরও দেখা গেল যাদের প্রথম প্রভার নক্ষত্র বলা হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ উজ্জলতর নক্ষত্র আকাশে অনেকানেক আছে, আবার ষষ্ঠ প্রভার চেয়ে ম্লানতর নক্ষত্রেরও অভাব নেই। প্রথম প্রভার নক্ষত্রের চেয়ে যে সব নক্ষত্র ২·৫১২ গুণ বেশী উজ্জল তাদের কোন্ প্রভার নক্ষত্র বলা হবে? বাধ্য হয়েই তাদের নাম হলো শূন্য (০) প্রভার নক্ষত্র। শূন্য প্রভার নক্ষত্রের তুলনায় যে নক্ষত্রদের দীপ্তি ২·৫১২ গুণ বেশী তাদের বলা হল বিয়োগ এক (—১) প্রভার নক্ষত্র। এই প্রকারে অধিকতর উজ্জল নক্ষত্রদের তাদের মান অনুযায়ী ঋণসংখ্যা দ্বারা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ভালই হলো। প্রাচীন জ্যোতিষীদের মর্যাদা রেখে তাদের নির্ণীত মানে কোনও পরিবর্তন ঘটানো হলো না, আবার মানের বৈজ্ঞানিক ক্রমও যথাযথ বজায় থাকলো। অতএব নক্ষত্র বা কোন জ্যোতিষ্কের ঔজ্জল্যের মাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে তাদের মানাঙ্ক সংখ্যা তত কমতে কমতে অবশেষে বিয়োগ সংখ্যায় চলে যাবে। এমনধারা ক্রম প্রথমে কিছুটা অসঙ্গত বোধ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু প্রণালীটি অঙ্কের দিক দিয়ে সত্যই বিজ্ঞানসম্মত।

ঠিক ঠিক প্রথম প্রভার নক্ষত্র বা ঠিক ঠিক দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র—এইরূপ পূর্ণ মানাঙ্কযুক্ত জ্যোতিষ্ক আকাশে বড় একটা দেখা যায় না। কাজেই প্রথম প্রভার জ্যোতিষ্ক বলতে বুঝায় যাদের দীপ্তি ১-এর কাছকাছি অর্থাৎ ১-এর কিছু কম বা কিছু বেশী। সেইরূপ ২য়, ৩য় বা-১ম,-২য় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন শ্রবণা নক্ষত্রের দীপ্তিমাত্রা ০·৯ এবং মঘা নক্ষত্রের দীপ্তিমাত্রা ১·৩, কিন্তু উভয়ই প্রথম প্রভার নক্ষত্রের শ্রেণীভুক্ত।

প্রথম প্রভার কুড়িটি নক্ষত্রের নাম ও তাদের দীপ্তিমাত্রা নীচের তালিকায় ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়া হলো :—

১। লুব্ধক (Sirius)—(—১·৬)
২। অগস্ত্য (Canopus)—(—০·৯)
৩। আলফা সেণ্টরি (a Centauri)—(০·১)
৪। অভিজিৎ (Vega)—(০·১)
৫। ব্রহ্ম হৃদয় (Capella)—(০·২)
৬। স্বাতী (Arcturus)—(০·২)
৭। বাণ রাজা (Rigel)—(০·৩)
৮। প্রশ্বা (Procyon)—(০·৫)
৯। আথার্নার (Acherner)—(০·৬)
১০। বিটা সেণ্টরি (b Centauri)—(০·৯)
১১। আর্দ্রা (Betelgeuse)—(০·৯)
১২। শ্রবণা (Altair)—(০·৯)
১৩। আলফা ক্রস (a Crusis)—(১·১)
১৪। রোহিণী (Aldebaran)—(১·১)
১৫। পুনর্বসু (Pollux)—(১·২)
১৬। চিত্রা (Spica)—(১·২)
১৭। জ্যেষ্ঠা (Antares)—(১·২)
১৮। ফোমালো (Fomalhaut)—(১·৩)
১৯। দেনেব (Daneb)—(১·৩)
২০। মঘা (Regulus)—(১·৩)

উক্ত হিসেব অনুযায়ী সূর্যের প্রভার মানাঙ্ক (—২৬·৮), পূর্ণ চন্দ্রের মানাঙ্ক (— ১২·৬) এবং সৌরজগতের গ্রহদের প্রভার মানাঙ্ক তাদের উজ্জ্বলতম অবস্থায় নিম্নরূপ :—

শুক্র -(—৪·৩) মঙ্গল-(—২·৮)
বৃহস্পতি-(—২·৫) বুধ-(—১·২)
শনি-(-০·৪) ইউরেনাস-(৫·৭)
নেপচুন-(৭·৬)

জ্যোতিষ্কগণ যে যেখানে অবস্থিত সেই দূরত্ব থেকে তাদের যে প্রভা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অনুসারেই তাদের মানাঙ্ক স্থির করা হয়েছে। একে বলা হয় জ্যোতিষ্কের আপাত (Apparent) প্রভা। এতে তাদের প্রকৃত প্রভার নির্দেশ পাওয়া যায় না। অনেক দূরের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র পৃথিবী থেকে অত্যন্ত ম্লান দেখাতে পারে এবং নিকটস্থ অত্যন্ত ম্লান নক্ষত্রকে ঐ নক্ষত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দেখাতে পারে। দূরের এবং কাছের এই নক্ষত্র দুটিকে যদি সমান দূরত্বে রেখে তাদের প্রভার পরিমাপ করা হতো তা'হলেই তাদের প্রকৃত প্রভার তুলনা করা সম্ভব হতো।

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, নক্ষত্রের আপাত প্রভা মানে তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য এবং তার অবস্থিতির দূরত্বের মিলিত ফল। এক নক্ষত্রের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে অপর এক নক্ষত্রের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য জানতে হলে পৃথিবী থেকে তাদের সমান দূরত্বে রেখে প্রভার তুলনা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন পৃথিবী থেকে দশ পারসেক দূরে থাকলে নক্ষত্রের যে আপাত প্রভা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে তাকেই বলা হবে প্রতি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের পরম বা ধ্রুব মানাঙ্ক (Absolute magnitude) সূর্যের আপাত ঔজ্জ্বল্য —২৬·৮, কিন্তু দশ পারসেক দূরে নিলে সূর্যের প্রভার মানাঙ্ক বা মাত্রা দাঁড়ায় ৪·৮। তার মানে দশ পারসেক দূরত্বে সূর্যকে ৪·৮ মাত্রার অর্থাৎ পঞ্চম প্রভার নক্ষত্রের ন্যায় দেখাবে। সেই রূপ দশ পারসেক দূরত্বে লুব্ধককে ১·৩ মানাঙ্কের নক্ষত্রের মতো দেখাবে। তেমনি বহু দূরস্থিত কোনও ষষ্ঠ প্রভার নক্ষত্রকে দশ পারসেক দূরত্বে নিয়ে এলে হয়তো তাকে দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রের মতো দেখাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের আপাত প্রভার মাত্রা পরিমাপ করেন ফটোমিটার (Photometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে। প্রভার মাত্রা জানা আছে এমন একটি নক্ষত্র বা কৃত্রিম জ্যোতিষ্কের সঙ্গে জ্ঞাতব্য নক্ষত্রের প্রভা তুলনা করার ব্যবস্থা ঐ যন্ত্রে বর্তমান।

কোনও নক্ষত্রের প্রভার পরম মাত্রা ও আপাত মাত্রা জানা থাকলে তার অবস্থিতির দূরত্ব নির্ণয় করা সহজেই সম্ভব।

দ্বাদশ অধ্যায়

দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা দূরবীন

কতকগুলি চশমায় কাচের মধ্যস্থল বেশ পুরু, কিনারার দিকে ক্রমান্বয়ে পাত্‌লা। নীচে রাখলে কাচের মধ্যস্থল ভূমিতে লেগে থাকে, চতুর্দিকের প্রান্ত কোথাও ভূমি স্পর্শ করে না, একটু উপরে উঠে থাকে। কোন বস্তু এমন হলে তাকে উত্তল (Convex) আকৃতি বলে। আতস কাচ বলতে আমরা ঐ রকম উত্তল আকৃতির কাচই বুঝি। আর এক রকমের চশমা আছে যার বৃত্তাকার কাচখণ্ড কিনারা থেকে মধ্যস্থলের দিকে ক্রমান্বয়ে খাদে নেমে যায়, কতকটা চায়ের পিরিচের মতো। একে অবতল (Concave) আকৃতি বলা হয়।

সরল একটি পেন্সিল জলে ডুবিয়ে একটু হেলানোভাবে ধরলে জল ও বায়ুর সংযোগস্থলে জলের মধ্যে পেন্সিলটাকে হঠাৎ বাঁকা দেখায়, মনে হয় পেন্সিলটা ঐ জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। সূর্যের রশ্মি সমান্তরাল সরলরেখায় এসে যদি কোনও আতস কাচের এক পিঠে পড়ে, সেই রশ্মিগুলি কাচের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঐ পেন্সিলের মতো বেঁকে যায়। কাচ ও বায়ু উভয়ই স্বচ্ছ, কিন্তু ঘনত্ব পৃথক। পৃথক ঘনত্বের জন্যেই সরলরেখায় ভ্রাম্যমান রশ্মি ঐ প্রকার বেঁকে যায়। বেঁকে যায় মানে রশ্মিগুলি যে ঢেউ খেলানো হয়ে গেল তা নয়। রশ্মিগুলি সরলরেখায়ই ভ্রমণ করে, শুধু বায়ু ও কাচের ঘনত্ব পৃথক বলে বায়ু থেকে কাচে ঢুকবার সময়ে রশ্মির দিক-পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু ভ্রমণ পথ সরলই থাকে। আবার অপর পিঠে কাচ থেকে বায়ুতে বেরোবার সময়ে সেই রশ্মিগুলির দ্বিতীয় বার দিক পরিবর্তন ঘটে। এই অভিমুখ পরিবর্তনকে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ (Refraction) বলে। আতস কাচের এক পিঠে যতগুলি রশ্মি পড়ে, প্রতিসরণের ফলে তারা সব বেঁকে গিয়ে অপর পিঠের দিকে এক বিন্দুতে এসে সম্মিলিত হয় এবং তথাকার তাপমাত্রা এত বেড়ে যায় যে, সেখানে কোন সহজ দাহ্য পদার্থ রাখলে অনতি-বিলম্বে আগুন ধরে। দিয়াশলাই আবিষ্কারের পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে এই উপায়ে আগুন জ্বালানো হতো।

যে বিন্দুতে এসে ঐ রশ্মিগুলি মিলিত হয় তাকে আতস কাচটির ফোকাস (Focus) বলে। আতস কাচের আর একটি গুণ আছে। সকলেই জানে আতস কাচের ভিতর দিয়ে দেখলে বইয়ের অক্ষর বড় দেখায়। অবশ্য বইয়ের অক্ষরগুলি থাকা চাই কাচখণ্ড ও তার ফোকাসের মধ্যবর্তী কোন স্থানে। ফোকাস বিন্দুর চেয়ে দূরে থাকলে অক্ষরগুলি বড় দেখাবে না, ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিষ পর্যবেক্ষণ করা যায় তার নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা দূরবীন (Telescope)। যন্ত্রটির নির্মাণ-প্রণালী সহজবোধ্য কিন্তু প্রণালী অনুযায়ী যন্ত্রটি প্রস্তুত করতে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সাধারণ অনতিবৃহৎ দূরবীনে আতস কাচ ব্যবহৃত হয়।

হল্যাণ্ডের এক ডাচ চশমা-শিল্পী ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে একটি দূরবীন প্রস্তুত করেন। ইটালীয় জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই প্রণালীর দূরবীন দিয়ে চন্দ্র ও গ্রহদের রূপ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হন। এমন আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে তিনি যাদের আমন্ত্রণ করে আনলেন তারা দেখে ভাবলেন গ্যালিলিও ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। দূরবীনের সাহায্যে এই প্রথম আকাশ পর্যবেক্ষণ। তারপর বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনের নির্মাণ-কৌশলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বর্তমান কালে দুই প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন—(১) প্রতিসরিত আলোর দূরবীন (Refracting Telescope বা Refractor) এবং (২) প্রতিফলিত আলোর দূরবীন (Reflecting Telescope বা Reflector)।

প্রতিসরিত আলোর দূরবীন

প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে আতস কাচের ব্যবহার। ধাতু-নির্মিত একটি সরল চোঙের এক মুখে থাকে একটা বড় আতস কাচ, অন্য মুখে থাকে অপেক্ষাকৃত ছোট অপর একটা আতস কাচ। বড় কাচটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে নির্দিষ্ট রেখে ছোট কাচটির কাছে চোখ দিয়ে দেখতে হয়। লক্ষ্যবস্তু অভিমুখী কাচটিকে বলে অবজেক্ট গ্লাস (Object glass) বা লক্ষ্যকাচ। যে ছোট কাচের কাছে চোখ রাখতে হবে তাকে বলে

আই পিস (Eye piece) বা অক্ষিকাচ। কাচ দুটি চোঙের দুই মুখে এমন দূরত্বে স্থাপন করা হয় যেন উভয়েরই ফোকাস এক বিন্দুতে মিলিত হয় এবং উভয়ের অক্ষ একই সরলরেখায় অবস্থিত থাকে। এই দূরবীন দিয়ে দেখলে দূরের বস্তুকে কিছুটা কাছে দেখাবে, অপেক্ষাকৃত বড়ও দেখাবে (চিত্র-৩৩)।
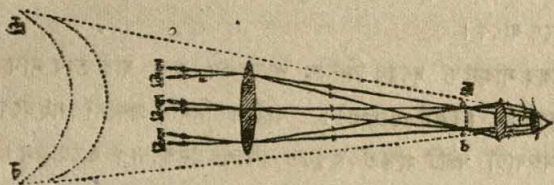
চিত্র-৩৩
প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে ক্ষীণ চন্দ্রের বর্ধিত প্রতিচ্ছবি।

দূরবীনে গ্রহ-উপগ্রহদের বৃহদায়তন ও স্পষ্ট দেখায়। কিন্তু নক্ষত্রদেরও কি বড় দেখাবে? দেখায় না। তার কারণ নক্ষত্ররা এত দূরে যে, তাদের বড় দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক স্পষ্ট দেখাবে। খালি চোখে আমরা নক্ষত্রদের উজ্জ্বল বিন্দুর মত দেখি। দূরবীনেও নক্ষত্ররা থালার মতো কিংবা নিতান্ত ছোট একটা চাক্‌তির মতোও দেখায় না, এক্ষেত্রেও তারা পূর্ববৎ উজ্জ্বল বিন্দু কিন্তু ঔজ্জ্বল্য অনেক গুণ বেশী। এইটুকুই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরম লাভ।

তিন ইঞ্চি ব্যাসের চক্রাকার আতস কাচ যে দূরবীনে লক্ষ্যবস্তুর দিকে নির্দিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় তিন ইঞ্চি দূরবীন। ঐ আতস কাচ অর্থাৎ অবজেক্ট গ্লাসটির ব্যাস ত্রিশ ইঞ্চি হলে তাকে বলা হয় ত্রিশ ইঞ্চি দূরবীন।

তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি চক্রাকার স্থানের আয়তন আমাদের চোখের মণির আয়তনের এক শত গুণ। অতএব আমাদের চোখের মণির উপর একটি নক্ষত্র থেকে যে পরিমাণ আলোক-রশ্মি এসে পড়ে, একটা তিন ইঞ্চি আতস কাচের উপর তার এক শত গুণ বেশী আলোক পড়ে। কাজেই তিন ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে আমরা নক্ষত্রটিকে শত গুণ উজ্জ্বল দেখি। আমাদের চোখের মণি যদি বর্তমানের তুলনায় শত গুণ বড় হতো তাহলে নক্ষত্রটিকে আমরা যেমন উজ্জ্বল দেখতাম, তিন ইঞ্চি দূরবীনে আমরা ঠিক তেমনই দেখি। ত্রিশ ইঞ্চি দূরবীনে খালি চোখের তুলনায় দশ হাজার গুণ বেশী

আলোকপাত হয়। এই সকল দূরবীনের ফোকাসে ফটোগ্রাফের প্লেট রেখে নক্ষত্রের আলোকচিত্র নিলে সেই ছবি যে সবিশেষ স্পষ্ট হবে তা সহজেই অনুমেয়। ফোকাসে তিনপলা কাচ বা প্রিজ্‌ম রেখে নক্ষত্রের আলোকরশ্মির বর্ণালীও গ্রহণ করা হয়। বস্তুত দূরবীনে চোখ রেখে নক্ষত্র দেখার প্রয়োজন তেমন গুরুতর নয়, নক্ষত্রের আলোকচিত্র ও বর্ণালী জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ Refractor বা প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে লক্ষ্যবস্তু অভিমুখী আতসকাচের অর্থাৎ অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস চল্লিশ ইঞ্চি। এই চল্লিশ ইঞ্চি দূরবীনটি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ের্কস মানমন্দিরে (Yerkes Observatory) স্থাপিত (প্লেট নং-ড)।

প্রতিফলিত আলোর দূরবীন

প্রতিফলিত আলোর দূরবীনে (Reflecting Telescope বা Reflector) জ্যোতিষ্কের আলোকপাত হয় অবতল দর্পণের উপর। দর্পণ থেকে আলোকরশ্মিসমূহ প্রতিফলিত হয়ে একটি বিন্দুতে অর্থাৎ দর্পণের ফোকাসে গিয়ে মিলিত হয়। চক্রাকার দর্পণের মুখের ব্যাস অনুযায়ী এ জাতীয় দূরবীনেও জ্যোতিষ্ক থেকে আপতিত আলোকরশ্মি একত্র সংঘবদ্ধ হয়ে ঔজ্জ্বল্য বহু লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পায়।

সুবৃহৎ দূরবীন মাত্রই এই প্রকার দর্পণ থেকে প্রতিফলিত আলোর প্রণালী অবলম্বনে প্রস্তুত। আমেরিকায় মাউন্ট উইলসনে (Mt. Wilson) স্থাপিত এক শত ইঞ্চির দূরবীন এবং মাউন্ট প্যালোমারে (Mt. Palomer) স্থাপিত দুই শত ইঞ্চির দূরবীন—উভয়ই প্রতিফলিত আলোর দূরবীক্ষণ যন্ত্র। আমেরিকায় লিক মানমন্দিরে (Lick Observatory) স্থাপিত ১২০ ইঞ্চি দূরবীনটিও প্রতিফলিত আলোর দূরবীন। বর্তমানে গ্রীনিচ মানমন্দিরের জন্যে বৃটেনে ৯৮ ইঞ্চির একটি ও রাশিয়ায় ২৩৬ ইঞ্চির একটি এই জাতীয় অর্থাৎ প্রতিফলিত আলোর দূরবীন প্রস্তুত করা হচ্ছে। মাউন্ট উইলসনের ১০০ ইঞ্চির দূরবীন দ্বারা এক শত কোটি আলোকবর্ষ দূরস্থিত আকাশে পর্যবেক্ষণ চালানো যায়। মাউন্ট প্যালোমারের দুই শত ইঞ্চির দূরবীন দ্বারা দুই শত কোটি আলোকবর্ষ অপেক্ষা দূরস্থ আকাশেও স্বচ্ছন্দে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। এখন পর্যন্ত এইটিই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

আলোক প্রতিসরণ করতে হলে আতস কাচের প্রয়োজন। কিন্তু বড় দূরবীনের উপযুক্ত বড় আতস কাচ প্রস্তুত করা এত কষ্টসাধ্য যে, প্রায় অসম্ভব। অত বড় এক খণ্ড কাচ ঢালাই করার সময়ে তার মধ্যে সামান্য একটুকুও বুদ্বুদ না থেকে পারে না, আর তাহলে সবই মাটি। কিন্তু দর্পণের কাচ ঢালাই কালে এ ধরণের সামান্য এক-আধটু গোলযোগে প্রতিফলনের ব্যাঘাত হয় না। কারণ আলোকরশ্মি কাচ ভেদ করে যায় না, কাচের উপরের তল থেকেই প্রতিফলিত হয়ে যায়। এ জন্যেই বড় দূরবীনে আলোকরশ্মি প্রতিফলনের প্রয়োজনে বড় দর্পণ নির্মাণ করা হয়। নির্দিষ্ট জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে অবতল দর্পণের ফোকাসে গিয়ে মিলিত হয়। সেখানে ফটোগ্রাফের প্লেট রেখে জ্যোতিষ্কের আলোকচিত্র নেয়া হয়। কিংবা ঐ ফোকাসে বা অন্য কোন যথাযোগ্য স্থানে কাচের প্রিজ্‌ম (Prism) রেখে আলোকরশ্মিকে সাত রঙের বর্ণালীতে বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়।

মাপ অনুযায়ী চক্রাকার এক খণ্ড পুরু কাচ ঢালাই করা হয়। এই কাচখণ্ডের এক পিঠ ঘষে ঘষে অবতল করা হয়। অবতলটিকে সাধারণত অধিবৃত্তের আকার (Paraboloidal) দেওয়া হয়, ক্ষেত্রবিশেষে আবার বৃত্তের আকারও (Spherical) দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় আকৃতি অনুসারে অবতল ক্ষেত্রটি এমন নিখুঁত হওয়া চাই যে, মাপজোকে বা মসৃণতায় কোথাও যেন এক চুলও ভুলভ্রান্তি বা উচু-নীচু না থাকে। এর পর কাচের এই অবতল ক্ষেত্রের উপর একটা পাত্‌লা ধাতব প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ প্রস্তুত করা হয়। ঐ ধাতু কোথাও কোথাও রৌপ্য, কিংবা সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার। অবতল গাত্রে অ্যালুমিনিয়াম আবরণটি এমন নিখুঁত মসৃণ হওয়া আবশ্যক যে, তার উপর আপতিত আলোকরশ্মি যেন সর্বাংশেই প্রতিফলিত হতে পারে। এই আবরণ ক্রমে অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে বলে কিছু কাল পর পর এটি উঠিয়ে ফেলে আবার নতুন করে ধাতব প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণটিকে নূতন করা হয়।

প্যালোমারের ২০০ ইঞ্চি দূরবীনটির জন্যে ২৭ ইঞ্চি পুরু ও প্রায় ১৭ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি চক্রাকার কাচখণ্ড ঢালাই করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল। ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে, নয়তো কোথাও ফেটে যেতে বা চিড় খেতে পারতো। তারপর তার অবতল ক্ষেত্রটি মাপজোক অনুসারে প্রস্তুত করতে এবং অ্যালুমিনিয়াম লাগিয়ে যথাযথভাবে স্থাপন করতে বহু কুশলী শিল্পী ও নিপুণ কর্মীর এক যোগে কুড়ি বছর অবিশ্রান্ত

কাজ করতে হয়েছিল। দূরবীনটির স্থাপনকার্যে যে ইঞ্জিনিয়ারিং চাতুর্যের সন্নিবেশ, তার তুলনা নেই। মাউণ্ট প্যালোমারের এই দুই শত ইঞ্চির দূরবীনটির চোঙের ভিতরেই পর্যবেক্ষকদের বসবার ব্যবস্থা আছে। যন্ত্রপাতি সমেত দূরবীনটি কয়েক শত টন ভারী কিন্তু এর ভারসাম্য এমন ভাবে রক্ষা করা হয়েছে যে, সামান্য একটু অঙ্গুলীস্পর্শেই যেদিকে যতটুকু ইচ্ছা সরানো যায়। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতকারীর নাম অনুসারে এটির নাম হেইল দূরবীন (Hale Telescope) (প্লেট নং-ঢ)।

আলো প্রতিসরণকারী দূরবীনে (Refractor) আতস কাচের এক পিঠে আলো প্রবেশ করে অন্য পিঠ দিয়ে বেরোয়—কাজেই দুই পিঠই মুক্ত রেখে শুধু কিনারাতে তাকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। তাতে আপন ওজনেই কাচটি বেঁকে যেতে পারে। আলো প্রতিফলনকারী দূরবীনে (Reflector) দর্পণের যে অবতল পিঠে আলো পড়ে সেখান থেকেই প্রতিফলিত হয়ে যায়, আলো কাচ ভেদ করে যায় না। কাজেই দূরবীন স্থাপনকালে দর্পণের অপর পিঠ নানা স্থানে ঠেস দিয়ে রাখা হয় যাতে কাচটি বেঁকে না যায়।

মানমন্দিরে দূরবীন যথাযথভাবে স্থাপনের কতকগুলি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্থাপন প্রণালীগুলি Polar Mounting, Altazimuth Mounting, Equatorial Mounting প্রভৃতি নামে আখ্যাত। মোটের উপর এ সকল বৃহৎ দূরবীন স্থাপনে এমন সকল যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করা হয় যেন দূরবীনটিকে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ যে কোন দিকে ইচ্ছামতো যতটুকু প্রয়োজন অনায়াসে সরানো ঘুরানো যায়। এই কারণে পৃথিবীর এক গোলার্ধের আকাশে যে কোন অঞ্চলে ঈপ্সিত জ্যোতিষ্কের দিকে এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

যে দূরবীন যত বড় তত স্বল্প পরিসর স্থানে তার দৃষ্টিক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। এ জন্যে সকল বড় দূরবীনের সঙ্গেই এক বা একাধিক ছোট দূরবীন ব্যবহৃত হয়। ছোটটি সন্ধানী দূরবীন। এটি দ্বারা আগে লক্ষ্য স্থির করার পর বড়টিকে সেই অভিমুখে ঘুরিয়ে নেয়া হয়।

অনেক সময় জ্যোতিষ্কের আলো এত ক্ষীণ থাকে যে, কয়েক ঘণ্টা ধরে তার রশ্মি ফটো-প্লেটের উপর না পড়লে ছবি তোলা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ঘণ্টাকয়েক পৃথিবী এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, জ্যোতিষ্কটিও না। এজন্যে জ্যোতিষ্কের সঙ্গে পৃথিবীর গতির সামঞ্জস্য বিধান করে ইলেকট্রিক

মোটরের সাহায্যে দূরবীনটিকে হিসেব মতো এমনভাবে চালানো হয় যে, ফটো-প্লেটের সামনে জ্যোতিষ্কটি একদম নিশ্চল অবস্থায় থাকে।

দূরবীনে নক্ষত্রের আলোকচিত্র উল্টো ভাবে ওঠে, অর্থাৎ নক্ষত্রের শীর্ষবিন্দু নিম্নে ও নিম্নবিন্দু শীর্ষে, এইরূপ ফটো ওঠে। এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আকাশ পর্যবেক্ষণে কোনও অসুবিধা নেই। দূরবীনে নক্ষত্র বা আকাশ দেখার চেয়ে তার ফটো নেয়াই অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। ফটো থাকলে তা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে নানাবিধ গবেষণাদি ও বিশ্লেষণাদি চালানো যায়। আবার পূর্বতন ফটোর সঙ্গে বর্তমানে গৃহীত ফটো তুলনা করে আকাশের জ্যোতিষ্কদের স্থান পরিবর্তন ও গতিবেগ প্রভৃতি পর্যালোচনা করা যায়।

উপরে দেখা গেল দূরবীনের দুটি দিক আছে। একটি আলোক গ্রহণের দিক অর্থাৎ লক্ষ্যকাচের দিক। আর একটি গৃহীত আলো-ব্যবহারের দিক অর্থাৎ অক্ষিকাচ বা ক্যামেরা সংযোগে আলোকচিত্র গ্রহণের দিক। দূরবীনের শক্তি বা কার্যকারিতা বাড়াবার জন্যে এ দুয়ের একটির বা উভয়েরই উৎকর্ষ বাড়িয়ে তা করা যেতে পারে। লক্ষ্যকাচের আয়তন বাড়িয়ে দূরবীনের কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়, যেমন ২০০ ইঞ্চির বদলে ৩০০ ইঞ্চির দূরবীন বানানো যায়। অথবা ক্যামেরা ও ফটো-প্লেটের কর্মক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে। গত ৫০।৬০ বছরে বিজ্ঞানীরা ফটো-প্লেটের আলোক গ্রহণ-প্রবণতা অন্তত শত গুন বাড়াতে পেরেছেন। এর ফলে বর্তমানের একটি ১০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে যে আলোকচিত্র গৃহীত হচ্ছে, ১৯০০ সনে তার জন্যে ১০০ ইঞ্চি দূরবীনের প্রয়োজন হতো। এই উন্নতির ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে চলেছেন।

প্লেট নং ক—চন্দ্রের উপরিভাগ পৃঃ ৩৩
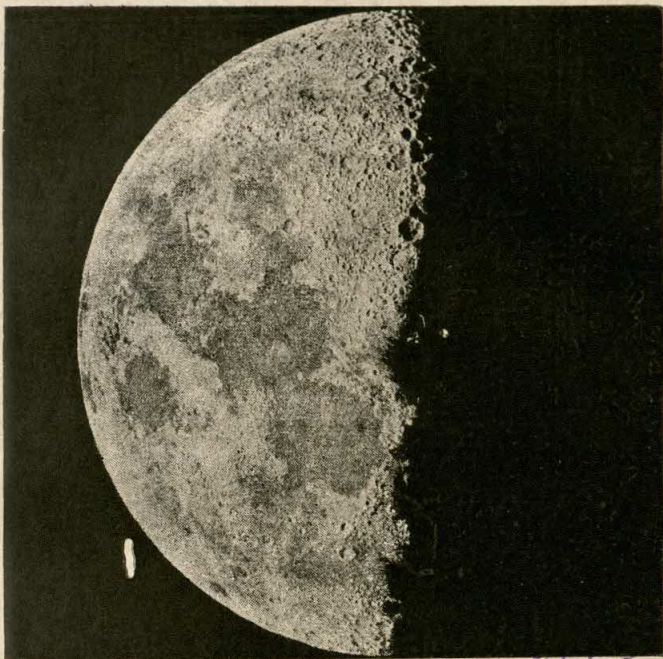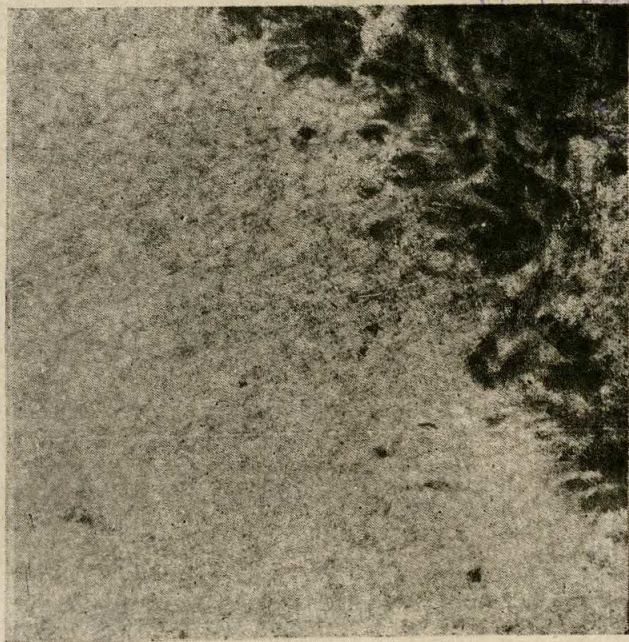
প্লেট নং খ—সূর্যের উপরিভাগ পৃঃ ৪৩

প্লেট নং ঘ—সৌরশিখা পৃঃ ৪৩
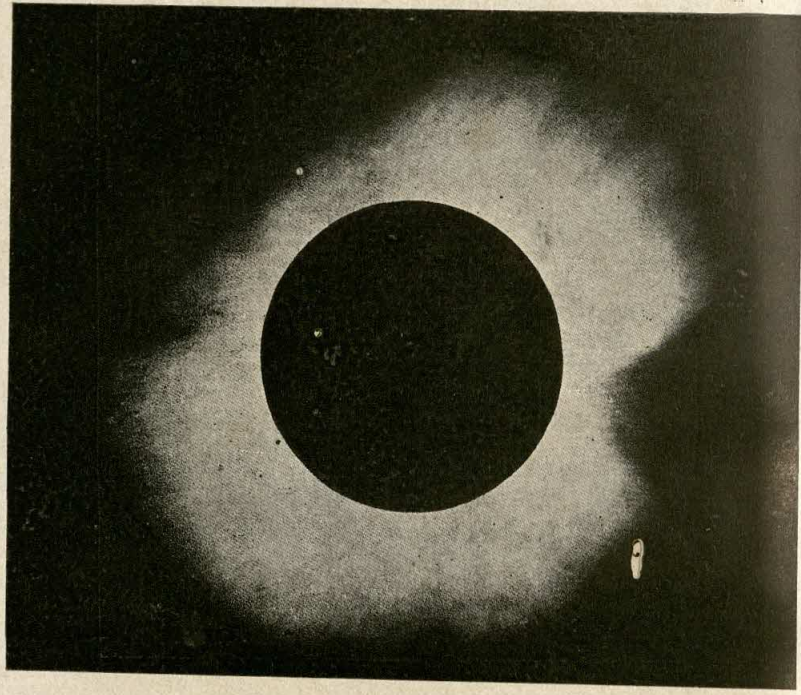
প্লেট নং গ—সূর্যের ছটামণ্ডল পৃঃ ৪৩
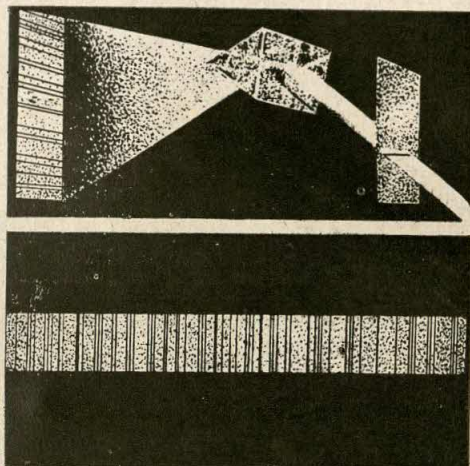
প্লেট নং ছ—উপরে—বর্ণালী   পৃঃ ৪৪, ১১৮
নীচে—ফ্রন্‌হফার রেখা

প্লেট নং চ—সৌরকলঙ্ক   পৃঃ ৪৪

প্লেট নং ছ—সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহ   পৃঃ ৪৯
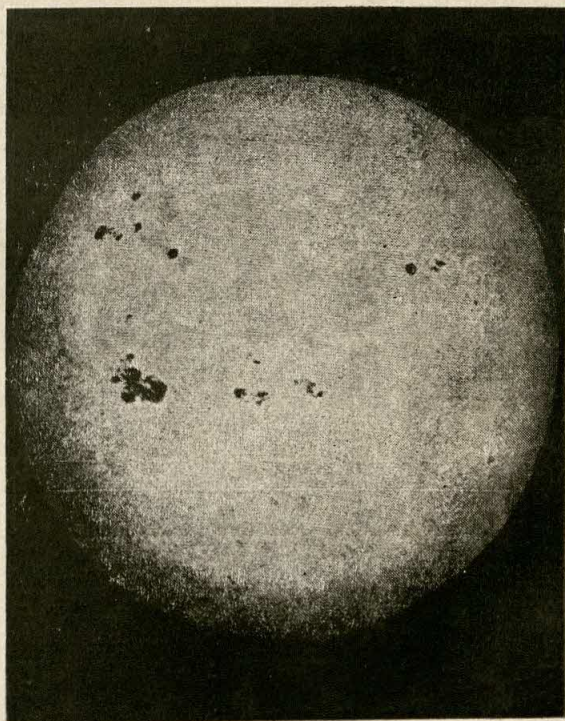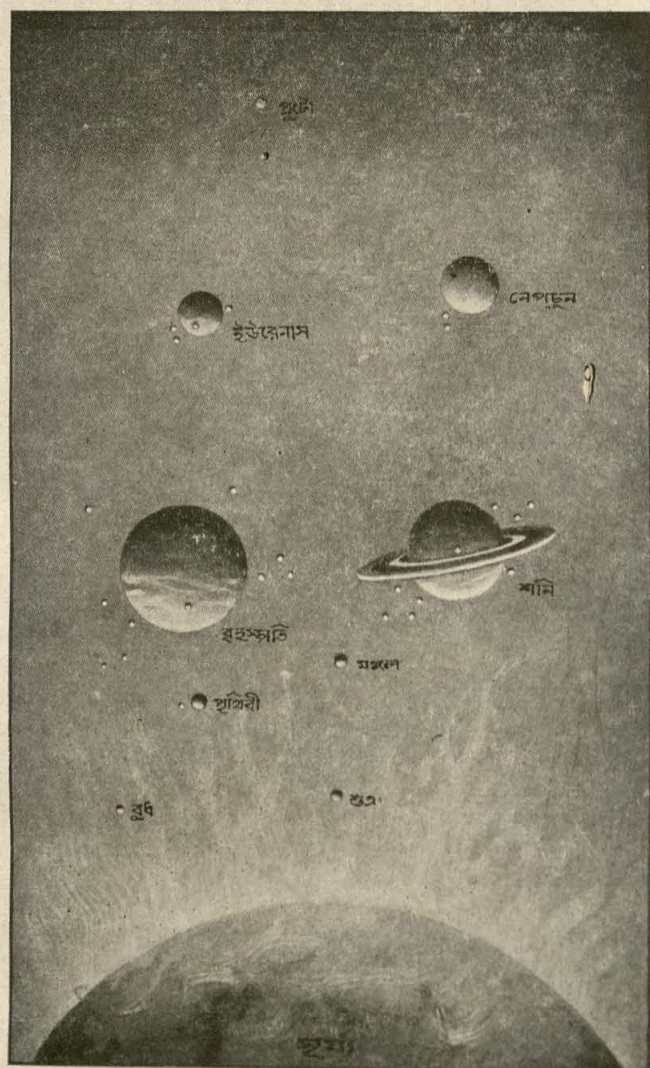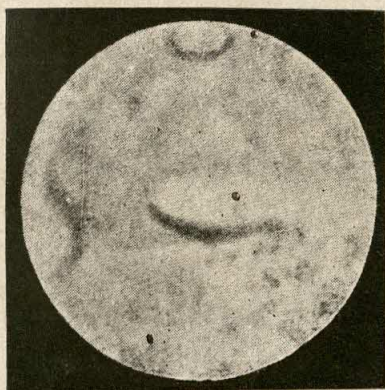
প্লেট নং জ—মঙ্গল গ্রহ পৃঃ ৫৮

প্লেট নং ঝ—বৃহস্পতি গ্রহ পৃঃ ৬৩

প্লেট নং ঞ — শনি গ্রহ   পৃঃ ৬৫

প্লেট নং ট — ধূমকেতু   পৃঃ ৬৮

প্লেট নং ঠ— ধূমকেতুর কক্ষ ও পুচ্ছ পৃঃ ৬৯
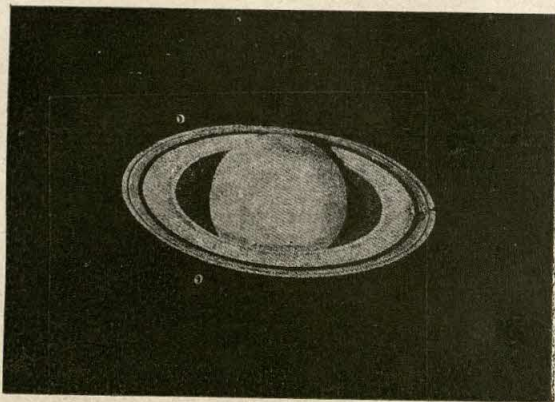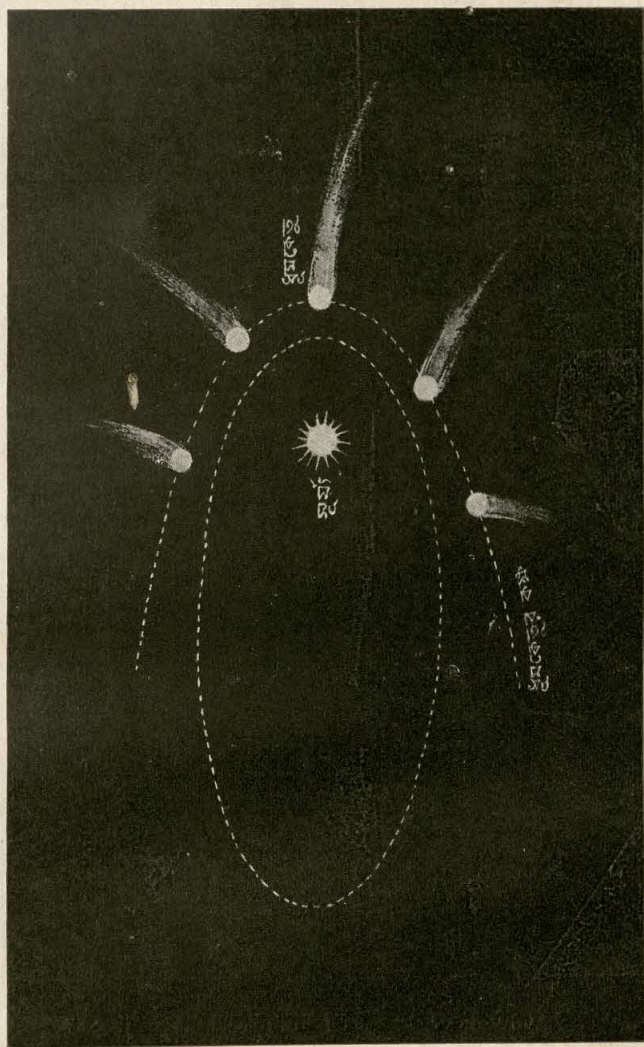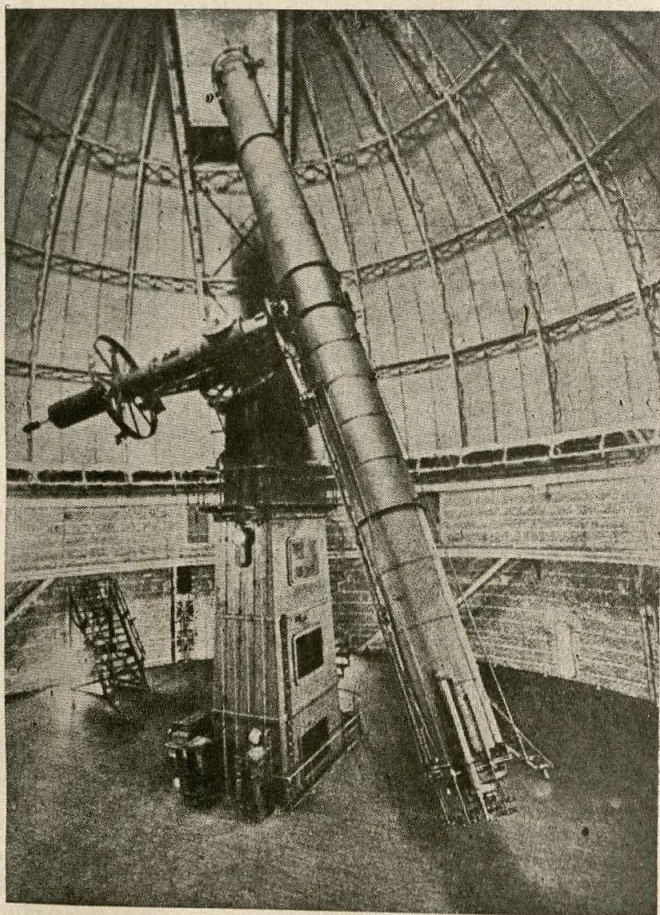
প্লেট নং ড — ইয়ের্কস মানমন্দিরের প্রতিসরিত আলোর ৪০ ইঞ্চি দূরবীন পৃঃ ১০৭
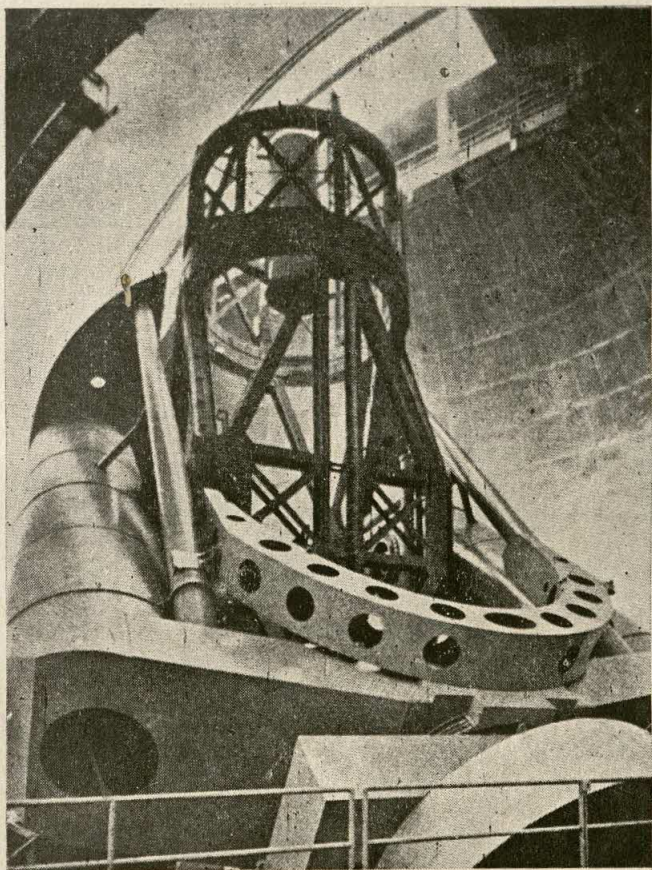
প্লেট নং ঢ— মাউণ্ট প্যালোমারের প্রতিফলিত আলোর ২০০ ইঞ্চি হেইল দূরবীন

পৃঃ ১১১

প্লেট নং ৭— কুণ্ডলী পাকানো নীহারিকা- পৃঃ ১২৪
কেন্দ্র থেকে বাহু আরম্ভ

প্লেট, নং ৮— কুণ্ডলী পাকানো নীহারিকা,—কেন্দ্রীয়
গ্যাসদণ্ড থেকে বাহু আরম্ভ পৃঃ ১২৪

প্লেট নং দ — বিশিষ্ট আকৃতিহীন নীহারিকা পৃঃ ১২৫

প্লেট নং থ — উপবৃত্তাকার নীহারিকা পৃঃ ১২৪
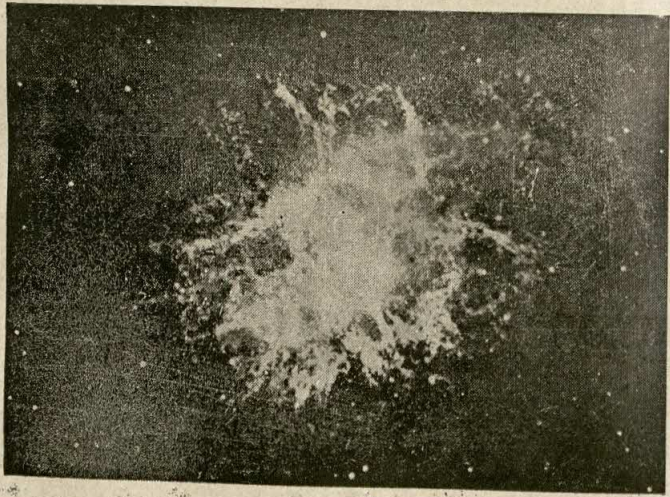
প্লেট নং ন—ক্র্যাব নীহারিকা পৃঃ ১২৫

প্লেট নং ধ—গ্রহরূপী নীহারিকা পৃঃ ১২৫

প্লেট নং প— অশ্বমুণ্ড নীহারিকা পৃঃ ১২৬

প্লেট নং ফ — ক্ষুদ্র মেগালানিক মেঘমালা পৃঃ ১২৭

প্লেট নং ভ—তারকাগুচ্ছ পৃঃ ১৪৭

প্লেট নং ব—অ্যাণ্ড্রোমেডা নীহারিকা পৃঃ ১২৭
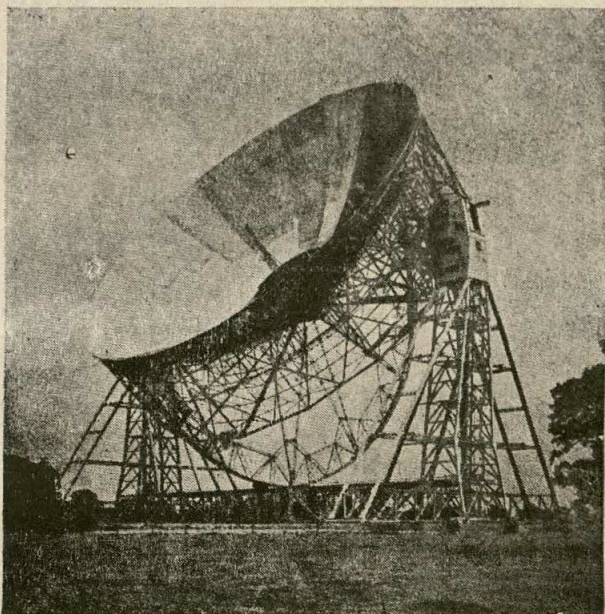
প্লেট নং ম—জোড্‌রেল ব্যাঙ্কের বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এর এরিয়েলের চক্রাকার মুখের ব্যাস ২৫০ ফুট

পৃঃ ১৭৪
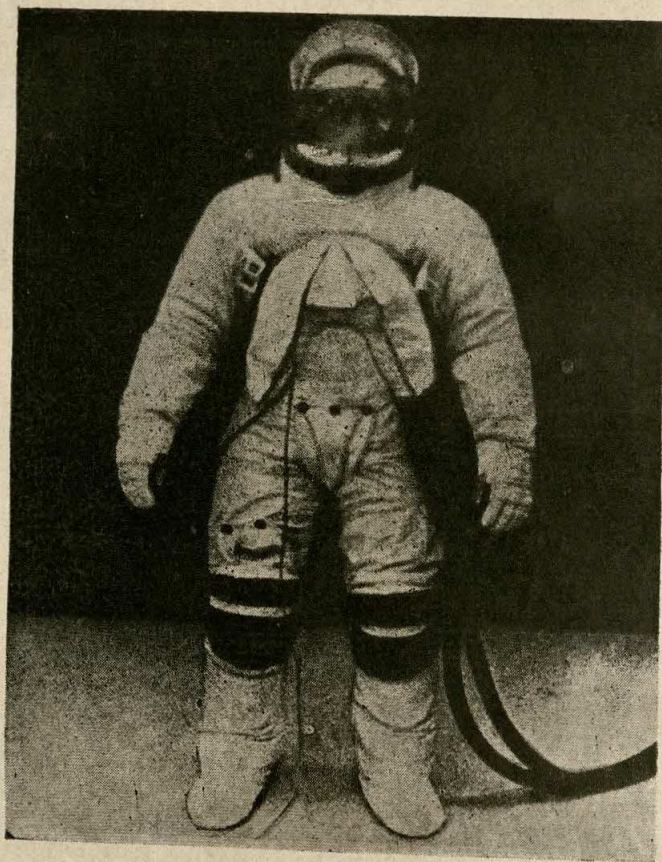
প্লেট নং য—মহাকাশযানের বহিরাকাশে
নভচারীদের ব্যবহার্য বায়ুচাপ সংরক্ষিত,
অক্‌সিজেন ভাণ্ডারাদিযুক্ত ও বিকিরণ প্রতিরোধী
স্বয়ংসম্পূর্ণ পোষাক পৃঃ ২০০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope)

বৃষ্টিপাতের সময়ে যদি রোদ ওঠে তাহলে সূর্যের বিপরীত দিকে আকাশে রামধনু দেখা যায়। তার মানে সূর্যালোক বৃষ্টির জলবিন্দুর ভিতর দিয়ে যাওয়ায় আলোকরশ্মির বিশ্লেষণ হলো এবং আকাশপটে সাতটি বর্ণ পাশাপাশি দেখা গেল। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বা স্পেক্ট্রোস্কোপ (Spectroscope) নামক যন্ত্রে আলোক রশ্মির বিশ্লেষণের জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিকোণ প্রিজ্‌ম্ (Prism) বা ত্রিশিরা কাচের এক পিঠে আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করা হলে এই কাচের অন্য পিঠ দিয়ে সেই রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়ে বের হয়। কোনও পর্দার উপর এই বিশ্লিষ্ট রশ্মি ফেললে দেখা যায় তাতে পর পর সাতটি বর্ণ গায়ে গায়ে লেগে আছে (চিত্র-৩৪)।
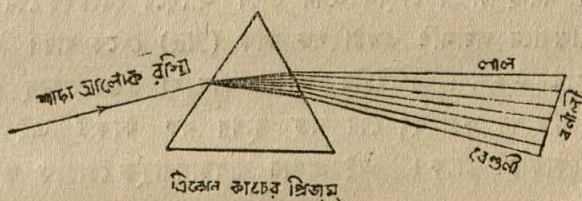
চিত্র-৩৪

ত্রিকোণ কাচের প্রিজ্‌ম্ ও বর্ণালী

রঙের আদ্যক্ষর নিয়ে ইংরেজীতে বর্ণগুলির পরিচয়জ্ঞাপক নামকরণ করা হয়েছে Vibgyor (ভিবজিওর); অর্থাৎ এই সাতটি রং হচ্ছে— বেগুনী (Violet), অতিনীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হল্‌দে (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। নিরবচ্ছিন্ন এই সপ্তবর্ণকে এক কথায় বলা হয় বর্ণালী (Spectrum), রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বর্ণলিপি। সাদা আলো থেকে এই সাত রঙের আলোক রশ্মি বেরিয়ে এসেছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে এই সাতটি রঙের আলোর মিশ্রণে সাদা আলোকরশ্মির সৃষ্টি।

বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope)

একটা কলিমেটর টিউব (Collimator Tube), কাচের একটা প্রিজ্‌ম্ (Prism) এবং একটি ক্ষুদ্র দূরবীন (View Telescope)—এই তিনের একত্র সংযোজনে একটি সাধারণ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বা স্পেক্ট্রোস্কোপ (চিত্র-৩৫) প্রস্তুত হয়। একটা ধাতব চোঙের এক মুখে দুইটি অর্ধ-

চিত্র-৩৫
বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (স্পেক্ট্রোস্কোপ)
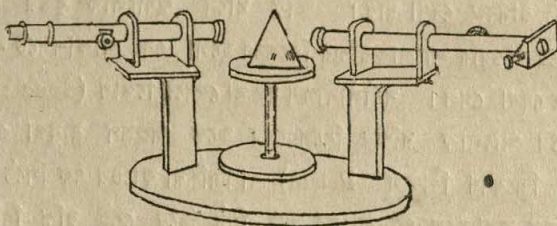
চন্দ্রাকার অনচ্ছ ধাতব ঢাক্‌নি এমন ভাবে লাগিয়ে নেয়া হয় যেন ঢাক্‌নি-দ্বয়ের মাঝখানে লম্বালম্বি একটা সরু ফাঁক (Slit) থেকে যায়। চোঙটির অপর মুখে একখানা বর্ণবিহীন আতস কাচ বা উত্তল লেন্‌স্ (Lens) এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন অন্য মুখের সরু ফাঁকটি এই আতস কাচের ফোকাসে থাকে। এই প্রকার ব্যবস্থাপনাযুক্ত চোঙকে কলিমেটর টিউব বলে।

চোঙের সরু ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো প্রবেশ করে। ফাঁকটি লেন্‌সের ফোকাসে অবস্থিত, এজন্যে আলো যখন অন্য মুখস্থিত ঐ লেন্‌সের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন তার রশ্মিসমূহ সমান্তরাল হয়ে যায়। সমান্তরাল রশ্মির সম্মুখে রাখা আছে একটি প্রিজ্‌ম্ অর্থাৎ ত্রিশিরা কাচ। প্রিজ্‌মের এক পিঠে আলোকরশ্মি পড়ে অন্য পিঠ দিয়ে বর্ণালীরূপে নির্গত হয়। প্রিজ্‌মের দুই পিঠে আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হয়। তাতেই সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালী সৃষ্টি করে এবং তার রশ্মিসমূহও সমান্তরাল থাকে।

বর্ণালীর সামনে স্থাপিত আছে একটি ছোট দূরবীন। দূরবীনের লক্ষ্য-কাচে আপতিত ঐ রশ্মিসমূহ তার ফোকাসে সেই সরু ফাঁকটির উজ্জ্বল

প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করে। একটি মাত্র রঙের আলো ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে থাকলে সেই রঙেরই একটি প্রতিচ্ছবি সৃষ্ট হবে, কিন্তু সাদা আলো প্রবেশ করে থাকলে তা বিশ্লিষ্ট হয়ে সাতটি রঙের প্রতিচ্ছবি গঠিত হবে অর্থাৎ প্রতি বর্ণের জন্যে এক একটি সরু ফাঁকের প্রতিচ্ছবি পর পর সাজানো ভাবে ফোকাসে পাওয়া যাবে। দূরবীনের অক্ষিকাচের সাহায্যে ঐ প্রতিচ্ছবি অনেক বড় দেখাবে। কিংবা অক্ষিকাচের স্থানে ফটোপ্লেট রেখে আলোক-চিত্র নেয়া যেতে পারে। এই ফটোতেই সাতটি রঙের বর্ণালী পাওয়া যায়। ফটোগ্রাফের প্লেট ডেভেলোপ (Develop) করে তা থেকে যে ছবি ওঠে সেটা অবশ্য সাদা-কালো রঙের ছবি। কিন্তু এই থেকেই বলা যায় বর্ণালীর সাত রং গায়ে গায়ে লেগে থেকেও কোন্‌টির বিস্তার কতদূর পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক* শক্তির রশ্মিসমূহ তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। তরঙ্গগুলি দৈর্ঘ্যে সমান নয়, কতকগুলি তরঙ্গ অতি দীর্ঘ এবং তারপর ক্রমান্বয়ে হ্রস্ব হতে হতে কতকগুলি তরঙ্গ কল্পনাতীত ক্ষুদ্র। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তরঙ্গগুলিকে কয়েকটি সীমায় ভাগ করে নিলে এক এক ভাগে এক এক প্রকার তেজের অবস্থান। এরই এক ভাগের নাম আলোকরশ্মি। তেজরশ্মি সমুদয় প্রত্যেকেই অদৃশ্য কিন্তু আলোকরশ্মি যে বস্তুর উপর প্রতিহত হয় সেই বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, সেইরূপ তাপরশ্মি যে বস্তুর উপর আপতিত হয় সেই বস্তু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাদা আলোককে আবার প্রিজ্‌মের সাহায্যে বিভক্ত করলে যে সাত ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার এক একটি ভাগে এক একটি রঙীন রশ্মির উৎপত্তি। এদের মধ্যে দীর্ঘতম তরঙ্গ লাল রশ্মির এবং হ্রস্বতম তরঙ্গ বেগুনীর। লালের তরঙ্গ অপেক্ষা অবলোহিত (Infra red) রশ্মির তরঙ্গ দীর্ঘতর। এ কারণে বর্ণালীতে যদি অবলোহিত দেখা যেত তাহলে তার অধিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যেত লালের আগে। অতিবেগুনীর (Ultraviolet) তরঙ্গ বেগুনীর তরঙ্গ অপেক্ষা ছোট, একারণে বেগুনী পার হয়ে অদৃশ্য অতিবেগুনীর অবস্থান।

উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাতির বা চুল্লীর ধাতব তার অথবা ঐ প্রকার উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকীর্ণ রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে গেলে রামধনুর মতো নিরবচ্ছিন্ন সাতটি রংই পাওয়া যায়, তবে বর্ণালীর সকল অংশ সমান উজ্জ্বল নাও হতে পারে। কোনও কঠিন ধাতব পদার্থকে

উত্তপ্ত করতে আরম্ভ করলে প্রথমে তার বিকীর্ণ তেজের সবটাই বর্ণালীর অবলোহিত দিকটায় চলে যাবে। তারপর পদার্থটি ক্রমশ অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে বর্ণালীর লাল, কমলা ও হল্‌দে রং ক্রমান্বয়ে একে একে বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর পর পদার্থটি হয়তো গলে তরল হবে,—নয়তো সবুজ, নীল, অতিনীল ও বেগুনীর অংশ একে একে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। সুতরাং তপ্ত পদার্থের বর্ণ দেখে ধারণা করা যায় পদার্থটির তাপমাত্রা কম না বেশী, বেশী হলেই বা কত বেশী। আকাশের নক্ষত্রদের আমরা উজ্জ্বল বিন্দুর মতো দেখতে পাই। ভাল করে লক্ষ্য করলে তাদের রংও দেখতে পাওয়া যায়। দূরবীন দিয়ে দেখলে রং আরও অনেক ভাল ভাবে বোঝা যায়। নক্ষত্রের রং লাল দেখা গেলে সন্দেহ থাকে না যে, নক্ষত্রটির পৃষ্ঠতাপ খুব বেশী নয়, হয়তো ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কিছু কম বা বেশী হবে। নক্ষত্রের রং হল্‌দেটে হলে বুঝতে হবে তার পৃষ্ঠতাপ সূর্যের মতো অর্থাৎ ৬০০০ ডিগ্রীর কাছাকাছি। সেইরূপ সাদা বা নীল রঙের নক্ষত্র দেখলে জানা যায় তাদের পৃষ্ঠতাপ সূর্যের চেয়ে ক্রমান্বয়ে আরও বেশী, হয়তো ১৫০০০ থেকে ২৫০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

উত্তপ্ত গ্যাসের বর্ণালী লক্ষ্য করলে কিন্তু ঐরূপ সাতটি রং পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট বর্ণের রেখা বর্ণালী-সীমানার মধ্যে খাড়াভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বুনসেন বার্ণারের (Bunsen Burner) শিখার মধ্যে একটু নুন ঢুকিয়ে রাখলে শিখার রং হল্‌দে হয়ে যায় এবং বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সহায়তায় তার যে বর্ণালী উৎপন্ন হয় তাতে দেখা যায় আলোকরশ্মি সমস্তই বর্ণালীর হল্‌দে সীমানার মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে এবং সেখানে পাশাপাশি দুটো হল্‌দে রেখা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যত্র অন্ধকার। হল্‌দে রেখাদ্বয় নুনের উপাদান সোডিয়াম নামক মৌল পদার্থের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। গ্যাস থেকে নিঃসৃত আলোর বর্ণালীতে যখনই ঐ একই স্থানে দুটো হল্‌দে রেখা দেখতে পাওয়া যায় তখনই আর সন্দেহ থাকে না যে, ঐ গ্যাসে সোডিয়াম আছে। এইরূপ উজ্জ্বল রেখাকে Emission Line বলে,—বাংলায় বিকিরণ রেখা বলা যেতে পারে। প্রতিটি মৌল পদার্থের গ্যাসের বর্ণালীতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঐ ধরণের বিশিষ্ট রেখা দেখা যায়। যে মৌল পদার্থের

রেখা বর্ণালীর যে অংশে অবস্থিত তার কখনও নড়চড় হয় না। সুতরাং বর্ণালীতে উজ্জ্বল রেখাসমূহের অবস্থান দেখে বলা যায় আলোকরশ্মি নিঃসরণকারী গ্যাসে কোন্ কোন্ মৌল পদার্থ বর্তমান।

নক্ষত্রদের পৃষ্ঠদেশে যে তাপমাত্রা তাতে তথাকার সকল পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে আছে। এ কারণে নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি মাত্রই গ্যাস থেকে উৎসারিত। অনেক নক্ষত্রের বর্ণালীতে উক্তরূপ বিকিরণ রেখা দেখা যায় এবং তা থেকে বলাও যায় সেই সব নক্ষত্রে কি কি মৌল পদার্থ আছে। কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রের বর্ণালীতে ঐ প্রকার বিকিরণ রেখা দেখা যায় না। তৎপরিবর্তে দেখা যায় নিরবচ্ছিন্ন সপ্তবর্ণ সমন্বিত বর্ণালীর মধ্যেই মৌলপদার্থের নির্দিষ্ট উজ্জ্বল বিকিরণ রেখার স্থান অধিকার করে আছে কৃষ্ণবর্ণ রেখাসমূহ। নক্ষত্রদের পৃষ্ঠের আবহমণ্ডলের উপরের দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল গ্যাসরাশির আবরণ আছে। উত্তপ্ত কোনও গ্যাসীয় আলো সেই গ্যাসেরই ঠাণ্ডা স্তর ভেদ করে আসার সময়ে শোষিত হয়ে যায়। যেমন উত্তপ্ত সোডিয়ামের আলোকরশ্মি অপেক্ষাকৃত শীতল সোডিয়াম গ্যাসের ভিতর দিয়ে এলে শোষিত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বর্ণালীতে সোডিয়ামের হল্‌দে রেখার স্থানে কালো রেখা দেখা যাবে। সুতরাং বর্ণালীতে হল্‌দের জায়গায় কালো রেখার অস্তিত্ব থেকেও বোঝা যায় নক্ষত্রে সোডিয়াম বর্তমান এবং তার আবহমণ্ডলেও সোডিয়াম আছে। উজ্জ্বল বর্ণালীতে দৃষ্ট ঐ কৃষ্ণবর্ণ রেখাকে Absorption Line বা বিশোষণ রেখা বলে। অতএব দেখা যাচ্ছে নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ রশ্মির বর্ণালী থেকে জানা যায় ঐ নক্ষত্রে কি কি মৌল পদার্থ আছে। অথবা বলা যায় নক্ষত্রটি কি কি উপাদানে গঠিত, বর্ণালী তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দিচ্ছে।

ফ্রনহফার রেখা (Fraunhofer Line)

সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এখানে কোন পদার্থই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না, সকলেই গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। সূর্যপৃষ্ঠের উর্ধ্বদিকে হাজার হাজার মাইলব্যাপী আবহমণ্ডল গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট। সূর্যরশ্মি এই আবহমণ্ডল ভেদ করে নির্গত হয়।

সূর্যপৃষ্ঠের উপরিভাগের নাম আলোকমণ্ডল (Photosphere)। আলোকমণ্ডল থেকে সূর্যালোক বেরিয়ে আসে। আলোকমণ্ডলের বহিরাবরণকে বিশোষণ মণ্ডল (Reversing Layer) বলা হয়। আলোকমণ্ডল অপেক্ষা বিশোষণ মণ্ডলের তাপমাত্রা কম। সূর্যরশ্মি যখন বিশোষণমণ্ডল ভেদ করে আসে তখন সেখানকার গ্যাসরাশি নিজ নিজ বর্ণালীর আলোক সূর্যরশ্মি থেকে শোষণ করে নেয়। সূর্যের বিশোষণমণ্ডলই শুধু নয়, পৃথিবীর শীতল আবহমণ্ডলের গ্যাসরাশিও তাদের আপন আপন বর্ণালোক সূর্যরশ্মি থেকে শোষণ করে নেয়। এ কারণে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যালোকের যে নিরবচ্ছিন্ন সপ্তবর্ণের বর্ণালী পাওয়া যায় তাতে থাকে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ রেখা বা ডোরা। এই সকল ডোরা বা কালো দাগকে ফ্রনহফার রেখা (Fraunhofer Line) বলে (প্লেট নং-৬।) বর্ণালীতে কালো রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়তা দৃষ্টে সূর্যের পৃষ্ঠতাপ ও গঠন-উপাদান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বর্ণালী পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, সূর্যের গঠন-উপাদানে আছে—হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন নাইট্রোজেন, সোনা, রূপা লোহা, নিকেল, সোডিয়াম ইত্যাদি যাবতীয় মৌল পদার্থ।

সব নক্ষত্রের বর্ণালী এক প্রকার নয়। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের বর্ণালীতে ঐ সকল কালোরেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়তায় পার্থক্য দেখা যায়।

বর্ণালী পরীক্ষায় স্বর্গীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। বর্ণালীঘটিত অনেক তথ্যের তিনি আবিষ্কর্তা। বর্ণালীতে কালো রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়তার সঙ্গে নক্ষত্রের তাপমাত্রার সম্পর্ক তিনিই আবিষ্কার করেন।

এ পর্যন্ত দেখা গেল, বর্ণালী দৃষ্টে নক্ষত্রের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা জানতে পারা যায়। নক্ষত্র কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত তাও জানতে পারা যায়। বর্ণালীর কার্যকারিতা শুধু এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্ণালী পরীক্ষা আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। কোন্ নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্ক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, কোন্টার দূরত্ব ক্রমে বাড়ছে, তাদের গতিবেগ কোন্ দিকে কত, নিকটস্থ ঘূর্ণ্যমান গ্রহাদির কোন্ পাশটা আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে, কোন্ পাশটা দূরে সরে যাচ্ছে এবং তার ঘূর্ণনের বেগ কত, এ সমস্তই বর্ণালীর সাহায্যে জানা যায়।

ডপ্‌লার তত্ত্ব (Doppler Effect)

রেল স্টেশনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কোন ট্রেন যদি বাঁশী বাজাতে বাজাতে এসে তার সামনে দিয়ে দূরে চলে যায় তাহলে আসবার সময়ে বাঁশীর আওয়াজকে তার অত্যন্ত তীব্র বা চড়া মনে হবে, ট্রেন স্টেশনে এসে থামলে বাঁশীর ধ্বনি স্বাভাবিক, আবার গাড়ী চলে যাওয়ার সময় বাঁশীর শব্দের তীব্রতা অনেক হ্রাস পাবে। এর কারণ আছে। আমরা জানি শব্দ মাত্রই বায়ুতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার বাঁশী বায়ুতে প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি তরঙ্গ সৃষ্টি করে, চলন্ত অবস্থায়ও তাই করে। কিন্তু আমাদের কানে প্রতি সেকেণ্ডে তার চেয়ে বেশী তরঙ্গ ঢুকবে, যদি গাড়ীটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আর কম সংখ্যক শব্দতরঙ্গ ঢুকবে যদি গাড়িটি দূরে চলে যেতে থাকে। কারণ আমাদের দিকে অগ্রসরমান গাড়ীর যে আওয়াজ তার শব্দতরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কিছুটা হ্রস্ব হয়ে যায় এবং অপস্রয়মান আওয়াজের শব্দতরঙ্গ কিছুটা দীর্ঘায়ত হয়। এরই ফলে গাড়ী এগোবার সময়ে তার বাঁশীর শব্দ তীব্র মনে হয়, দূরে সরে যাওয়ার সময়ে শব্দ অনেক খাদে নেমে যায়, গাড়ী স্টেশনে দাঁড়ালে বাঁশীর স্বাভাবিক আওয়াজ শোনা যায়। এইরূপ ব্যাপারকে ডপ্‌লার তত্ত্ব বা Doppler Effect বলা হয়।

আলোকও তরঙ্গ বিশেষ, তবে তা বায়ুতে নয়। আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভাবে ডপ্‌লার তত্ত্ব প্রযোজ্য। কোন নক্ষত্র আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার বর্ণালী বেগুনী আলোর দিকে কিছুটা সরে যাবে এবং কোনও নক্ষত্র যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তবে তার বর্ণালী লাল আলোর দিকে কিছুটা সরে আসবে। এইভাবে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন কোন্ নক্ষত্র কত বেগে কোন্ দিকে ধেয়ে চলেছে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গতিময় রূপটি সাধারণ মানুষের মানসপটে এঁকে দিতে সমর্থ হন।

সকল নক্ষত্রই আপন আপন মেরুদণ্ড অবলম্বনে আবর্তনশীল। এই ঘূর্ণনের প্রমাণ পাওয়া যায় তার বর্ণালীতে। বর্ণালীতে যে সকল আড়াআড়ি রেখা বা ডোরা দেখা যায় সেগুলি সরু কিন্তু নক্ষত্রের আবর্তনের ফলে সেই ডোরাগুলি কিছুটা চওড়া হয়ে যায়। যে নক্ষত্র যত দ্রুত আবর্তন করে তার

ডোরা তত প্রশস্ত হয়। ১৯৩০ সনে ইয়ের্কস্ মানমন্দিরের অটো স্ট্রুভ (Otto Struve) এবং সি, টি, এলভি (C. T. Elvey) নামক দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী বর্ণালী রেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে সর্বপ্রথম একক নক্ষত্রের আবর্তন সম্বন্ধে এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন।

দূরস্থিত নক্ষত্রের আবর্তনের বেলায় বর্ণালীর ডোরা প্রশস্ত দেখালেও নিকটস্থ জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ গ্রহদের আবর্তনের ক্ষেত্রে বর্ণালীতে রেখা বা ডোরার অবস্থিতি কিছুটা হেলানোভাবে দৃশ্যমান হয়। গ্রহের উপর থেকে সূর্যরশ্মিই প্রতিফলিত হয়ে আসে, তাই তাদের বর্ণালী প্রকৃতপক্ষে সূর্যের বর্ণালীরই ম্লান সংস্করণ। কিন্তু সূর্যরশ্মি যে সকল গ্রহের আবহমণ্ডল ভেদ করে তাদের গাত্র স্পর্শ করে আবার বেরিয়ে আসে সেই আবহমণ্ডলের তথা গ্রহের গঠন উপাদান ঐ রশ্মির বর্ণালীতে ধরা পড়ে এবং তাদের আবর্তনের স্বাক্ষরও বর্ণালীতে সুস্পষ্ট হয়। ইউরেনাস ও নেপচুনের বর্ণালীতে তাদের আবর্তন সুপরিস্ফুট। আবর্তনের ফলে কোন্ পাশটা দূরে সরে যাচ্ছে, কোন্ পাশটা আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে এবং ঐ ঘূর্ণনের গতিবেগ কত, বর্ণালী পরীক্ষায় তা জানা যায়।

ধরা যাক (চিত্র-৩৬) চিত্রের বাঁ দিকের গ্রহ বা জ্যোতিষ্কটি মেরুদণ্ড অবলম্বনে আবর্তন করছে। তার বিষুববৃত্ত কাগজের সমতলে অবস্থিত।
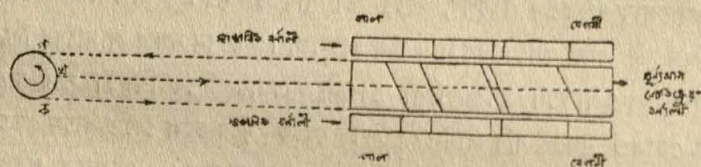
চিত্র-৩৬

ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্ক ও তার বর্ণালী

তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে জ্যোতিষ্কটি কোন্ দিকে ঘুরছে। এখানে ক চিহ্ন দর্শকের দিকে এগিয়ে আসছে, খ চিহ্ন দর্শকের দৃষ্টির সামনে আড়াআড়ি ভাবে যাচ্ছে, আর গ চিহ্নটি দূরে সরে যাচ্ছে। দূরবীনের ফোকাসে

যদি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র যথাযথভাবে স্থাপন করা হয় তাহলে জ্যোতিষ্কের বর্ণালী রেখা অর্থাৎ ডোরা পাওয়া যাবে। দেখা যাবে ক বিন্দু বেগুনীর দিকে সরে গেছে, খ যথাস্থানেই আছে এবং গ লালের দিকে এগিয়ে গেছে। বর্ণালীর রেখাগুলি চিত্রের ন্যায় কিছুটা হেলে রয়েছে। এই হেলানোর কোণ কত ডিগ্রী তা মেপে নিয়ে ঐ জ্যোতিষ্কের বিষুববৃত্তের আবর্তন বেগ হিসেব করে নেয়া যায়।

সুদূরের দ্বীপজগৎসমূহের ভ্রমণ বেগ ও তাদের আবর্তন বেগ বর্ণালী বিশ্লেষণ করেই বের করা হয়। এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় আকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীর পক্ষে অপরিহার্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

ছায়াপথ ও নীহারিকা

মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র একটি কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে, যেন তারা এক পরিবারভুক্ত। এর পরে যে কোন দিকেই যাওয়া যাক বহুদূর পর্যন্ত সব ফাঁকা। কিন্তু কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে আবার ঠিক ঐ রকমের আর একটি নক্ষত্রলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডে এই ধরণের অসংখ্য নক্ষত্রলোকের অবস্থান। এই সব নক্ষত্রলোককে গ্যালাক্সী (Galaxy) বা Island Universe অর্থাৎ বিশ্ব বা দ্বীপজগৎ বলা হয়। আমাদের সৌরপরিবার যে বিশ্ব বা দ্বীপজগতের অন্তর্গত তার নাম দেওয়া হয়েছে ছায়াপথ, ইংরেজীতে বলে মিল্‌কিওয়ে (Milky Way)। অনেক সময়ে মিল্‌কিওয়ের পরিবর্তে শুধু গ্যালাক্সী বলেই ছায়াপথের পরিচয় দেওয়া হয়।

অন্ধকার রাত্রে দেখা যায়, একটি আলোকপথ পৃথিবীর আকাশকে দ্বিখণ্ডিত করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে গেছে—সুমেরু অঞ্চল থেকে কুমেরু অঞ্চল পর্যন্ত। পুরাণে এই জ্যোতির্ময় বলয়টিকে কেউ বলেছে আকাশ-গঙ্গা বা বৈতরণী নদী, আবার কেউ বলেছে এই পথ দিয়ে দেবকন্যারা আকাশ-গঙ্গায় যেতেন জল আনতে। এই উজ্জ্বল আলোক পথটিকে আমরা ছায়াপথ বলি, যদিও ছায়াপথ বলতে সমগ্র দ্বীপজগৎটিকেই বুঝায়। জ্যোতির্ময় আকাশ-বলয়টি ছায়াপথ বিশ্বেরই একটি প্রান্তিক অংশ মাত্র।

দ্বীপজগৎগুলির আবির্ভাব হলো কি অবস্থায়, তার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন আগে নক্ষত্র তারপর দ্বীপজগতের সৃষ্টি হয়েছিল—এমনটি হতে পারে না। জীন্‌সের মতে ব্রহ্মাণ্ড জোড়া গ্যাসরাশি আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ফলে প্রথমে অসংখ্য বিশালায়তন স্তূপে বিভক্ত হয়ে দ্বীপজগৎগুলি সৃষ্ট হয়। তারপর প্রতিটি স্তূপ আবার বিভক্ত হয়ে ঘনীভূত হলে এক একটি দ্বীপজগতে কোটি কোটি নক্ষত্রের উদ্ভব হয়েছে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল এই অভিমতই সমর্থন করেন। আবার অনেক বিজ্ঞানী নক্ষত্র সৃষ্টির পর দ্বীপজগতের বিভাগ সমর্থন করেন। আগে

হাঁস, নাকি আগে ডিম—এ প্রশ্নের যেমন মীমাংসা নেই, আগে নক্ষত্র, কি আগে দ্বীপজগৎ তারও মীমাংসা এক্ষণে আর সম্ভবপর নয়।

দ্বীপজগৎগুলি কি? এরা কি নীহারিকা? ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের নাম নীহার। নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে হাল্‌কা তুলা বা ধূমসদৃশ যে মেঘপুঞ্জ অচঞ্চল নীহারের ন্যায় দেখায় তাকে নীহারিকা বলে। যাদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর তারা কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জে একটি উজ্জ্বল মেঘলোক দেখতে পান। উজ্জ্বল হোক বা নিষ্প্রভ হোক এই ধরণের মেঘলোককেই নীহারিকা আখ্যা দেওয়া হয়। খালি চোখে বা বাইনোকিউলারের সাহায্যে এমন আরও নীহারিকা দেখা যায়। দূরবীনের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে আরও বহু উজ্জ্বল মেঘলোক দৃষ্টিপথে আসে। এগুলিকেও আমরা নীহারিকাই বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দূরস্থ এসব নীহারিকা নক্ষত্র সমাকীর্ণ এক একটি দ্বীপজগৎ। কোটি কোটি নক্ষত্রের দ্যুতি দ্বীপজগতের হাল্‌কা মেঘরাশি ভেদ করে আসে বলেই দূরবীনে নক্ষত্রদের পৃথক সত্তা ধরা পড়ে না, সর্বসমেত একটি উজ্জ্বল মেঘপুঞ্জের মতো দেখায়। এই সকল দ্বীপজগতের কোথাও যদি কোন বুদ্ধিমান অধিবাসী থাকে এবং তাদেরও যদি আমাদের সমান শক্তিসম্পন্ন দূরবীন থাকে তাহলে তারাও আমাদের এই ছায়াপথ বিশ্বটিকে উজ্জ্বল মেঘপুঞ্জের ন্যায় একটি নীহারিকা রূপেই দেখবে।

সুদূরের ঐ নীহারিকাগুলিকে দূরবীনে যেমন দেখায় অপেক্ষাকৃত নিকটের নীহারিকাগুলিকেও খালি চোখে বা বাইনোকিউলারে তেমনি দেখায়, কিন্তু এ দুয়ে মস্ত প্রভেদ। দূরবীনের নীহারিকা লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরস্থিত দ্বীপজগৎ, সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রের সমারোহ। খালি চোখে দৃশ্যমান নীহারিকা আমাদের এই ছায়াপথ দ্বীপজগতেই অবস্থিত,—নক্ষত্র সৃষ্টির পর উদ্বৃত্ত গ্যাসরাশির মেঘপুঞ্জ, যদিও এদের অনেকে এখনও আরও নক্ষত্রের জন্ম দিতে পারবে। দৃশ্যত একই প্রকার বলে শ্রেণীবিভাগ কালে উভয়কেই নীহারিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

দুই পিঠ উঁচু একখানা আতস কাচ (Convex Lens) চোখের দৃষ্টিরেখার সমতলে রেখে দেখলে মনে হয় যেন একটা স্থূল সরলরেখার মধ্যস্থল উপরে-নীচে স্ফীত হয়ে উঠেছে। দূরবীনে যে সব নীহারিকার ফটো পাশ থেকে ঐ অবস্থায় নেয়া সম্ভব হয়েছে তাদের মধ্যভাগ ঐ প্রকার স্ফীত দেখায়। কিন্তু অধিকাংশ নীহারিকাই আমাদের দৃষ্টিরেখার সমতলে নেই, অল্পবিস্তর

হেলানো অবস্থায় আছে। কোন নীহারিকাকে বৃত্তাকার, কোনটাকে ডিম্বের ন্যায় উপবৃত্তাকার, কোনটা উজ্জ্বল, কোনটা অনুজ্জ্বল, কোনটায় কম্বুরেখা আছে, কোনটায় তা নেই, আবার কোন কোন নীহারিকার কোনই বিশিষ্ট আকৃতি নেই। নীহারিকাদের মধ্যে নীলাভ উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্থিতি বা অস্থিতি দেখে বোঝা যায় ঐ নীহারিকায় কি পরিমাণ গ্যাস আছে এবং নীহারিকাটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

নীহারিকারূপী দ্বীপজগৎ প্রধানত তিন প্রকারের—

(১) কুণ্ডলী পাকানো বা সর্পিল নীহারিকা (Spiral Nebulae), (২) ডিম্বসদৃশ উপবৃত্তাকার নীহারিকা (Elliptical Nebulae or Ellipsoid), এবং (৩) বিশিষ্ট আকৃতিহীন নীহারিকা (Irregular Nebulae)।

১। কতকগুলি নীহারিকা উজ্জ্বল এবং এদের প্রান্তের দিকে কম্বুরেখার মতো কুণ্ডলিত গ্যাসবাহু দেখা যায়। এদের নাম দেওয়া হয়েছে কুণ্ডলী পাকানো বা সর্পিল নীহারিকা (Spiral Nebulae)। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অসংখ্য দীপ্তিশালী নক্ষত্র আছে কিন্তু সেই নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে কোন গ্যাস নেই। কেন্দ্রীয় অঞ্চল পার হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে সর্পিল বাহুর আরম্ভ। এই সর্পিল বাহু প্রধানত গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট। এই অংশে কিছু কিছু নক্ষত্র দেখা যায় এবং তাদের বয়স কেন্দ্রীয় নক্ষত্র অপেক্ষা কম। সর্পিল বাহুতে এখনও নক্ষত্রের সৃষ্টি চলেছে। এ নীহারিকাগুলি মধ্যবয়সী।

কুণ্ডলী পাকানো নীহারিকার অনেক প্রকারভেদ আছে। কেন্দ্র ও বাহু সকলের এক প্রকার নয়। এদের অনেকেরই কেন্দ্র থেকে গ্যাসবাহু প্রসারিত হয়েছে (প্লেট নং-ণ)। আবার এই জাতীয় কোন কোন নীহারিকার কেন্দ্র যষ্ঠিদণ্ড আকারের ও তার দুই প্রান্ত থেকে কুণ্ডলাকৃতি গ্যাসবাহুর বিস্তার (প্লেট নং-ত)।

২। অনেক নীহারিকা আকৃতিতে ডিমের ন্যায় দীর্ঘবৃত্তাণ্ড (Ellipsoid)। এদের উপবৃত্তাকার নীহারিকা (Elliptical Nebulae) নাম দেওয়া হয়েছে। এরা বহু নক্ষত্রের সমাবেশে উজ্জ্বল। এদের প্রান্তে যেমন গ্যাসবাহু নেই, নক্ষত্রসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানেও তেমনি কোন গ্যাসের অস্তিত্ব দেখা যায় না। নক্ষত্র সৃষ্টিতে এ সকল নীহারিকার সব গ্যাস ব্যয় হয়ে গেছে। এ নীহারিকা-গুলি বৃদ্ধ, এদের মধ্যে আর কোনও নক্ষত্র জন্ম নেবে না (প্লেট নং-থ)।

৩। আবার অন্য কতকগুলি নীহারিকার কোন বিশিষ্ট আকৃতি নেই। এরা প্রায় নিষ্প্রভ। এদের সর্বাংশে আছে গ্যাসের প্রাচুর্য এবং এদের কোনও গ্যাসবাহুও দেখা যায় না। এরা অল্পবয়সী নীহারিকা, ভবিষ্যতে বহু নক্ষত্রের জন্ম দেবে অনুমান করা হয় (প্লেট নং-দ)।

এ তো গেল ছায়াপথ বিশ্বের বহির্ভূত তিন শ্রেণীর নীহারিকার কথা, যারা শুধু দৃশ্যতই নীহারিকা, প্রকৃতপক্ষে দ্বীপজগৎ। এবার আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের নীহারিকাগুলির কথায় আসা যাক। এ সকল নীহারিকার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। জ্যোতির্বিদ্‌গণ আমাদের আকাশ পর্যবেক্ষণে বহু সংখ্যক বর্তুলাকার নীহারিকার সন্ধান পেয়েছেন। এদের কেন্দ্রে আছে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, তার দীপ্তিতেই মেঘময় সমগ্র বর্তুলটি সমুজ্জ্বল। এগুলিকে গ্রহরূপী নীহারিকা (Planetary বা Ring Nebulae) বলা হয় (প্লেট নং-ধ)। এক একটি বর্তুলের ব্যাস সত্তর হাজার মাইলের কাছাকাছি, ওজন প্রভৃতিতে প্রায় সূর্যের সমান। লাইরা নক্ষত্রপুঞ্জে এই রকম একটি গ্রহরূপী নীহারিকা আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন নক্ষত্রের নবতারায় (Novae) বিবর্তনের ফলে এ জাতীয় নীহারিকার উৎপত্তি হতে পারে।

বৃষ রাশির সন্নিকটে ত্রিশ লক্ষ কোটি মাইল ব্যাসবিশিষ্ট গ্যাসপুঞ্জের এক সুবৃহৎ উজ্জ্বল মেঘমালা আছে—তার নাম ক্র্যাব নীহারিকা (Crab Nebulae)। এর কোনও বিশিষ্ট আকৃতি নেই (প্লেট নং-ন)। চীন দেশের পুঁথিতে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে একটি নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের বিবরণ পাওয়া যায়। আকাশে তার স্থান নির্দেশও করা আছে। ক্র্যাব নীহারিকাটি ঠিক সেই স্থানেই অবস্থিত। কোনও নক্ষত্রের অমিততেজী নবতারায় (Super novae) রূপান্তর গ্রহণকালে যেরূপ বিস্ফোরণ ঘটে ক্র্যাব নীহারিকা যে তেমনই কোন এক নাক্ষত্রিক বিপর্যয় থেকে উৎপন্ন তাতে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ নেই।

ছায়াপথ দ্বীপজগতের অভ্যন্তরে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে যে গ্যাস ও ধূলিমিশ্রিত মেঘপুঞ্জ আছে, নিকটস্থ নক্ষত্রদের দীপ্তিতে তারা অতি সুন্দর উজ্জ্বল নীহারিকার রূপ নেয়। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জে এই প্রকার একটি নীহারিকার অধিষ্ঠান আছে। আবার অনচ্ছ ও ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন কতকগুলি নীহারিকা আছে যাদের পিছনের নক্ষত্রগুলি সর্বদাই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

আলোকোদ্ভাসিত অঞ্চলের সামনেই এই নীহারিকাগুলি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আকাশে বিরাজমান। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণকায় অশ্ব-মুণ্ড নীহারিকাটি (Horse-head Nebulae) এরূপ একটি দৃষ্টান্ত (প্লেট নং-প)। আকাশবলয়ে ধনু রাশির সন্নিকটে এই প্রকার তমসাময় নীহারিকার অবস্থানের দরুণ ছায়াপথ বিশ্বটির কেন্দ্রীয় অঞ্চল সব সময়েই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। সমুদ্রবিহারী নাবিকগণ আকাশবলয়ের এরূপ দুটি কৃষ্ণকায় নীহারিকাকে কয়লার বস্তা (Coal Sack) নামে আখ্যাত করেছেন।

মহাকাশ প্রায় শূন্য। তারই মাঝে মাঝে বহু দূরে দূরে ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের মতো কোটি কোটি নক্ষত্রসমন্বিত এক একটি নীহারিকা জ্যোতির্ময় দ্বীপের ন্যায় ভাসমান। দৃশ্যত নীহারিকা হলেও গ্যালাক্সী বা বিশ্ব বা দ্বীপ-জগৎই এদের সার্থক নাম। মহাকাশ ভ্রমণ করলে কোথাও সঙ্গীহীন একক একটি নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যাবে না। প্রতি নক্ষত্রই কোনও বিশেষ দ্বীপ-জগতের অধিবাসী।

চক্রাকার কাচখণ্ডের দুই পিঠই কূর্মপৃষ্ঠের মতো উত্তল হলে যেমন দেখায় ছায়াপথ দ্বীপজগৎটির আকৃতিও প্রায় তদনুরূপ। এর এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্ত এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে কিন্তু কেন্দ্রস্থলে বেধ মাত্র প্রায় কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ। এর বিষুব প্রান্তে সর্পিল গ্যাসবাহু থাকায় একে কুণ্ডলী পাকানো নীহারিকা (Spiral Nebulae) শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অক্ষের চারদিকে বিশ্বটি আবর্তন করছে। কিন্তু তারই ফলে এর বহিঃ-প্রান্তের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ড সময়ে কয়েক শত কিলোমিটার। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন সম্ভবত এই আবর্তনের জন্যে ছায়াপথ বিশ্বটি চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে অক্ষের দিকে বেধ কমে গেছে। বিশ্বটির এই প্রধান অবয়বের বাইরে চতুর্দিকে একটি হ্যালো (Halo) বা উজ্জ্বল-মণ্ডল আছে, পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের মতো। এই মণ্ডলে বা বেষ্টকে আবার বহু নক্ষত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বেষ্টকের সহযোগে বিশ্বটির ব্যাসের পরিমাপ দুই লক্ষাধিক আলোকবর্ষ।

গ্রহের যেমন উপগ্রহ আছে কোন কোন দ্বীপজগতেরও তেমনি উপজগৎ আছে। তারা সংশ্লিষ্ট দ্বীপজগতের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের ছায়াপথ বিশ্বটির দুটি উপজগৎ আছে। তাদের নাম

মেগালানিক মেঘমালা (Megallanic Clouds)। ভূপৃষ্ঠের দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে তারা দৃশ্যমান। পর্তুগীজ নাবিক মেগালান ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সমুদ্রে পরিভ্রমণ কালে এদের সন্ধান পান। তাঁর নাম অনুসারেই এদের নামকরণ হয়েছে। ছায়াপথ দ্বীপজগতের ছিন্ন অংশরূপে এদের দেখা যায়। পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে, এরাও বহু নক্ষত্র সমাবেশে এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপজগৎ কিন্তু স্বাধীন নয়,—ছায়াপথ বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (প্লেট নং-ফ)। ব্রহ্মাণ্ডের দ্বীপজগৎসমূহের দূরত্ব নির্ণয়ে মেগালানিক মেঘমালা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশেষ সহায় হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যে সব নক্ষত্রের প্রভা বাড়ে কমে তাদের স্পন্দনশীল নক্ষত্র বলা হয়। সিফিউস তারকাগুচ্ছে ডেল্টা সেফাই নক্ষত্রটির প্রভার পরিবর্তনের ন্যায় যে সব নক্ষত্রের প্রভার সময়ানুগ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাদের Cepheid Variables বা সিফাইয়ের মতো স্পন্দনশীল নক্ষত্র বলা হয়। মেগালানিক মেঘমালায় এই প্রকারের কতকগুলি স্পন্দনশীল তারা আছে। বিভিন্ন সময়ে প্রভার হ্রাসবৃদ্ধি বিচারপূর্বক এদের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। আবার এদের সঙ্গে তুলনা করে আরও অনেক দ্বীপজগতের দূরত্বও জানা গেছে। মেগালানিক মেঘমালা থেকে আমাদের দূরত্ব এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আলোকবর্ষ। দ্বীপজগৎগুলির মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী অ্যাণ্ড্রোমেডা গ্যালাক্সী (Andromeda Galaxy) থেকে আমাদের দূরত্ব চৌদ্দ লক্ষ আলোকবর্ষ।

আমাদের আকাশে আমরা যে সব নক্ষত্রদের দল বেঁধে থাকতে দেখি তাদের বলি নক্ষত্রপুঞ্জ, তারকাগুচ্ছ, এইসব। মহাশূন্যে দ্বীপজগৎগুলিও সেইরূপ দল বেঁধে এক একটা দ্বীপপুঞ্জ রচনা করে আছে। ছায়াপথ বিশ্বটিও ঐরূপ একটি দ্বীপপুঞ্জের একটি সাধারণ সদস্য। এই পুঞ্জে মোট সতেরোটি দ্বীপজগৎ আছে। এদের একে অন্যের মধ্যে দূরত্ব লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ হলেও মহাকর্ষের অমোঘ যোগসূত্রে এরা একত্র সন্নিবদ্ধ। অ্যাণ্ড্রোমেডা দ্বীপজগৎ এই দ্বীপপুঞ্জেরই অপর এক সদস্য,—আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের নিকটতম প্রতিবেশী (প্লেট নং-ব)।

মেগালানিক মেঘমালাদ্বয় যুগল নক্ষত্রের মতো পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ছায়াপথ দ্বীপজগতের চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। অ্যাণ্ড্রো-মেডারও এই রকম দুটি উপজগৎ আছে। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রসমন্বিত এই

উপজগৎদ্বয় দুই ঝাঁক মৌমাছির মতো অ্যাণ্ড্রোমেডাকে প্রদক্ষিণ করছে। ছায়াপথ ও অ্যাণ্ড্রোমেডা ছাড়া এই দ্বীপপুঞ্জের অপর দ্বীপগুলির কারও কোনও উপজগৎ আছে কিনা এখনও জানা যায় নি।

ছায়াপথ দ্বীপজগতের ব্যাস এক লক্ষ আলোকবর্ষ। এর কেন্দ্র থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষের ব্যবধান রেখে সূর্য ঐ কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এভাবে একবার ঘুরে আসতে সূর্যের কুড়ি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়। এই পথ পরিক্রমায় সূর্যকে প্রতি সেকেণ্ডে আপন কক্ষপথে দুই শত ষোল (২১৬) কিলোমিটার অথবা ১৩৪ মাইল অগ্রসর হতে হয়। মেরুদণ্ড অবলম্বনে সূর্য একবার আবর্তন করে ছাব্বিশ দিনে। ভাষান্তরে বলা যায়, পৃথিবীর ছাব্বিশ দিনে সূর্যের একদিন, পৃথিবীর কুড়ি কোটি বছরে সূর্যের এক বছর।

চিত্র-৩৭
ছায়াপথে সৌরজগৎ

ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে সূর্য প্রায় ত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে। তার মানে সূর্যের অবস্থিতি ছায়াপথের কেন্দ্র ও প্রান্তের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে (চিত্র-৩৭)। এর ফলে ছায়াপথের ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ সূর্যের এক দিকে থাকে ও অন্যদিকে থাকে ব্যাসের তিন-চতুর্থাংশ। উক্ত ছায়াপথ বিশ্বটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বেধ প্রায় কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ হলেও সৌরজগতের অবস্থিতি স্থানে ছায়াপথ বিশ্বের বেধ মাত্র চার হাজার আলোকবর্ষ।

যে সকল নক্ষত্র আমরা মুক্ত নেত্রে দেখতে পাই তারা সকলেই ছায়াপথ বিশ্বের অন্তর্গত। পৃথিবীর চারদিকে আছে এ দ্বীপজগতের অগণিত নক্ষত্র। নিকটবর্তী নক্ষত্রগুলির ব্যবধান আমাদের চোখে কিছুটা ধরা পড়ে কিন্তু সুদূরবর্তী নক্ষত্রগণের দূরত্ববোধ পৃথিবীর কাছে লুপ্ত হয়ে যায়, তাদের সে ঘন সন্নিবিষ্ট মনে করে। বিশ্বটির সীমানার প্রান্তিক অংশকে অর্থাৎ বিষুবপ্রদেশকে এজন্যে আমরা আকাশে জ্যোতির্ময় পথের মতো দেখতে

পাই। আমরা তাকেই নানা নামে অভিহিত করি, বলি ছায়াপথ, আকাশ বলয়, আকাশগঙ্গা ইত্যাদি। দৃশ্যমান এই অংশ নিয়েই সম্পূর্ণ দ্বীপজগৎটিকে নাম দেওয়া হয়েছে ছায়াপথ। ছায়াপথ দ্বীপজগতের যে কোন অঞ্চল থেকেই তার দূরবর্তী বিষুবপ্রদেশকে এ রকম আকাশবলয় রূপে দেখা যাবে। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ আকাশবলয় পৃথিবীর ভ্রমণকক্ষ বা ক্রান্তিবৃত্তকে দুই জায়গায় ছেদ করে, একটি মিথুন রাশিতে অপরটি ধনুরাশিতে। মিথুন রাশির সন্নিকটে ছায়াপথের সীমানার অংশ, সেজন্যে আমরা ঐ স্থানে আকাশবলয়টিকে ক্ষীণ দেখি। ধনুরাশির অভিমুখে ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অংশ থাকায় সেখানটায় নক্ষত্রের সমারোহ বেশী সুতরাং সেখানটা উজ্জ্বলতর ও প্রশস্ত। তথাপি ঐ অংশটি যতটা উজ্জ্বল হওয়া উচিত ছিল ততটা দেখা যায় না। তার কারণ ছায়াপথের কেন্দ্রকে আড়াল করে রেখেছে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী ধূলিমিশ্রিত গ্যাসের কৃষ্ণবর্ণ নীহারিকা।

খালি চোখে আমরা আকাশে হাজার তিনেক নক্ষত্র দেখতে পাই। আকাশের অপরার্ধ যখন আমাদের চোখের সামনে আসে তখন আবার সমসংখ্যক নক্ষত্রই দৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ খালিচোখে আমরা সর্বসাকুল্যে হাজার ছয়েক নক্ষত্র দেখি। দূরবীনের দৃষ্টিতে এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ হাজার কোটি। ভবিষ্যতে দূরবীনের দৃষ্টি আরও প্রখর হলে সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী যে পরিমাণ গ্যাস ও ধূলি আছে তা দিয়েও কালক্রমে বিরাট সংখ্যক নক্ষত্রের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বল নীহারিকাটিতে সম্ভবত এখন নক্ষত্রের জন্ম চলছে।

ছায়াপথ দ্বীপজগতের অধিবাসী সকল নক্ষত্রই সূর্যের ন্যায় আপন আপন কক্ষপথে ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। নক্ষত্রের এই ভ্রমণবেগের জন্যেই ওরা একে অন্যের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না এবং বিশ্বটিও আপন সত্তা বজায় রেখে টিকে আছে, ধ্বংস হয়ে যায় নি।

ছায়াপথ দ্বীপজগতে আছে বিভিন্ন আকারের কোটি কোটি নক্ষত্র, আছে বিভিন্ন জাতের বহু নীহারিকা, আছে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে অপরিমেয় গ্যাস ও ধূলির অবস্থিতি, তাছাড়া সৌরজগতের মতো লক্ষ লক্ষ নিষ্প্রভ গ্রহ-উপগ্রহের বসতি থাকাও সর্বতোভাবে সম্ভব। নক্ষত্রদের কতকগুলি

একক, কতকগুলি একত্রে তারকাগুচ্ছের বা নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে, কতক-গুলি বা যুগলে পরিণত হয়েছে। এই সব বিচিত্র জ্যোতিষ্ক ও তাদের বিচিত্র গতিবিধি মিলে ছায়াপথ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপজগৎ। স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু স্বাধীন নয়। তাকে এক দ্বীপপুঞ্জের যৌথ শাসন মেনে চলতে হয়। পরস্পর থেকে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে ছায়াপথের মতো আরও কোটি কোটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপজগৎ কিন্তু তারাও কোন না কোন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীপপুঞ্জগুলি প্রত্যেকে একে অন্যের সান্নিধ্য থেকে দুরন্ত বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নক্ষত্রের জন্মকথা

নক্ষত্রের গঠন-উপাদান গ্যাস। দিগন্ত বিস্তৃত গ্যাসরাশি ক্ষুদ্রায়তনে সঙ্কুচিত হলে সেটাই জ্বলন্ত নক্ষত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

নক্ষত্রের জন্ম দেখা যায় না। এর কারণ সুবিস্তৃত গ্যাসীয় মেঘের অভ্যন্তরে তাদের জন্ম হয়। গ্যাসীয় মেঘ আমাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখে, তাই নক্ষত্রের জন্ম অদৃশ্য। নক্ষত্রের জন্মের পর তার তাপ চতুর্দিকের উদ্বৃত্ত গ্যাসকে সরিয়ে দেয়, তারপর জ্বলন্ত নক্ষত্রের দীপ্তি বহির্বিশ্বে প্রকাশিত হয়। নক্ষত্র সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে দীপ্ত নক্ষত্ররূপে প্রকাশিত হতে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়। এজন্যে নক্ষত্রের জন্মপ্রণালী এবং এই প্রণালীর প্রগতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এই বিষয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—এস্থলে তারই আলোচনা করা হলো।

ছায়াপথের সীমানার বাইরে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরস্থিত কোন স্থান থেকে কেউ যদি ছায়াপথ-বিশ্বটির দিকে তাকায়, তাহলে সে এটিকে দেখবে একটি জ্যোতির্ময় নীহারিকারূপে,—এখানকার নক্ষত্রগুলির পৃথক সত্তা সে বুঝতেও পারবে না। পৃথিবী থেকে আমরাও সেরূপ দূরস্থিত দ্বীপজগৎ-গুলিকে অল্পবিস্তর উজ্জ্বল নীহারিকারূপে দেখি এবং আকৃতি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন নামকরণ করি; যেমন সর্পিল নীহারিকা (Spiral Nebula) উপবৃত্তাকার নীহারিকা (Elliptical Nebula) ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এরাও নক্ষত্র সমাকীর্ণ বিশ্ব এবং এদের অনেকের মধ্যে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে আছে গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ, ঠিক ছায়াপথ-বিশ্বে যেমন দেখা যায় নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে গ্যাসীয় মেঘমালা। ছায়াপথ-বিশ্বে যে ভাবে নক্ষত্রের জন্ম অন্য সব বিশ্বেও সেই ভাবেই নক্ষত্রদের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক।

ছায়াপথ-বিশ্ব একটি কুণ্ডলী-পাকানো বা সর্পিল নীহারিকা। আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথ-বিশ্বের ভিতরে এক পাশের দিকে অবস্থিত। এই বিশ্বের কেন্দ্রীয় নক্ষত্রদের পৃথিবী থেকে বিশেষ দেখা যায় না,—তার

প্রথম কারণ কেন্দ্রের দূরত্ব, দ্বিতীয় কারণ গ্যাসীয় মেঘস্তূপ কেন্দ্রকে পৃথিবী থেকে আড়াল করে রেখেছে। অতএব পৃথিবীর আকাশে আমরা যাদের দেখি, তারা প্রধানত প্রান্তীয় নক্ষত্র ও প্রান্তীয় মেঘস্তূপ অর্থাৎ এদের অবস্থান ছায়াপথের সর্পিল গ্যাসবাহুর অভ্যন্তরে। সর্পিল বাহুতে ধূলি-মিশ্রিত গ্যাসের প্রাদুর্ভাব। এই সব ধূলিমিশ্রিত গ্যাসস্তূপ থেকে কি করে নক্ষত্রের উদ্ভব হয়, সেই তত্ত্বই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়।

আগে মনে করা হতো, পৃথক পৃথক পরিবেশে গ্যাস ঘনীভূত হয়ে প্রতিটি নক্ষত্র একক ভাবে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই ধারণায় বিজ্ঞানসম্মত সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। অধুনা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, নক্ষত্রের জন্ম হয় দলে দলে। একই পরিবেশে, একই সঙ্গে বহু নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়, যেমন—মেঘ থেকে একটি মাত্র বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে না, বর্ষণ হয় বৃষ্টিবিন্দুর ধারায়।

পৃথিবী থেকে কোনও বস্তু উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে সেই বস্তু আবার মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতেই ফিরে আসে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করতে পারে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে অন্যূন ১১·২ কিলোমিটার (প্রায় সাত মাইল) গতিবেগ দিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি কোনও বস্তু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে সে বস্তু আর মাটিতে নেমে আসবে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে দূরে চলে যাবে। একে বস্তুটির প্রস্থান বেগ (Escape Velocity) বলা হয়। কোন বস্তুকে সূর্যপৃষ্ঠ ত্যাগ করতে হলে তাকে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ তার প্রস্থানবেগ হওয়া চাই প্রতি সেকেণ্ডে কম পক্ষে ৬২০ কিলোমিটার (প্রায় ৩৮০ মাইল)।

গ্যাস যথেষ্ট ঘনীভূত হলেই নক্ষত্র হয়ে দাঁড়ায়। সূর্যে যে পরিমাণ গ্যাস আছে, তা যদি আদিম কালের বিরল অবস্থায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই বিরল গ্যাসের বর্তুল স্তূপটি বর্তমান সূর্যের আয়তন অপেক্ষা এক কোটিগুণ বড় হবে এবং তার ব্যাসের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় তিন আলোক-বর্ষের দৈর্ঘ্যের সমান। পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর করে শুধু তার আয়তনের উপর নয়, তার ঘনত্বের উপরও। এই বিরাট ও বিরল গ্যাসস্তূপের মাধ্যা-কর্ষণ শক্তি এত কম যে, ওর উপর থেকে সেকেণ্ডে মাত্র এক কিলোমিটারের এক-পঞ্চমাংশ বেগে কোন বস্তু উৎক্ষিপ্ত হলেই বস্তুটি স্তূপপৃষ্ঠ ত্যাগ করে বাইরে প্রস্থান করতে সক্ষম হবে। গ্যাসের পরমাণুগুলির স্বকীয় স্বাভাবিক গতিবেগও এই সামান্য প্রস্থানবেগের চেয়ে বেশী। তার ফলে ঐ গ্যাস-

স্তূপের উপর থেকে পরমাণুগুলি পালাতে আরম্ভ করবে। এই কারণে স্তূপটি কোন দিনই আর ঘনীভূত হয়ে সূর্যে অর্থাৎ নক্ষত্রে পরিণত হতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একক নক্ষত্রের উপযোগী কোনও বিরল গ্যাস-স্তূপ থেকে নক্ষত্রের জন্ম সম্ভব নয়।

কিন্তু একক সূর্যে যে গ্যাস আছে, তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী গ্যাস যদি বিরল ভাবে সহাবস্থান করে, তাহলে এই বিরাট পরিমাণ গ্যাসমেঘ থেকে পরমাণুসমূহের প্রস্থান করবার সম্ভাবনা থাকে না। গ্যাসকণার প্রাচুর্যের ফলে তাদের সম্মিলিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক পরমাণুর দূরে প্রস্থান করবার ঐ ভ্রমণবেগ নিরোধ করে তাদের একত্র সন্নিবদ্ধ রাখতে পারে। গ্যাসীয় পরমাণুসমূহ ঐ গ্যাসরাশির মধ্যেই ছুটাছুটি করে বেড়ায়। অর্থাৎ একক নক্ষত্রের উপযোগী বিরল গ্যাস সমষ্টিবদ্ধ থাকতে না পারলেও সহস্র নক্ষত্রের উপযোগী বিরল গ্যাস সমষ্টিবদ্ধ থাকতে পারে।

এজন্যেই বিজ্ঞানীদের অনুমান—নক্ষত্রের জন্ম হয় দলবদ্ধ অবস্থায়। কোন সময়েই একক একটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে শত শত বা সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের উদ্ভব হয় এক সঙ্গে। তাকে বলা হয় নক্ষত্রের বর্ষণ (Star Shower)।

নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে আছে গ্যাস অতি বিরলভাবে অবস্থিত। আয়তনে বিরাট। এই গ্যাস প্রধানত হাইড্রোজেন পরমাণু এবং তাতে আছে ধূলিকণার সংমিশ্রণ। আভ্যন্তরীণ চঞ্চলতার ফলে ও মহাকর্ষের টানে বিরল গ্যাস ক্রমশ ঘন হয়ে কোথাও কোথাও মেঘের আকার ধারণ করে। পৃথিবীবাসী এই জমাট মেঘস্তূপকে নীহারিকারূপে দেখতে পায়। দেখে মনে হয়, গ্যাসীয় মেঘস্তূপ যেন ক্রমে ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র সৃষ্টির দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু গ্যাসের সঙ্কোচন-ক্রিয়া যদি এত সহজেই সম্পন্ন হতো, তাহলে কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই সকল গ্যাসস্তূপ নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়ে যেত এবং ব্রহ্মাণ্ডের যে বয়স, সেই ৫০০।৬০০ কোটি বছরের মধ্যে কোথাও আর কোন গ্যাস অবশিষ্ট থাকতো কিনা সন্দেহ—সম্পূর্ণ গ্যাসই হয়তো নক্ষত্র সৃষ্টিতে ব্যয় হয়ে যেত।

গ্যাসীয় স্তূপে সঙ্কোচন চলে অতি ধীর মন্থর গতিতে। মহাকর্ষের টানে গ্যাস যত সঙ্কুচিত হয়, তার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা তত বাড়ে। তাপশক্তি মেঘস্তূপকে স্ফীত করে ফেলতে চায়, মহাকর্ষ মেঘকে সঙ্কুচিত করতে

চেষ্টা করে। তাপ ও মহাকর্ষ সম-শক্তিসম্পন্ন হলে স্তূপের প্রসারণ বা সঙ্কোচন কোনটাই সম্ভব নয়। তাপ যদি মেঘের গ্যাস ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে তবেই আবার মেঘের সঙ্কোচন সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না—যে পরিমাণে বেরোয় তদনুযায়ী সঙ্কোচন ঘটে। মেঘ যত বেশী সঙ্কুচিত হয়, তাপের বহির্গমন তত বেশী বাধাপ্রাপ্ত হয়।

গ্যাসস্তূপের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ ছুটাছুটি করে বেড়ায়। সেই সময়ে ধূলিকণার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে ধূলিকণার গায়ে তারা লেগে যায়। ধূলিকণার গাত্রসংলগ্ন হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহের মধ্যে যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা হাইড্রোজেন অণু উৎপন্ন হয়। এই অণু ধূলি-কণার গায়ে লেগে থাকতে পারে না, উড়ে গিয়ে গ্যাস-সমুদ্রে মিশে যায়। এই ভাবে গ্যাসরাশির মধ্যে হাইড্রোজেনের পরমাণু ও অণু দুয়েরই অব-স্থিতি ঘটে। গ্যাসস্তূপে হাইড্রোজেনের অণুর অস্তিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অণুগুলিই গ্যাসকে শীতল করে ফেলে। এর ফলে গ্যাসের ঘনীভবন সম্ভব হয় এবং তার জন্যে তার অভ্যন্তরের তাপমাত্রাও বাড়ে। এদিকে হাইড্রোজেন অণু গ্যাসের মধ্যস্থিত অপরাপর অণুর সহযোগে অর্থাৎ জলীয় অণু, অ্যামোনিয়া অণু প্রভৃতির সহযোগে গ্যাসের অভ্যন্তরে উৎপন্ন তাপের বহির্গমনে অবরোধ সৃষ্টি করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্যাসের তুলনায় ধূলিকণার পরিমাণ কম হলেও তার অবদান প্রচুর। ধূলিকণা অণু সৃষ্টি করছে এবং অণু গ্যাসরাশিকে শীতল করছে। অণুই আবার তাপের বহির্গমনে বাধা দিচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে ধূলিকণাই গ্যাসের আভ্যন্তরীণ তাপ নিয়ন্ত্রণ করছে।

এই প্রণালীতে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানের গ্যাসরাশি ধূলিকণার সহায়তায় ক্রমে বিরল থেকে ঘন ও ঘন থেকে ঘনতর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরের তাপমাত্রাও ক্রমে বাড়তে থাকে।

প্রথম প্রথম গ্যাস বিরল থাকে বলে ভিতরের উৎপন্ন তাপ সবটাই বাইরে বিকিরিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টানে ও অন্যান্য কারণে গ্যাস যত ঘন হতে থাকে, ততই তাপ আর সম্পূর্ণভাবে বাইরে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না,—অণু ও ধূলিকণামিশ্রিত ঘন গ্যাস বিকিরণে বাধা জন্মায়। সুতরাং অভ্যন্তরে যত তাপ সঞ্চিত হতে থাকে, মেঘের সঙ্কোচনও চলে তত মন্থর গতিতে। এভাবে গ্যাসমেঘের সামগ্রিকভাবে সঙ্কোচন চলতে থাকলে

হয়তো কোটি কোটি বছর পরে একটা মস্ত বড় নক্ষত্রের উদ্ভব হতে পারতো। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন দেখা দেয়।

সঙ্কোচনের ফলে মেঘে গ্যাস এত ঘন হয়ে ওঠে যে, পূর্বে যেখানে এক ঘন-সেন্টিমিটারে দশটি মাত্র পরমাণু ছিল, সেখানে পরে এক ঘন-সেন্টিমিটারে এক কোটি পরমাণু জড়ো হয়। এদিকে মেঘের কেন্দ্রীয় অঞ্চলেও তাপমাত্রা তখন তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় কেন্দ্রীয় অণুগুলি পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ধূলিকণা গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মেঘখানা আর তার সামগ্রিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না—ভেঙ্গে টুক্রা টুক্রা হয়ে যায়; অর্থাৎ ঘনীভূত মেঘ বহু স্তূপে বিভক্ত হয়ে পুরু গ্যাসীয় আবরণসহ পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এরাই ভবিষ্যতের নক্ষত্র। টুক্রা স্তূপগুলি এবার তাদের গ্যাসীয় আবরণ থেকে আরও অধিক পরমাণু নিজ নিজ দেহে আকর্ষণ করে নিতে থাকে। তাতে ক্রমে ক্রমে তাদের ঘনত্ব বাড়ে, তাপমাত্রা বাড়ে এবং অবশেষে নক্ষত্রের ভর ও দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই সকল নক্ষত্র সূর্যের এক-পঞ্চমাংশ থেকে আরম্ভ করে সূর্যের দ্বিগুণ পর্যন্ত আয়তন ও ভরবিশিষ্ট হয়। পরে চারদিকের পুষ্টিকর ঘন গ্যাসের আবরণ থেকে আরও গ্যাস স্বদেহে আকর্ষণ করে নিয়ে আয়তন ও ভর বাড়িয়ে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। কোন কোনটা ঔজ্জ্বল্যে নীলাভ হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে—এক্ষেত্রে গ্যাসের পরিমাণ অনুযায়ী এক সঙ্গে শত শত কিংবা সহস্র সহস্র নক্ষত্রের জন্ম হয়ে গেল। প্রতি নক্ষত্রে গ্যাসের সঞ্চয় যেমনই হোক, তার ঘনত্ব এত বেশী যে, নক্ষত্রের পৃষ্ঠ থেকে কোন পরমাণুই আর আপন গতিবেগে বাইরে প্রস্থান করতে পারে না।

নক্ষত্র-সৃষ্টিতে যে ধূলিকণা এত প্রয়োজনীয়, সে ধূলিকণা গ্যাস-সমুদ্রে এল কোথা থেকে? এই বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর উল্লেখ করেছেন। যেমন—গ্যাসের ভিতরে এমন সব অণু আছে, যেগুলি ঠাণ্ডা হলে তরল বা কঠিন কণায় রূপান্তরিত হয়ে ধূলিকণারূপে প্রতীয়মান হয়। আবার কতকগুলি নক্ষত্র আছে, যাদের পৃষ্ঠতাপ কম অর্থাৎ দুই হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এদের কারও কারও পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরণ রশ্মির দ্বারা বাহিত হয়ে সূক্ষ্ম কার্বন বা কয়লাকণা অর্থাৎ ঝুল বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এরাও গ্যাস-সমুদ্রের ধূলিকণা। আবার নক্ষত্রের

অভ্যন্তরে উত্তাপহেতু পারমাণবিক বিক্রিয়ায় (Nuclear Reaction) নানাবিধ মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই সব মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা বিবিধ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এরা সকলেই নক্ষত্রের মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। নক্ষত্রের দ্রুত আবর্তনের ফলে ও অন্যান্য কারণে তার পৃষ্ঠদেশ থেকে এই সব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের কিছু কিছু অংশ বিচ্ছুরিত হয়ে বহির্বিশ্বে গ্যাস-সমুদ্রে বিলীন হয়। নক্ষত্রের অতিনোভা (Super Nova) বা নোভা অর্থাৎ নবতারা হবার প্রাক্কালে যে বিস্ফোরণ ঘটে, তার ফলেও ঐ সব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ গিয়ে বহির্বিশ্বের গ্যাস-সমুদ্রে মিশে যায়। এরাও কালক্রমে তাপ হারিয়ে গ্যাসীয় অবস্থা থেকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তরল ও কঠিন কণায় রূপান্তরিত হয়ে গ্যাস-সমুদ্রে ধূলিকণারূপে দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত প্রক্রিয়াতেই প্রত্যেক সর্পিল নীহারিকার কুণ্ডলী পাকানো গ্যাস বাহুতে নক্ষত্রের জন্ম হয়। এদের ১নং টাইপ (Type I) নক্ষত্র বলা হয়।

দেখা যাচ্ছে,—নক্ষত্র-সৃষ্টিতে যে ধূলিকণা অত্যাবশ্যক, সেই ধূলিকণা নক্ষত্রেরই সৃষ্টি। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, যখন নক্ষত্র ছিল না একটিও, তখন নক্ষত্রের জন্ম হলো কি ভাবে ?

ছায়াপথ-বিশ্বে আমরা যে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের সমারোহ দেখতে পাই—চিরদিন এমনটি ছিল না। একদিন ছিল যখন এখানে নক্ষত্র বা অন্য কোন জ্যোতিষ্ক ছিল না একটিও—ছিল মাত্র তাদের গঠন-উপাদান অর্থাৎ গ্যাস। এই গ্যাসও সম্ভবত শতকরা একশত ভাগই ছিল হাইড্রোজেন পরমাণু এবং তা বিস্তৃত ছিল অত্যন্ত বিরল অবস্থায়। আদিম কালের এই গ্যাসরাশির যে কোন প্রান্ত থেকে তার বিপরীত প্রান্তের ব্যবধান ছিল বহু কোটি আলোকবর্ষ।

এই গ্যাসরাশির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঘনত্ব ছিল জলের ছয় হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি (৬০০০×১০^{২৯}) ভাগের এক ভাগ। তাপমাত্রাও ছিল অত্যন্ত উচ্চ। কারণ এই গ্যাসের মধ্যে ধূলি নেই। ধূলি থাকলেই তার গাত্রসংলগ্ন পরমাণু থেকে অণু সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে এবং অণু সৃষ্টি হলেই গ্যাসের তাপমাত্রা কমে যায়। এক্ষেত্রে পূর্বে কোন নক্ষত্র না থাকায় ধূলি থাকবার সম্ভাবনা নেই, অতএব অণু সৃষ্টিও সম্ভব নয়।

হাইড্রোজেন পরমাণুর তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে না উঠলে তারা বহির্বিশ্বে তাপ বিকিরণ করে দিতে পারে না। তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রীর উপরে উঠলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রন খসে যায় এবং তখন স্বচ্ছন্দে তাপ বিকিরিত হয়ে যেতে পারে।

সুবিশাল গ্যাসস্তূপ অর্থাৎ যে স্তূপে বহু দ্বীপজগতের ভর আছে, সেই স্তূপের গ্যাসরাশির তাপমাত্রা প্রথমে থাকে দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। আপন মাধ্যাকর্ষণ বলে গ্যাসস্তূপ ঘনীভূত* হতে থাকলে স্তূপদেহ থেকে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপের বহির্গমন আরম্ভ হয়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত গ্যাসরাশির তাপমাত্রা ক্রমে নেমে এসে প্রায় দশ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে দাঁড়ায়।

এই স্তূপ যদি মহাকর্ষীয় টানে অধিকতর সঙ্কুচিত** হতে থাকে তাহলে ঐ সঙ্কোচনের ফলে গ্যাসের মধ্যে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তার অল্পাংশ যায় তাপমাত্রা বাড়াতে, অবশিষ্ট যায় গ্যাসীয় চলৎ-শক্তি*** (Aerodynamic Energy) বাড়াতে। তাপের বিকিরণ আছে, কিন্তু চলৎ-শক্তির কোন

---

* ফুটবলের ব্লাডারে পাম্প দিয়ে যত বেশী হাওয়া প্রবেশ করানো যায়, বাইরের চামড়ার আবরণ তত বেশী শক্ত হয়। তারপর ব্লাডারের মুখ খুলে দিলে হাওয়া প্রবল বেগে বেরিয়ে যায়। এখানে ব্লাডারের ভিতর স্বল্প পরিসর স্থানে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশী হাওয়া প্রবেশ করেছিল এবং তার ফলে বায়ুকণা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে বায়ু সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল, ব্লাডারের মুখ খোলা পাওয়ায় আবার প্রসারিত হয়ে গেল। একে বলা হয় অস্থায়ী সঙ্কোচন (Shrinkage)। স্থায়ী সঙ্কোচন হলে ব্লাডারের মুখ খোলা পেলেও বায়ু বেরিয়ে যেত না।

** স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটলে গ্যাস পূর্বের তুলনায় স্বল্প পরিসর স্থান অধিকার করে থাকে। স্থায়ী সঙ্কোচনকে এককথায় ঘনীভবন (Condensation) বলা হয়। সঙ্কোচনের ফলে গ্যাসের মধ্যে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ বিকিরিত হয়ে গেলেই সঙ্কোচন স্থায়ী হতে পারে অর্থাৎ গ্যাস ঘনীভূত হতে পারে। গ্যাস থেকে যে পরিমাণ তাপ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় তদনুপাতে গ্যাস ঘনীভূত হয়। যেমন—বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ ও কুয়াশায় পরিণত হয়। তাপ আহরণ করে ঘনীভূত গ্যাস পুনরায় সম্প্রসারিত হতে পারে।

*** সঙ্কোচনকালে গ্যাসের মধ্যে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তা দুটি শক্তিতে বণ্টিত হয়ে যায়—একটি তাপশক্তি, অপরটি গ্যাসীয় চলৎ-শক্তি (Aerodynamic Energy)। সুতরাং গ্যাসকণাগুলির পূর্বেকার তাপমাত্রা ও চলৎ-শক্তি বৃদ্ধি

বিকিরণ নেই—কাজেই গ্যাসের ঐ সঙ্কোচন নিতান্তই সাময়িক। চলৎ-শক্তি গ্যাসস্তূপকে আবার সম্প্রসারিত করে দেবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড বড় স্তূপের সামগ্রিকভাবে স্থায়ী সঙ্কোচন সম্ভব হয় না।

তাহলে এই গ্যাসরাশির সঙ্কোচন ঘটে কি ভাবে? এর উত্তর হচ্ছে—সম্পূর্ণ গ্যাসরাশির স্থায়ী সঙ্কোচন সামগ্রিক ভাবে না ঘটলেও খণ্ড খণ্ড ভাবে ঘটতে পারে। গ্যাসীয় চলৎ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র গ্যাসস্তূপের ভিন্ন ভিন্ন অংশ কতকগুলি ক্ষুদ্রতর স্তূপে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তখন তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত হতে পারে। এই ভাবে বিভক্ত ক্ষুদ্র স্তূপে থাকে কোনটায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের ভর, কোনটায় লক্ষ কোটি নক্ষত্রের ভর, কোনটায় বা মাত্র তিন-শ' কোটি নক্ষত্রের গঠন-উপাদান; অর্থাৎ বড় বা ছোট এক একটি দ্বীপজগতের ভর নিয়ে আদিম গ্যাসরাশি ভিন্ন ভিন্ন স্তূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের ভর আছে যে গ্যাসস্তূপে, সেই স্তূপ যখন মহাকর্ষীয় টানে সঙ্কুচিত হতে থাকে, তখন তার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসীয় চলৎ-শক্তিও বাড়ে। পরমাণুদের চলৎ-শক্তি ও তাপ এক্ষেত্রে প্রায় সমহারেই বাড়ে। সঙ্কোচনের দরুণ গ্যাসের আভ্যন্তরীণ ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাপের বিকিরণ হতে থাকে। বিকিরণের ফলে বেশ কিছু তাপ চিরদিনের জন্যে স্তূপদেহ পরিত্যাগ করে যায়,—এই কারণে সঙ্কোচনও স্থায়ী হয়। এই সঙ্কোচন অবশ্য খুব বেশী নয়—পূর্বের আয়তনের তুলনায় বর্তমান আয়তন দাঁড়ায় হয়তো মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মতো। এই অবস্থায় মহাকর্ষ যদি স্তূপটিকে অধিকতর সঙ্কুচিত করেও তথাপি তা স্থায়ী হবে না, গ্যাসে নিহিত চলৎ-শক্তি তাকে আবার প্রসারিত করে দেবে।

স্থায়ী সঙ্কোচনের দরুণ স্তূপের যে ঘনত্ব বাড়লো, তার ফলে স্তূপের মধ্যে বিভিন্ন অংশ স্থায়ীভাবে ঘনীভূত হয়ে যায় এবং এই কারণে স্তূপটিও ৪।৫টি

পায়। তাপ বাইরে বিকিরিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু চলৎ-শক্তির বিকিরণ নেই। এজন্যে চলৎ-শক্তি গ্যাসের মধ্যেই নিহিত থেকে যায়—পরিবেশ অনুকূল হলে তা প্রকাশ পায়; যেমন—গোলকে প্রবিষ্ট সঙ্কুচিত বায়ু মুক্তি পেলে প্রবল বেগে বেরোয়। জলস্রোত বাধা পেলে যেমন জলাবর্তের সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে সঞ্চরণশীল গ্যাসের স্রোত কোথাও বাধার সম্মুখীন হলে সেখানে ঘূর্ণাবর্ত জাতীয় বিবিধ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হয়। এক্ষেত্রেও পূর্বেকার স্তূপের সামগ্রিক সঙ্কোচন স্থায়ী না হয়ে ক্ষুদ্রতর আয়তনে স্থায়ী সঙ্কোচন হলো (চিত্র-৩৮)। ক্ষুদ্রতর

চিত্র-৩৮
গ্যাসস্তূপের ক্রমিক বিভাজন
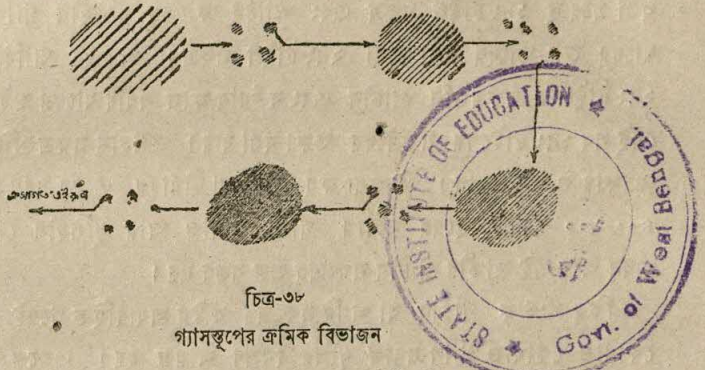
পিণ্ডের প্রত্যেকটি আবার ঐ প্রণালীতেই মহাকর্ষীয় টানে সঙ্কুচিত হয়, তাপ বিকিরণের দ্বারা তাদের স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটে, প্রত্যেকের অভ্যন্তরে গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ে। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই আবার ৪।৫টি অধিতকর ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভাজন প্রণালী চলতে থাকে, কিন্তু অনন্ত কাল চলতে পারে না, এক সময়ে তার শেষ হয়। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাসপিণ্ড এমন ঘনত্বে পৌঁছায় যে, তা ভেদ করে অভ্যন্তরের তাপ আর বিকিরণের দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না ; তখন পিণ্ডের বিভাজনেরও শেষ। ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত তাপের দরুণ এরাই জ্বলন্ত নক্ষত্র এবং বহুবার বিভাজনের জন্যে লক্ষ নক্ষত্র একই সঙ্গে জন্ম নিল। আদি বা প্রাচীন নক্ষত্র বলতে এদেরই বুঝায়। উপবৃত্তাকার নীহারিকায় কেবল এই আদি নক্ষত্রসমূহেরই সমাবেশ। সর্পিল নীহারিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এবং বেষ্টকেও (Halo) এই সব প্রাচীন নক্ষত্রের অবস্থান।

আদি নক্ষত্রের এক একটার ভর সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দেড়গুণ পর্যন্ত। এদের ২নং টাইপ (Type II) নক্ষত্র বলা হয়। বৃহত্তর গ্যাসস্তূপে অর্থাৎ যে স্তূপে আনুমানিক এক লক্ষ কোটি নক্ষত্রের গঠন-উপাদান আছে, তার প্রাথমিক তাপমাত্রা থাকে সাধারণতঃ দেড় লক্ষ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে দশ লক্ষ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। এক্ষেত্রে প্রারম্ভে কিছু প্রভেদ থাকলেও পরে ঠিক উল্লিখিত বিভাজন প্রণালী অবলম্বনেই নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। এরাও ঐরূপ প্রাচীন বা আদি নক্ষত্র অর্থাৎ ২নং টাইপ নক্ষত্রের দলভুক্ত।

সর্পিল নীহারিকার কুণ্ডলী পাকানো বাহুতে নক্ষত্রসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানের ধূলিমিশ্রিত গ্যাস-সমুদ্রে বর্তমান কালেও যে সকল নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে, তাদের বলা হয়েছে ১নং টাইপ নক্ষত্র এবং আদিম কালের ধূলিহীন গ্যাস থেকে যাদের জন্ম, তাদের বলা হলো ২নং টাইপ নক্ষত্র। অতএব আদিতে সৃষ্ট ২নং টাইপের নক্ষত্রগুলি প্রাচীন এবং বর্তমান কাল অবধি যাদের সৃষ্টি চলেছে সেই সব ১নং টাইপের নক্ষত্রদের তরুণ বলা যায়। প্রাচীন নক্ষত্রগুলি কিছুটা ক্ষুদ্রকায় ও কম উজ্জ্বল। ঔজ্জ্বল্য কম বলে এরা দীর্ঘায়ু। এদের বয়স বর্তমানে ৪০০-৬০০ কোটি বছরের মধ্যে। গ্যাস কোথাও আর ধূলিহীন নেই বলে এখন আর এই জাতীয় প্রাচীন নক্ষত্রের জন্ম সম্ভব নয়।

কিছু সংখ্যক প্রাচীন বা আদি নক্ষত্রের সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোথাও গ্যাস-সমুদ্রে ধূলির মিশ্রণ আরম্ভ হয়। এজন্যে নক্ষত্রের সৃষ্টি কিছুদূর অগ্রসর হলেই তরুণ নক্ষত্রের জন্মের সূত্রপাত হয়। সুতরাং তরুণদের মধ্যেও বয়স্ক নক্ষত্র আছে। আমাদের সূর্য তরুণ শ্রেণীভুক্ত হলেও এর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে ও ঔজ্জ্বল্য বিচারে যে হারে সেই হাইড্রোজেন ব্যয় হচ্ছে, তার হিসেব করে বিজ্ঞানীরা বলেন—সূর্যের মোট পরমায়ু প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর এবং তন্মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়েছে। সূর্যের সমকক্ষ অন্যান্য নক্ষত্রসমূহের মোট পরমায়ুও এই প্রকারই অনুমিত হয়।

তরুণ নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোন কোনটার ঔজ্জ্বল্য এত বেশী যে, নিজের সঞ্চিত গ্যাসভাণ্ডার অল্পদিনের মধ্যে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় নিঃশেষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এরূপ অমিতব্যয়িতার দরুণ এদের অনেকের পরমায়ু হয়তো মাত্র কয়েক কোটি বছর আবার কারুর বা হয়তো মাত্র এক কোটি বছরেরও কম।

[বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তিনির্ভর কল্পনা অনুসরণ করে ফ্রেড হয়েল নক্ষত্রের জন্মের যে প্রণালী অনুমান করেছেন, এই আলোচনায় সেই মতবাদই বিবৃত হলো।]

ষোড়শ অধ্যায়

নক্ষত্রের জীবন-প্রগতি

আকাশের অগণিত নক্ষত্রদের আমরা সাধারণত একক অবস্থায় দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলে একক নয়। একক নক্ষত্র অনেক আছে ঠিকই কিন্তু দুই তিন কিংবা আরও অনেক বেশীসংখ্যক নক্ষত্র সংঘবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে এমন নক্ষত্রযূথই বেশী। সংঘবদ্ধ নক্ষত্রদের একের অন্যের মধ্যে ব্যবধান বেশী নয়—তারা ঘন সন্নিবিষ্ট। পৃথিবী থেকে অত্যন্ত দূর বলে ঘন সন্নিবিষ্ট দলবদ্ধ নক্ষত্রদের পারস্পরিক দূরত্ব আমাদের দৃষ্টিতে লুপ্ত হয়ে যায়, তার ফলে আমরা ঐ সকল যূথকে একক মনে করি। একক হোক বা দলবদ্ধ হোক নক্ষত্রদের প্রত্যেকেই আপন আপন অক্ষ অবলম্বনে আবর্তনশীল এবং অসাধারণ দ্রুতগতিতে ভ্রাম্যমান। কিন্তু দূরত্ব হেতু আমাদের জীবন কালে তাদের স্থান পরিবর্তন আমরা বুঝতে পারি না। আজ যদি আকাশের কোন অংশের একটি আলোকচিত্র নেওয়া যায় এবং পাঁচশ' কিংবা হাজার বছর পরে যদি আবার সেই অংশেরই আলোকচিত্র নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে নক্ষত্রদের সকলেরই স্থান পরিবর্তনের ফলে তাদের পারস্পরিক ব্যবধান অন্য প্রকার হয়ে গেছে। কিন্তু দিনের পর দিন দেখে দেখে আমাদের জীবনকালে আমরা তাদের স্থান পরিবর্তন মোটেই লক্ষ্য করতে পারি না। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, পরস্পরের মধ্যে তাদের অবস্থিতি চিরকাল একই জায়গায় নিবদ্ধ হয়ে আছে। এজন্যে আমরা তাদের স্থির নক্ষত্র (Fixed stars) বলি।

তারকামণ্ডল বা নক্ষত্রপুঞ্জ
(Constellations)

স্থির নক্ষত্রের কতকগুলিকে রেখাযুক্ত করলে যে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত হয়, তার সঙ্গে কোন পার্থিব বস্তুর সাদৃশ্য কল্পনা করা যেতে পারে। কল্পিত রেখাযুক্ত ঐ নক্ষত্রগুলিকে সাদৃশ্য অনুসারে একত্রে একটা নামকরণ করা হয়েছিল মানব-সভ্যতার প্রথম যুগে। এদের বলা হয় নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারকামণ্ডল

(Constellations)। আকাশের যেখানেই থাকুক না কেন নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতির পরিবর্তন দীর্ঘকালেও লক্ষ্য করা যায় না।

উত্তর আকাশে ধ্রুবতারার নিকটে গুটিকয়েক বিখ্যাত নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। একটিকে আমরা বলি সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইংরেজীতে একে বলা হয় Great Bear (বা Ursa Major) অর্থাৎ বৃহৎ ভল্লুক। আর একটির নাম লঘু সপ্তর্ষি—ইংরেজী নাম Little Bear (Ursa Minor) বা ক্ষুদ্র ঋক্ষ। লঘু
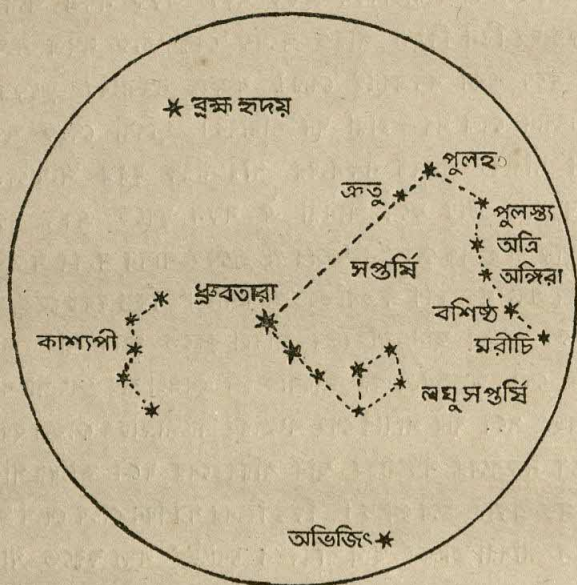
চিত্র-৩৯
ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি, কাশ্যপী প্রভৃতি

সপ্তর্ষির অপর দুটি নাম শিশুমার ও ধ্রুবমৎস্য। এই অঞ্চলে অপর একটি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম কাশ্যপী (Cassiopeia) (চিত্র-৩৯)।

মধ্যাকাশে রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্তের* দ্বাদশ রাশিতে ২৭টি নক্ষত্র অবস্থান করে। তাদের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী ইত্যাদি। (চিত্র-৪০)।

* ক্রান্তিবৃত্ত ও রাশিচক্রে একটু প্রভেদ আছে। দৃশ্যত,—আকাশবেষ্টনী যে পথ ধরে সম্বৎসরে সূর্য পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে তার নাম রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত, কিন্তু রাশিচক্র বলতে ঐ রবিমার্গের দু-পাশে কিছুটা বিস্তৃতিও বুঝায়। ক্রান্তিবৃত্তের ৯ ডিগ্রী উত্তর থেকে ৯ ডিগ্রী দক্ষিণ পর্যন্ত

এই ২৭টির কতকগুলি একক নক্ষত্র, অপরগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ কিংবা কোনও পুঞ্জের সদস্য। ক্রান্তিবৃত্তের বৃষ-মিথুন রাশিতে অবস্থিত বিখ্যাত কালপুরুষ
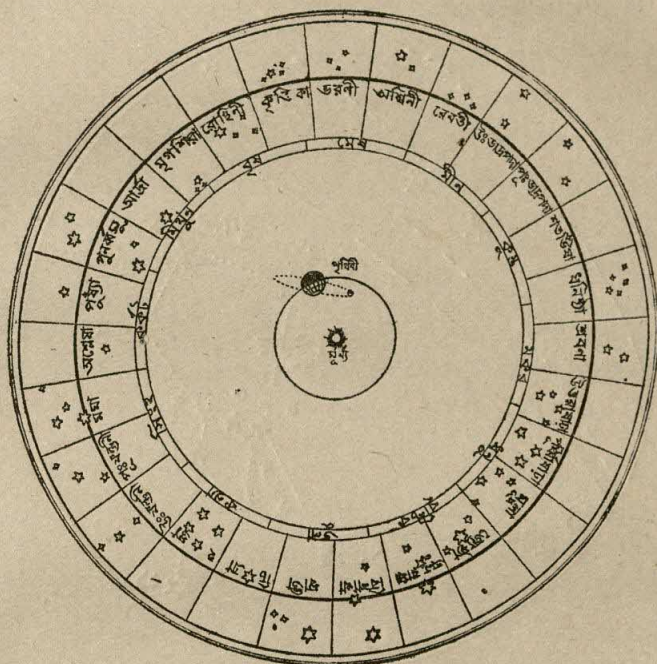
চিত্র-৪০—রাশিচক্রের নক্ষত্র

(Orion) পুঞ্জটি সকলেরই পরিচিত (চিত্র-৪১)। আমাদের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক এই কালপুরুষের নিকটে অবস্থিত। হ্রদসর্প বা বৃত্র (Hydra) নক্ষত্রপুঞ্জটিকে দেখতে কুণ্ডলী পাকানো দীর্ঘ সাপের মতো—

এর ব্যাপ্তি। অর্থাৎ রাশিচক্র যেন গগনমণ্ডলের নক্ষত্রখচিত কটিবন্ধ। ক্রান্তিবৃত্তকে মধ্যস্থলে রেখে ১৮ ডিগ্রীর যে প্রশস্ত পথ আকাশ বেষ্টন করে আছে বলে কল্পিত হয়, তাকে ১২টি সমান ভাগে ভাগ করে প্রতিটি বিভাগকে একটি রাশি বলা হয়েছে। বারোটি রাশির নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। নক্ষত্র-সমাকীর্ণ এই রাশিচক্রকে আবার ২৭ ভাগে ভাগ করে প্রতি বিভাগ এক একটি নক্ষত্রের এলাকারূপে অবধারিত হয়েছে। তাহলে প্রাত রাশিতে সোওয়া দুই নক্ষত্রের অবস্থান। ২৭টি নক্ষত্রের নাম—অশ্বিনা, ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তর-

এর পুচ্ছ ক্রান্তিবৃত্তের কন্যারাশির সন্নিকটে ও মস্তক কর্কট রাশিতে। মস্তকের পাঁচটি একত্রে অশ্লেষা নক্ষত্র। পুরাণের অনন্ত নাগ বা কালীয় এই হ্রদসর্পেরই
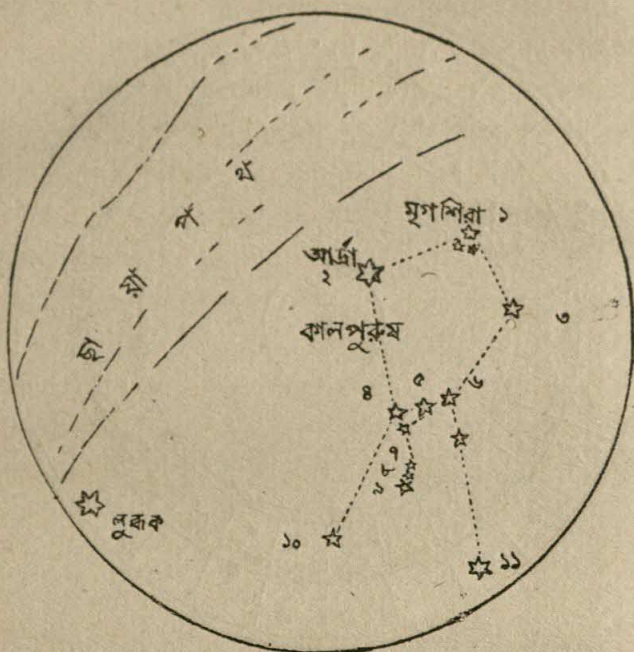
চিত্র-৪১—কালপুরুষ ও লুব্ধক

অন্য পরিচিতি (চিত্র-৪২)। বৃশ্চিক রাশির সন্নিকটে সর্পমণ্ডল (Serpens) নক্ষত্রপুঞ্জটি সুবিখ্যাত। এই রকম আরও অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশময় ছড়িয়ে আছে। আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলের নক্ষত্রসমূহকে পুঞ্জে বিভাগ করার তাৎপর্য পুরাকালে যাই থাকুক, বর্তমানে আমাদের সুবিধা হয়েছে এই যে, পুঞ্জের নাম জানা থাকলে বিশেষ একটিকে খুঁজে বের করতে বেশী বেগ পেতে হয় না।

ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী। এই নক্ষত্ররা সকলেই যে ঐ রাশিচক্রের প্রশস্ত পথটির মধ্যে অবস্থিত, তা নয়—কোন কোন নক্ষত্র রাশিচক্রের সীমানার বাইরে থাকলেও প্রসিদ্ধি ও সান্নিধ্যবশত তাদের রাশিচক্রের মধ্যেই গণ্য করা হয়।

যুগল নক্ষত্র (Binary Stars)

আগেই বলা হয়েছে, আকাশে অনেক নক্ষত্র একক, আবার অনেকের এক বা একাধিক সঙ্গী আছে। ছুটি নক্ষত্রের জুটিকে যুগল নক্ষত্র (Binary Stars) বলা হয়। মহাকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী সংখ্যকই যুগল নক্ষত্র। যুগল নক্ষত্রের প্রত্যেকটিই আপন অক্ষ অবলম্বনে আবর্তন করতে করতে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ উভয়ের সম্মিলিত ভারকেন্দ্রের (Centre of Gravity) চারদিকে উভয়ে প্রদক্ষিণ করে। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের শিকারী কুকুর সারমেয় বা লুব্ধক (Sirius) একটি যুগলের অন্যতম, এর সঙ্গীর নাম সিরিউস-বি (Sirius B)। কালপুরুষের অন্য কুকুর প্রশ্বা (Procyon) অপর একটি নক্ষত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে যুগল

চিত্র-৪২—ক্ষুদ্রসর্প, লুব্ধক ও প্রশ্বা
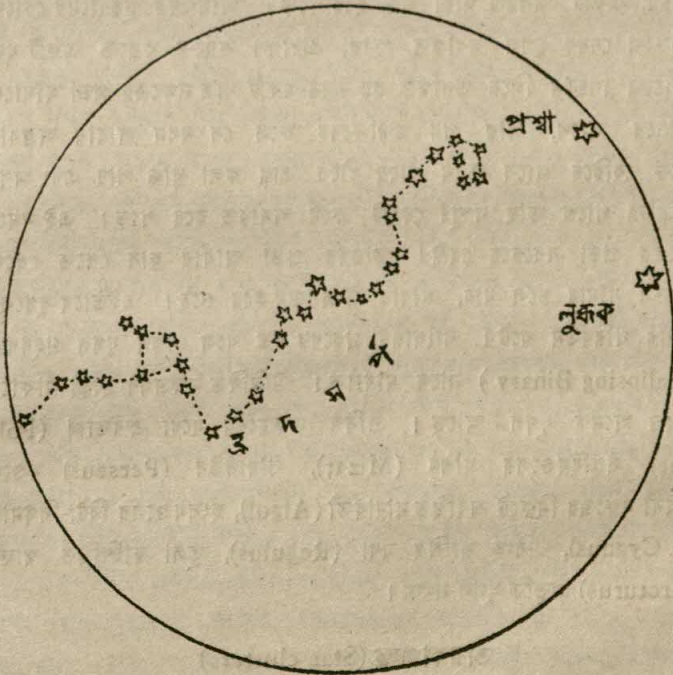
হয়ে আছে। যুগলের নক্ষত্রদ্বয় কাছাকাছি থাকে বলে খালি চোখে কোন সময়েই তাদের পৃথক সত্তা ধরা পড়ে না, দূরবীনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

শীতের রাতে মধ্যাকাশে ক্যাষ্টর ও পোলাক্স (Castor and Pollux) নামে দুটি নক্ষত্র দেখা যায়। বাংলায় এরা পুনর্বসুদ্বয় নামে পরিচিত। গ্রীসবাসীরা এদের সামুদ্রিক জাহাজের তত্ত্বাবধায়ক মনে করে। ক্যাস্টরকে যুগল নক্ষত্র বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্যাস্টরের কেন্দ্রে দুটি নক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। অপর এক নক্ষত্রযুগল নিজেদের প্রদক্ষিণ করতে করতে কেন্দ্রীয় যুগলকে ৩০০ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করছে। তৃতীয় আর একটি যুগল নিজেদের প্রদক্ষিণ করতে করতে প্রথম দুই যুগলকে ১০,০০০ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করছে। অতএব ক্যাস্টর বলতে তিনজোড়া যুগল অর্থাৎ মোট ছয়টি নক্ষত্র বুঝায়।

কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের প্রভার পরিবর্তন দেখা যায়। তার কারণ, একটি অপরটি দ্বারা গ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দূরবীনের চোখের সমতলে যেসব যুগল অবস্থিত, তারা প্রদক্ষিণ করতে করতে একটি যখন অপরের পিছনে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন একটি মাত্র নক্ষত্রের প্রভা আমাদের গোচরে আসে, তার পর প্রদক্ষিণের ফলে সে যখন আবার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে তখন ধীরে ধীরে তার কলা বৃদ্ধি পায় এবং অপর নক্ষত্রটির পাশে তার সম্পূর্ণ দেহটি ক্রমে অনাবৃত হয়ে পড়ে। এই সময়ে যুগলের প্রভা সবচেয়ে বেশী। তারপর প্রভা আবার হ্রাস পেতে পেতে নিম্নতম সীমায় চলে যায়, আবার উজ্জ্বলতম হয়ে ওঠে। এইভাবে যুগলের প্রভার পরিবর্তন ঘটে। ব্যাপারটা গ্রহণের মত বলে এরূপ যুগল গ্রহণপন্থী (Eclipsing Binary) নামে আখ্যাত। উল্লিখিত নক্ষত্রগণ ছাড়া আকাশে আরও অনেক যুগল আছে। প্রসিদ্ধ নক্ষত্রদের মধ্যে ধ্রুবতারা (Pole Star), সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠ (Mizar), পারসিউস (Perseus) মণ্ডলে অশ্বিনী নক্ষত্রের নিকটে অবস্থিত মায়াবতী (Algol), হংসমণ্ডলের বিটা-সিগনাস (B Cygnus), সিংহ রাশিস্থ মঘা (Regulus), তুলা রাশিস্থিত স্বাতী (Arcturus) প্রভৃতি যুগল নক্ষত্র।

তারকাগুচ্ছ (Star clusters)

দূরবীনের দৃষ্টিতে দেখা যায় আকাশে এক এক স্থানে বহু নক্ষত্র গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আছে। এদের কেন্দ্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাকে ঘিরে চতুর্দিকে হাজার হাজার ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রের অবস্থান। তারপর কেন্দ্র থেকে

ব্যবধান যত বেশী, গোষ্ঠীর অবশিষ্ট নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী দূরত্বও তত বেশী। সকল নক্ষত্র একত্রে বতুলের রূপ ধারণ করে আছে। এদের বর্তুলাকার তারকাগুচ্ছ (Globular clusters) বলে। এইরকম আরও তারকাগুচ্ছ দূরবীনে ধরা পড়ে কিন্তু তারা বর্তুলাকার নয়। এদের মুক্ত বা খোলা তারকাগুচ্ছ (Open clusters) বলা হয়। বর্তুলাকার কিংবা মুক্ত প্রতি তারকাগুচ্ছেই নক্ষত্রের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী (প্লেট নং-ভ)।

হারকিউলাস (Hercules) নক্ষত্রপুঞ্জে একটি বর্তুলাকার তারকাগুচ্ছ দূরবীনে দেখতে পাওয়া যায়। এই গুচ্ছটি অতি প্রাচীন, বোধহয় নক্ষত্র সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে এর জন্ম। গুচ্ছটি ছায়াপথ বিশ্বের কেন্দ্রীয় উত্তল সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়, ছায়াপথ বিশ্বের বেষ্টকে (Halo) অবস্থিত। এ জন্যেই এর বর্তুলাকার এখনও অব্যাহত আছে। যেসব প্রাচীন তারকা-গুচ্ছ ছায়াপথের উত্তল সীমানার মধ্যে অবস্থিত, তাদের ভ্রমণকক্ষ অন্যান্য বহু নক্ষত্রের সান্নিধ্য দিয়ে। তার ফলে পারস্পরিক আকর্ষণে বর্তুলের অনেক নক্ষত্র যূথচ্যুত হয়ে গেছে, বর্তুলাকৃতিও ভেঙ্গে গেছে। বর্তুলাকার গুচ্ছের মধ্যে অনেক যুগল নক্ষত্র আছে। আবার বর্তুল ভেঙ্গে যারা বেরিয়ে গেছে, তাদের মধ্যেও অনেকে দুটি, তিনটি বা আরও বেশী সংখ্যায় দল বেঁধে নিজেদের সংসার পেতেছে।

ক্রমাগত নক্ষত্র সৃষ্টির দরুণ বিশ্বের গ্যাসের পরিমাণও ক্রমে কমে যাচ্ছে। কাজেই আদিতে যেমন প্রকাণ্ড গ্যাসপিণ্ড সৃষ্ট হতো, পরবর্তীকালের গ্যাসপিণ্ড তার চেয়ে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর। পূর্বে যেমন লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের বর্ষণ হতো, পরে আর তেমন হচ্ছে না, হয়তো মাত্র শত শত নক্ষত্রের বর্ষণ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে খুব বড় তারকাগুচ্ছ সৃষ্ট হতে পারে না এবং পারিপার্শ্বিকে বহু নক্ষত্রের অবস্থান হেতু তারা গুচ্ছাবস্থায় দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না, অন্যদের আকর্ষণে দলচ্যুত হয়ে যায়। পারসিউস (Perseus) নক্ষত্রপুঞ্জের তারকাগুচ্ছটি সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। কৃত্তিকা (Pleiades) তারকাগুচ্ছটি দীর্ঘায়ু হলেও আর মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর পরে এই সুরম্য গুচ্ছটির অস্তিত্ব থাকবে কি না সন্দেহ। এই গুচ্ছের ৭।৮টি নক্ষত্র খালি চোখেই দেখা যায়, আমরা তাদের বলি সাত ভাই চম্পা ও তাদের বোন।

স্পন্দনশীল সেফাইড তারা
(Cepheid Variables)

যুগল নক্ষত্রে প্রভার পরিবর্তন ঘটে তার কারণ যুগলে একটি অপরটিকে কখনও আড়াল করে দাঁড়ায়, কখনও বা পাশাপাশি এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের একক অবস্থাতেই প্রভার সময়ানুগ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এগুলিকে স্পন্দনশীল নক্ষত্র (Variables) বলে। শিবী (Cepheus) নক্ষত্রপুঞ্জে ডেল্টা সেফাই (D.Cephei) নক্ষত্রটিতে প্রথম এই প্রভার পরিবর্তন লক্ষিত হয়, সে কারণে যে সকল নক্ষত্রে প্রভার সময়ানুগ পরিবর্তন ঘটে তাদের সকলকেই সেফাই জাতীয় স্পন্দনশীল নক্ষত্র (Cepheid Variables) বা সংক্ষেপে সেফাইড তারা বলা হয়। রাসেলের ছকে (H. R. Diagram) ডান দিকের উচ্চাংশ থেকে একটি সরলরেখা অবলম্বনে ক্রমে বাম দিকের উচ্চাংশ পর্যন্ত এদের স্থানাঙ্ক বিস্তৃত—এরা প্রধান পর্যায়ের (Main Sequence) নক্ষত্রদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসে মানুষের বুকের যেমন সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটে, সেফাইড তারাদের দেহেরও তেমনি সময়ানুবর্তী সঙ্কোচন-প্রসারণ হয়। এরা আয়তনে একবার বড় হচ্ছে, একবার ছোট হচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে এই নক্ষত্ররা যখন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তখন তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে এরা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর এই অতিরিক্ত তাপমাত্রার দরুণ প্রসারিত হলে, প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে এদের তাপমাত্রা কমে যায়,—সুতরাং নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। সময় ধরে পুনঃ পুনঃ ঠিক এমনি একবার উজ্জ্বল ও একবার নিষ্প্রভ হওয়াই এদের নৈসর্গিক বিধান। একবার উজ্জ্বল হয়ে পুনর্বার উজ্জ্বল হওয়ার সময়ের ব্যবধানকে স্পন্দনকাল (Period of Oscillation) বলে।

এই সকল নক্ষত্রদের স্পন্দনকালের ব্যাপ্তি সাধারণত কয়েক ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত। তার মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ দিন যাদের স্পন্দন-কাল তাদের সংখ্যাই বেশী। ডেল্টা সেফাইর স্পন্দনকাল ৫·৩৭ দিন। এছাড়া কতকগুলি সেফাইড তারার স্পন্দনকালের স্থিরতা নেই। কোনও নক্ষত্র হয়তো এক বছর পরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তারপরের বার উজ্জ্বল হলো এক বছরে নয়,—তার বেশী বা কম ব্যবধানে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয়কালে যে সব স্থানে লম্বন প্রণালী (Parallax) অবলম্বনের সুযোগ পান না, সে সব ক্ষেত্রে স্পন্দনশীল

সেফাইড তারাদের সাহায্যে দূরস্থিত নীহারিকাদি জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ধারণ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই দূরত্ব নির্ণয়ে সেফাইড তারাদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নেই।

আর. আর. লাইরা (R.R. Lyra), এস. ইউ. কাশ্যপী (S.U. Cassiopeia) আলফা আরসা মাইনর (A. Ursa Minor), ডেল্‌টা সেফাই (D. Cephei) প্রভৃতি কয়েকটি সেফাইড তারার নাম। এদের স্পন্দনকাল বিভিন্ন সময়ানুগ। মার (Mira Ceti) একটি সেফাইড তারা কিন্তু এর স্পন্দনকালের সময়ানুগ স্থিরতা নেই।

লাল দানব (Red Giant)

নক্ষত্রগণ জলন্ত গ্যাসপিণ্ড। সূর্যের চেয়ে ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র আছে, বৃহদাকার নক্ষত্রও আছে। কোন কোন নক্ষত্রের ভর সূর্যের অর্ধেক, কারও এক-চতুর্থাংশ, আবার কোন কোন নক্ষত্রের ভর সূর্যের তুলনায় দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, দশগুণ, কুড়িগুণ কিংবা তারও বেশী। ঔজ্জ্বল্যে সূর্যের তুলনায় কোন নক্ষত্র দশ, বিশ, শত, সহস্র কিংবা দশ সহস্রাধিক গুণ হতে পারে, আবার সূর্যের তুলনায় কোন নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য দশাংশ কিংবা শতাংশ হওয়া বিচিত্র নয়। সূর্যের পৃষ্ঠতাপ ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কোন কোন নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ ২০০০ ডিগ্রীর কম। পৃষ্ঠতাপ ১০০০০ ডিগ্রীর উপরে, এমন নক্ষত্রের অভাব নেই, পৃষ্ঠতাপ ২০০০০ ডিগ্রীর উপরে এমন নক্ষত্রও আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সূর্যের আয়তন, ভর, প্রভা, পৃষ্ঠতাপ ইত্যাদি উচ্চতম ও নিম্নতমের মাঝামাঝি অর্থাৎ সূর্য নিতান্তই একটি মধ্যবিত্ত নক্ষত্র। আকার, ঔজ্জ্বল্য, পৃষ্ঠতাপ, ভর প্রভৃতিতে যত প্রভেদই থাক সকল নক্ষত্রের ভিতরেই কেন্দ্রের তাপমাত্রা মোটামুটি দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

নক্ষত্রের গঠন-উপাদান প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস। মাধ্যাকর্ষণ ও আবর্তনের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে সেই গ্যাসরাশি জমাট বেঁধে আছে। কেন্দ্রের প্রায় দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে তথাকার হাইড্রোজেন তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে না, ভেঙ্গে যায়। এই ভাঙ্গনের নাম পারমাণবিক বিক্রিয়া (Nuclear reaction)। পারমাণবিক বিক্রিয়া হাইড্রোজেন গ্যাসকে হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত করে। এই রূপান্তরণকালে যে তেজ উৎপন্ন হয় সেই তেজই নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আংশিকভাবে বিকীর্ণ হয়,—যাকে আমাদের

ইন্দ্রিয়সমূহ তাপ আলোক প্রভৃতি রশ্মিরূপে গ্রহণ করে। আবার মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় এমন তেজোরশ্মিও ঐ একই পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে নক্ষত্র-পৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ হয়। দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিলিয়াম গ্যাসের আর কোন পরিবর্তন ঘটে না, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন জ্বালানীর ছাই হচ্ছে হিলিয়াম। কিন্তু নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটলে অধিকতর এমন তাপমাত্রাও সৃষ্টি হতে পারে যখন হিলিয়ামও রূপান্তরিত হয়ে লৌহ প্রভৃতি ভারী মৌল পদার্থের আণবিক গ্যাস উৎপন্ন হয়। সূর্য থেকে বিকীর্ণ তেজের পরিমাণ কল্পনাতীত বিরাট। সূর্য থেকে যত তেজ মাত্র এক সেকেণ্ডে নির্গত হয়, ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত ততটুকু মাত্রও সমগ্র মনুষ্যজাতি ভোগ করে উঠতে পারে নি।

সূর্য ও সময়াতন নক্ষত্রে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে এবং যে হারে পারমাণবিক বিক্রিয়া চলছে তাতে ঐ নক্ষত্রদের পরমায়ু দেড় হাজার কোটি বছর হিসেব করা হয়েছে। সূর্যের বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর সুতরাং এখনও আনুমানিক এক হাজার কোটি বছর বেঁচে থাকবে,—তবে ইতিমধ্যে তার অবস্থার নানারূপ পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা। সূর্যের হাইড্রোজেন ভাণ্ডারের সামান্য অংশই এযাবৎ হিলিয়ামে পরিণত হয়েছে।

নক্ষত্রদের অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন যত হিলিয়ামে পরিণত হয় ততই তারা আকারে স্ফীত হয়ে ওঠে। শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ হাইড্রোজেন যদি হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে নক্ষত্রের আকার প্রকাণ্ড বড় হয়ে যায়, তার দেহের ঘনত্ব কমে এবং সে কারণে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে নক্ষত্রটি দেখতে লালবর্ণ হয়। নক্ষত্র তখন আকৃতিতে বিরাট ও বর্ণে লাল—এজন্যে এদের নামকরণ হয়েছে লাল দানব (Red Giant)। প্রতি ঘনফুটে এদের ঔজ্জ্বল্য কমলেও এদের দেহ এত বিরাট যে, সেই সম্পূর্ণ আয়তনের মোট দীপ্তির মাত্রা অসাধারণরূপে বেশী। হাইড্রোজেন ভাণ্ডার নিঃশেষ করে লাল দানবরা তাদের পরমায়ু প্রায় শেষ করে এনেছে।

লাল দানবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা (Antares), ব্রহ্মহৃদয় (Capella) প্রভৃতি নক্ষত্র বিখ্যাত।

নোভা (Novae) বা নবতারা, অতিনোভা (Super Novae) ও শ্বেতবামন (White Dwarf)

কতকগুলি নক্ষত্র আছে, যারা আকারে সুবিপুল—ইংরেজীতে তাদের বলে Super Giant অর্থাৎ মহাদানব। সূর্যের তুলনায় এরা অনেক বড়। সূর্যের চেয়ে দশগুণ বেশী উপাদানে গঠিত একটি নক্ষত্র সূর্যাপেক্ষা এক হাজার গুণ বেশী উজ্জ্বল হবে। এর কারণ এরা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী, অতিদ্রুত এরা নিজেদের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার নিঃশেষ করতে থাকে। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় সূর্যের মধ্যে যে হারে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়, এদের মধ্যে সে হার অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে এদের দেহাভ্যন্তরের বিরাট পরিমাণ হাইড্রোজেন মাত্র আনুমানিক এক কোটি বছরেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে এদের অবস্থা কি দাঁড়ায়?

হাইড্রোজেনের অভাবে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তখন আর তেজোরশ্মি সৃষ্ট হয় না অথচ পৃষ্ঠদেশ থেকে তাপ ও আলোকরূপে তেজোরশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হতে থাকে। এই ক্ষতিপূরণের জন্যে নক্ষত্র আকারে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে, তার উপরিভাগ কেন্দ্রের দিকে ধ্বসে পড়ে। ধ্বসে পড়বার দরুন কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বহির্ভাগে তেজের নিষ্ক্রমণ বা বিকিরণও বাড়ে। কাজেই হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে এইসব মহাদানব প্রথম অবস্থায় শীতল না হয়ে বরং অধিকতর উত্তপ্ত হয়। অর্থাৎ ঘটনাটা পুঁজি ভেঙ্গে ঠাট বজায় রাখবার মতো। কিন্তু এমন অবস্থা কতকাল চলতে পারে? নক্ষত্রের আবর্তন ছিল, দেহপিণ্ড সঙ্কুচিত হলে আবর্তনের বেগ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত আবর্তন বেগের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে, নক্ষত্র ভেঙ্গে যায়।

ভাঙ্গনের প্রণালীটি এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য। দ্রুত আর্তনের ফলে ধ্বসে পড়া মহাদানব নক্ষত্রটির দেহ থেকে পৃথিবীর সমায়তন এক একটি গোলা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়, যার গতিবেগ হয়তো ঘণ্টায় পঞ্চাশ লক্ষ মাইল। গোলাটি বেরিয়ে যাবার ফলে নক্ষত্রের অত্যুত্তপ্ত অভ্যন্তরভাগ সাময়িকভাবে অনাবৃত হয়ে পড়ে এবং তখন নক্ষটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একেই নোভা (Novae) বা নবতারা বলেন, যদিও নবতারা নামটি এদের পক্ষে একেবারেই বেমানান। নবতারায় পরিণত হলে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য কয়েক লক্ষ গুণ বেড়ে যায়—তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে নোভা পারসিয়াই, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নোভা একুইলে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নোভা সিগ্নাই প্রভৃতি নবতারাগণ আকাশকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। মাস কয়েকের মধ্যেই তারা আবার নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রতি বছর মহাকাশে প্রায় কুড়িটি নবতারা বা নোভার সন্ধান পান।

ধ্বসে পড়া এবং আবর্তনের দরুণ মহাদানব নক্ষত্রগণ ভেঙ্গে নবতারায় পরিণত না হলে, তারা যত অধিকতর ক্ষুদ্রাকার হতে থাকে তাদের আভ্যন্তরীণ তাপ তত বাড়ে। তাপমাত্রা যখন আরও শতগুণ বৃদ্ধি পায় পারমাণবিক বিক্রিয়ায় হিলিয়াম তখন লৌহ প্রভৃতি ভারী মৌল পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকে। ধ্বসে পড়া প্রক্রিয়া যদি অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং আবর্তনবেগে যদি নক্ষত্রটি তখনও ভেঙ্গে না গিয়ে অধিকতর সঙ্কুচিত হয় তাহলে নক্ষত্রের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রলয়ঙ্কর একটি মাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমন ব্যাপার ঘটবার পূর্বে মহাদানব নক্ষত্রটির আকার প্রায় পৃথিবীর সমান হয়ে পড়ে। তখন তার দেহ থেকে একটি দিয়াশালাই-ভর্তি বস্তু নিলে তার ওজন দাঁড়াবে এক হাজার টন। এর দেহপৃষ্ঠ থেকে তখন রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) বিকীর্ণ হতে থাকে এবং আবর্তন বেগ তখন ঘণ্টায় এক কোটি মাইল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণটির ব্যাপ্তিকাল বড় জোর এক মিনিট। মহাদানব নক্ষত্রের এইরূপ পরিণতি ঘটলে তাকে অতিনোভা (Super Novae) বা অমিততেজী নবতারা বলে।

এমন একটি বিস্ফোরণের কাছাকাছি থাকলে তাপমাত্রার আধিক্যহেতু পৃথিবী লয় পেয়ে অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যাবে। বস্তুত এই ধরণের বিস্ফোরণ থেকে যেসব পদার্থ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তা ধূলিকণারূপে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে গ্যাস-সমুদ্রে দেখা যায়। পৃথিবীর গঠন-উপাদানের এক অংশ এইসব ধূলিকণা।

বিস্ফোরণের পর নক্ষত্রটির সকল বস্তুই যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তা নয়। দেহটির এক দশমাংশ বস্তু সম্ভবত তখন পিণ্ডাকারে অবশিষ্ট থেকে যায়। পিণ্ডটি আকারে ছোট কিন্তু তার ঘনত্ব অসামান্য। নক্ষত্রের এই টুকরোটি এবার শীতল হতে থাকে, বর্ণ নীল থেকে সাদায় গিয়ে উপস্থিত হয়। বর্ণে সাদা এবং আকারে ছোট বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

এদের শ্বেতবামন (White Dwarf) বলে আখ্যা দিয়েছেন। লুব্ধক যুগলের সিরিউস-বি একটি শ্বেত বামন। প্রশ্বার সহচরও শ্বেত বামন।

চীন দেশের পুঁথিতে ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে একটি নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ইতিবৃত্ত আছে। আকাশের সেই অংশে আছে ক্র্যাব নেবুলা (Crab Nebulae)। বিজ্ঞানীদের অনুমান কোনও নক্ষত্রের অতিনোভার রূপান্তরণের ফলে ঐ ক্র্যাব নেবুলার জন্ম। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ডেনিশ বিজ্ঞানী টাইকোব্রাহে কর্তৃক আবিষ্কৃত নোভা কাশ্যপীর বিস্ফোরণ এবং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কেপ্‌লার কর্তৃক আবিষ্কৃত নোভা ওফিউথির বিস্ফোরণ আমাদের এই ছায়াপথ বিশ্বেই ঘটেছে। ছায়াপথ বিশ্বে এ জাতীয় বিস্ফোরণ গড়ে চার শতাব্দীতে মাত্র একটা ঘটে কিন্তু অন্যান্য দ্বীপ জগতের নক্ষত্রলোকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রতি বছরই দু-একটা নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের সন্ধান পান।

আমাদের সূর্য

এতো গেল বিরাটকায় নক্ষত্রের কথা। ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্রদের ভবিষ্যৎ কি ? সূর্যের কথাই ধরা যাক। সূর্য একটি মধ্যমাকৃতি তরুণ নক্ষত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে ; সূর্যের আনুমানিক পরমায়ু ১৫০০ কোটি বছর। তার মধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ; এখনও তার জীবনের এক হাজার কোটি বছর বাকী। অন্যান্য সকল নক্ষত্রের ন্যায় সূর্যের কেন্দ্রেও পারমাণবিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামে পরিবর্তিত হয়। এখন পর্যন্ত হাইড্রোজেনের সামান্যই খরচ হয়েছে। সূর্যের ভিতরে হাই-ড্রোজেন-ভাণ্ডার কমে গিয়ে যত হিলিয়াম সৃষ্টি হতে থাকবে সূর্যের তাপ ও দীপ্তি তত বাড়তে থাকবে। তার ফলে পৃথিবীর সমুদ্রও একদিন টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করবে। হাইড্রোজেন ভাণ্ডার যত ক্ষয় পাবে সূর্যের দেহ তত স্ফীত হয়ে উঠবে। স্ফীতির হার প্রথমে কিছুটা ধীর, পরে অত্যন্ত দ্রুত হয়ে বুধ, শুক্র এবং হয়তো বা পৃথিবীর কক্ষপথকে গ্রাস করে ফেলবে সুতরাং তখন তার গ্রহদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে হয়তো কেবল মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। অবশেষে সূর্যের আভ্যন্তরীণ জ্বালানী অর্থাৎ হাইড্রোজেন-ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেলে তার সঙ্কোচন সুরু হবে। বিস্ফারিত অবস্থায় সূর্যের বর্ণ দাঁড়িয়েছিল মৃদু লাল, এখন ক্রমিক অধিকতর সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে তার রং হবে ঘোর লাল, সাদা ও পরে

নীল। এ সময়ে সূর্যের ভিতরে এমন একটা বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হবে যে, তার দেহপৃষ্ঠ কেন্দ্রের দিকে ধ্বসে পড়তে পারবে না। সুতরাং মহাদানব নক্ষত্রদের মতো কোন বিস্ফোরণও ঘটবে না।

তেজের উৎপত্তি হচ্ছে না অথচ তেজ বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—এ অবস্থায় সূর্য ক্রমে শীতল হতে থাকবে। ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের উজ্জ্বল নীল রং শ্বেতবর্ণে পর্যবসিত হবে এবং তখন এই সূর্যই শ্বেত-বামনের রূপ ধরবে।

সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের নক্ষত্রদের এই একই পরিণতি। কিছুকাল শ্বেতবামন অবস্থায় থেকে সূর্য একদিন একেবারে নিভে যাবে। বৃদ্ধ সূর্য তখন কৃষ্ণবামন রূপে তার অবশিষ্ট সৌরজগৎ নিয়ে নিজের নির্দিষ্ট পথে বিশ্ব পরিক্রমা করবে। নৈসর্গিক বিধানে এই তার ভাগ্যলিপি,—বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

হারস্প্রাঙ রাসেলের ছক

সকল নক্ষত্র এক রকম নয়। কোন কোন নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে বেশী আলোক বিকিরণ করে, কোন কোন নক্ষত্র কম। তাদের তাপমাত্রাও সূর্যের তুলনায় কারও বেশী, কারও কম। নক্ষত্রদের বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নক্ষত্রের রং কোনটা লাল, কোনটা হল্‌দে, কোনটা সাদা, কোনটা নীলাভ। রং দেখেই নক্ষত্রের পৃষ্ঠের তাপ-মাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। সাধারণত লাল নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ কম। পৃষ্ঠতাপ যত বেশী নক্ষত্রের রংও তদনুযায়ী ক্রমে হল্‌দে, সাদা ও নীলাভ হয়ে ওঠে। নক্ষত্রের রং দেখে তাপমাত্রার ধারণা মোটামুটি শুদ্ধ হলেও রং দেখে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য স্থির করা নির্ভুল নাও হতে পারে। নক্ষত্রদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ও সূর্যের তুলনায় তাদের ঔজ্জ্বল্য কত গুণ
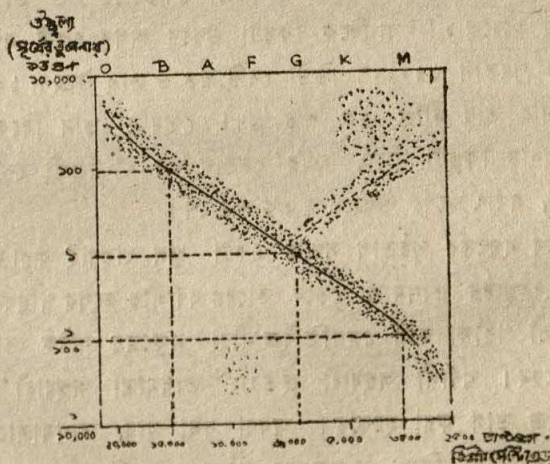
চিত্র-৪৩—হারস্প্রাঙ রাসেলের ছক

বেশী বা কম, এসবের পরিমাপ দূরবীক্ষণ, বর্ণালীবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব।

বিশেষ একটি ছকের সাহায্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের তুলনামূলক বিবরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। ৪৩ নং চিত্রের মতো X-অক্ষে ডানপাশের দিকে নক্ষত্রদের ক্রম-নিম্নগ তাপমাত্রার অঙ্ক এবং Y-অক্ষে উপরের দিকে সূর্যের তুলনায় তাদের ঔজ্জ্বল্যের গুণিতক বসিয়ে নেয়া হয়। নক্ষত্রদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ঔজ্জ্বল্যের স্থানাঙ্ক বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করলে দেখা যায়, বিন্দুগুলি ডান প্রান্তের নিম্নাংশ থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে বাম দিকের উপরের প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ অঙ্কিত ছকে দেখা যাবে, স্থানাঙ্ক বিন্দুগুলি একটি নাতিস্থূল রেখা অবলম্বনে ডান থেকে বামে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। প্রতি বিন্দুই একটি নক্ষত্রের পরিচায়ক। অসংখ্য নক্ষত্রের তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপ করা হয়েছে, কাজেই তাদের স্থানাঙ্ক নির্দেশক বিন্দুও সংখ্যাতীত। ছকে বা-দিকের উপর থেকে ডান দিকের নীচ পর্যন্ত বিন্দুসমূহ দ্বারা যে নক্ষত্রগুলি নির্দিষ্ট হলো এদের প্রধান পর্যায়ের (Main Sequence) নক্ষত্র বলা হয়। এই ছক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, যে-নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যত বেশী সে-নক্ষত্র তত বেশী উজ্জ্বল এবং যে-নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ যত কম তার দীপ্তিও তত কম। চিত্রে দেখা যাচ্ছে সূর্যের পৃষ্ঠতাপ ৬০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও তার ঔজ্জ্বল্য ধরে নেওয়া হয়েছে ১। বা-দিকে কিছুটা উপরে অপর একটি নক্ষত্রে দেখা যাচ্ছে তার পৃষ্ঠতাপ ১৫০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও তার ঔজ্জ্বল্য ১০০, অর্থাৎ সূর্যের তুলনায় তার দীপ্তি এক শত গুণ। তেমনি ডান দিকের একটি নক্ষত্রের স্থানাঙ্ক কিছুটা নীচে, তার পৃষ্ঠতাপ ৩৫০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও ঔজ্জ্বল্য $\frac{১}{১০০}$ অর্থাৎ সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের এক-শতাংশ।

রং দেখে নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণাই করা যায় মাত্র। নক্ষত্রদের দেহপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ভেদে তাদের বর্ণালীর রূপের পরিবর্তন ঘটে। এজন্যে বর্ণালী পরীক্ষা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের সঠিক তাপমাত্রাটি জানতে পারেন। বর্ণালী অনুযায়ী সুতরাং তাপমাত্রা অনুযায়ী নক্ষত্রদের দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অথবা বলা যায়, তাপমাত্রাকে দশটি গণ্ডীতে ভাগ করে নিয়ে যে-নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ যে-বিভাগে পড়ে, তাকে সেই গণ্ডীর বা বিভাগের নক্ষত্র বলা হয়।

OBAFGKMRNS—এই দশটি ইংরেজী অক্ষর দিয়ে দশটি বিভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব নক্ষত্ররাও এই দশ অক্ষরের দশটি শ্রেণীতে

বিভক্ত। যেমন, সবচেয়ে উত্তপ্ত নক্ষত্রগুলি O শ্রেণীর অন্তর্গত, তার চেয়ে কম উত্তপ্ত নক্ষত্রদের শ্রেণীর নাম B, তার চেয়ে কম A, এইরূপে সব চেয়ে কম তাপের নক্ষত্র S বিভাগে পড়ে। আমাদের সূর্য G শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অক্ষরগুলি ধারাবাহিকভাবে মনে রাখা সহজ নয়, তাই স্মৃতির সহায় স্বরূপ অক্ষরগুলি দিয়ে একটি ছড়া বানানো হয়েছে— O Be A Fine Girl Kiss Me Right Now Sweetheart। ছড়ার প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরই বিভাগ সমূহের পরিচয়।

নক্ষত্রের তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের সম্বন্ধ নির্ণায়ক এই ছক সর্বাগ্রে অঙ্কন করেন হারস্প্রাঙ ও রাসেল (Hertzsprung & Russell) নামক দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাই তাঁদের নাম অনুসারেই এই ছকের নাম Hertzsprung Russell Diagram। অনেকে সংক্ষেপে বলেন Russell Diagram বা রাসেলের ছক।

নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপ যত বেশী তার ঔজ্জ্বল্যও তত বেশী—এই ক্রম যে সকল নক্ষত্রে বর্তমান, রাসেলের ছকে তাদের প্রধান পর্যায়ের (Main Sequence) নক্ষত্র বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা খুবই কম কিন্তু ঔজ্জ্বল্য অতিশয় বেশী। নিয়মানুযায়ী রাসেলের ছকে ডান দিকের উপরের কোণের নিকটে এদের স্থানাঙ্ক। এরা বিরাটায়তন, দেখতে লাল, তাই নাম লাল দানব (Red Giant)। জ্যেষ্ঠা (Antares), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), স্পন্দনশীল শিবি নক্ষত্রগণ (Cepheid Variables) এরা সকলেই লাল দানব। জ্যেষ্ঠার ব্যাস ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল—অর্থাৎ সূর্যের প্রায় ৪৫০ গুণ। এর দেহপৃষ্ঠের এক বর্গ ইঞ্চি আয়তক্ষেত্র থেকে বিকীর্ণ আলোক খুবই ম্লান কিন্তু বিরাট দেহের সম্মিলিত আলোকের দরুণই এর এত ঔজ্জ্বল্য। সকল লাল দানব সম্পর্কেই বলা চলে যে, তাদের প্রতি বর্গ ইঞ্চির আলোক অত্যন্ত অনুজ্জ্বল হলেও বিশালায়তন দেহের সম্মিলিত আলোক তাদের এত দীপ্তিশালী করেছে।

অপর কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী কিন্তু ঔজ্জ্বল্য নিতান্তই কম। রাসেলের ছকে এদের স্থানাঙ্ক স্বভাবতই বাম ভাগে নিম্ন কোণে। এদের শ্বেতবামন (White Dwarf) বলা হয়। লুব্ধক যুগলের অন্যতমটি (Sirius B) এই জাতীয়। প্রশ্বা (Procyon)

যুগলের একটিও এই পর্যায়ে পড়ে। শ্বেত বামনরা আকারে ক্ষুদ্র। লুব্ধক যুগলের ছোটটির (Sirius B) ব্যাস মাত্র ২০০০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা খুব বেশী বড় নয় কিন্তু ওজনে বিরাট। এই নক্ষত্রদের ওজন এত বেশী হতে পারে যে, এদের দেহপদার্থ একটা দিয়াশালাই বাক্সে ভরতি করলে তার ওজন স্বচ্ছন্দে এক টন হয়ে যাবে।

নক্ষত্রের ওজনের সঙ্গে তার ঔজ্জ্বল্যের সম্পর্ক পরীক্ষা করে স্যার আর্থার এডিংটন বলেছেন—ভর বা বস্তুমান যত বেশী হয় নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য তত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সূর্যের সমজাতীয় একটি নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে দশ গুণ ভারী হলে তার দীপ্তি হবে সূর্যের এক হাজার (১০০০) গুণ। লুব্ধকের ওজন সূর্যের প্রায় আড়াই গুণ কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য সূর্যের প্রায় ছাব্বিশ (২৬) গুণ। তেমনি আবার, কোনও ম্লান নক্ষত্র—যার ভর সূর্যের দশ ভাগের এক ভাগ তার দীপ্তি হবে সূর্যের এক হাজার ভাগের এক ভাগ (·০০১)। নাক্ষত্রিক ভর ও তার ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে এডিংটনের এই সূত্রটি শুধু প্রধান পর্যায়ের নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

নক্ষত্রদের জীবন বিশ্লেষণে ও পর্যালোচনায় রাসেলের ছক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষে অপরিহার্য। জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয়েও রাসেলের ছক অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সুদূর জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয়

মহাকাশে অবস্থিত সুদূরের জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে লম্বন প্রণালী (Parallax) অবলম্বনে কিংবা ত্রিকোণমিতির সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সেজন্যে ঐ সকল নক্ষত্র ও নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয়ে তাদের দীপ্তি পর্যবেক্ষণই একমাত্র উপায়।

দীপ্তির পরিমাপ

একই জাতীয় একই দীপ্তিসম্পন্ন দুটি প্রদীপের একটি কাছে ও অপরটি দূরে রাখলে, দূরেরটিকে কাছেরটি অপেক্ষা ম্লান দেখায়। দূরেরটিকে আরও দূরে নিলে দীপ্তি আরও ক্ষীণ হয়। অতএব এই ব্যাপারটি যিনি লক্ষ্য করেছেন তিনি বলতে পারেন, প্রদীপের দূরত্ব ও তার দৃশ্যমান দীপ্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটিকে পরীক্ষা করা হয়েছে। অঙ্কের ভাষায় সেটি লেখা হয় $I \propto \frac{1}{d^2}$। এখানে I মানে দীপ্তিমাত্রা, d মানে আলোকের উৎস অর্থাৎ দীপকের দূরত্ব। তাহলে অঙ্কটার মানে হলো, দীপকের দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতে (Inverse variation) তার দীপ্তিমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। যে কোন প্রকার আলোকের উৎস সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রযোজ্য, তা সে মোমবাতি, কেরোসিন প্রদীপ, ইলেকট্রিক বাতি, নক্ষত্র বা অন্য যা কিছুই হোক না কেন, শুধু সমজাতীয় ও সমদীপ্তি সম্পন্ন হলেই হলো।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ক ও খ দুটি সমজাতীয় নক্ষত্র, তাদের আয়তন এবং ভরও সমান। কিন্তু ক থেকে যে পরিমাণ আলো আমরা পাচ্ছি, খ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। দুই নক্ষত্রই সমজাতীয়, সমভর ও সমায়তন, অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, দুটি থেকেই সমপরিমাণ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে অর্থাৎ উভয় নক্ষত্রই সমদীপ্তিসম্পন্ন।

কিন্তু ক অপেক্ষা খ দূরে বলেই তার আলো এত ক্ষীণ দেখতে পাই। উপরের অঙ্ক অনুসারে খ-এর দূরত্ব ক-এর দূরত্বের $\sqrt{১০০০০}$ বা ১০০ গুণ হবে। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে ক-এর দূরত্ব যদি ৪ আলোক-বর্ষ হয়, খ-এর দূরত্ব হবে ৪০০ আলোকবর্ষ।

আবার দূরত্ব জানা থাকলেও নক্ষত্রের দীপ্তির পরিমাণ ঐ অঙ্ক থেকেই হিসেব করে নেয়া যেতে পারে। যেমন, সর্বতোভাবে সূর্যের অনুরূপ একটি নক্ষত্র আছে সূর্যের দূরত্বের এক হাজার গুণ দূরে। তাহলে সূর্য থেকে যে পরিমাণ আলো আমরা পাই ঐ নক্ষত্র থেকে পাবো তার $\frac{১}{১০০০^২}$ অর্থাৎ দশ লক্ষ ভাগের একভাগ। সূর্য যদি বর্তমানের তুলনায় এক হাজার গুণ দূরে থাকতো তার প্রকৃত দীপ্তি বর্তমানের অনুরূপ হলেও আমাদের কাছে তার আপাত দীপ্তি হতো বর্তমানের দশলক্ষ ভাগের একভাগ।

সেফাইড পর্যবেক্ষণ

নক্ষত্র অধ্যায়ে বলা হয়েছে, কতকগুলি যুগল নক্ষত্রে প্রভার পরিবর্তন লক্ষিত হয়। প্রভার এই পরিবর্তনের কারণ প্রদক্ষিণের ফলে যুগলের একটি অপরটিকে কখনও আড়াল করে দাঁড়ায়, কখনও বা পাশাপাশি এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের একক অবস্থাতেই প্রভার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এগুলিকে পরিবর্তনশীল (Variable) নক্ষত্র বলা হয়।

উত্তর আকাশে শিবী (Cepheus) নক্ষত্রপুঞ্জের চতুর্থ তারকা ডেল্টা সেফাই নক্ষত্রটিতে প্রথম ঐ প্রকার প্রভার পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং সে পরিবর্তন সময়ানুবর্তী। এই কারণে যে সকল নক্ষত্রে প্রভার ঐরূপ সময়ানুগ পরিবর্তন ঘটে তাদের সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করে নাম দেওয়া হয়েছে সেফাইড-জাতীয় স্পন্দনশীল নক্ষত্র বা সংক্ষেপে সেফাইড তারা।

শ্বাস-প্রশ্বাসে মানুষের বুকের যেমন সঙ্কোচন-প্রসারণ হয়, সেফাইড তারাদের দেহেরও তেমনি সময়ানুগ সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটে এবং তার ফলে তারা একবার উজ্জ্বল ও একবার নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এই ঔজ্জ্বল্য ও নিষ্প্রভতার আবর্তন চলে নির্দিষ্ট সময়ের পরিমাপে। একবার উজ্জ্বল হয়ে পুনর্বার উজ্জ্বল হওয়ার সময়ের ব্যবধানকে স্পন্দনকাল (Period of oscillation) বলা হয়।

আকাশে বহু সেফাইড তারা আছে কিন্তু তাদের স্পন্দনকাল সকলের

সমান নয়। এইসব নক্ষত্রদের স্পন্দনকাল কারও কারও কয়েক ঘণ্টা মাত্র, অনেকের কয়েক দিন, আবার কতকগুলির কয়েক সপ্তাহ। ধরা যেতে পারে সেফাইড নক্ষত্রদের স্পন্দনকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে। তার মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ দিন যাদের স্পন্দনকাল তাদের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত বেশী। ডেল্টা সেফাইর স্পন্দনকলে ৫·৩৭ দিন।

সেফাইড নক্ষত্রদের সম্বন্ধে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তথ্যটি এই যে, দুটি সেফাইড তারা সমান উজ্জ্বল হলে তাদের স্পন্দনকালও সমান এবং যে সেফাইড যত বেশী উজ্জ্বল তার স্পন্দনকাল তত বেশী।

স্পন্দনকাল যাদের ৭ দিন সে সব সেফাইড তারা সূর্যের চেয়ে ২৮০০ গুণ বেশী উজ্জ্বল, স্পন্দনকাল যাদের ১০ দিন তাদের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ৪০০০ গুণ।

এই মূল্যবান আবিষ্কারের সাহায্যে বহু পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের এবং সেফাইড তারাসমন্বিত সুদূরের নীহারিকাদের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টান্ত, একটি নক্ষত্রের স্পন্দনকাল দেখা গেল ৫⅓ দিন। নক্ষত্রটির স্পন্দনকাল ডেল্টা সেফাইর সমান সুতরাং ধরে নেয়া যায় এর ঔজ্জ্বল্যও ডেল্টা সেফাইর সমান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রটির আপাত ঔজ্জ্বল্য ডেল্টা সেফাইর ষোল ভাগের একভাগ। আপাত ঔজ্জ্বল্য এত কম তার কারণ নিশ্চয়ই নক্ষত্রটি দূরে অবস্থিত। কত দূরে? আগেই বলা হয়েছে দীপকের দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতে তার দীপ্তিমাত্রার পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ $I \propto \frac{1}{d^2}$। তাহলেই নক্ষত্রটি ডেল্টা সেফাইর দূরত্বের চারগুণ দূরে অবস্থিত আছে। এইরূপ দশগুণ দূরত্ব থেকে নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য দেখা যেত একশত ভাগের এক ভাগ।

মেগাল্যানিক মেঘমালা, অ্যাণ্ড্রোমেডা দ্বীপজগৎ ও অন্যান্য বিশ্ব প্রভৃতিতেও সেফাইড নক্ষত্র আছে, পৃথিবীর দূরবীনে দৃশ্যমান হয়। তাদের স্পন্দন কাল ও আপাত দীপ্তি পরীক্ষা করে ঐ সকল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণীত হয়েছে।

উনবিংশ অধ্যায়

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি

বেতার, তাপ, আলোক, অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি ও গামা রশ্মিকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি বলে। এদের মধ্যে কেবল তাপ ও আলোক মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্যগুলি নয়। বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচলনের বাহকরূপে যেমন ধাতব তার বা অপর কোনও পরিবাহকের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির স্থানান্তরণে তার প্রয়োজন নেই। স্বতঃসঞ্চারিত বলে এদের স্থানান্তরণকে বিকিরণ বলা হয়।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির বিকিরণ প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে। পর পর দুটি ঢেউয়ের চূড়ার মধ্যে যে ব্যবধান, তাকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক সহস্র মিটার থেকে এক সেন্টিমিটারের এক শত কোটি ভাগের এক ভাগের চেয়েও ক্ষুদ্রতর হতে পারে। তরঙ্গগুলিকে পর পর সাজিয়ে সুরু থেকে কয়েকটি সীমায় ভাগ করে নিলে এক-এক ভাগে এক-এক জাতীয় রশ্মির বিকিরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘতম তরঙ্গের দিক থেকে আরম্ভ করলে প্রথম ভাগে বেতার, দ্বিতীয় ভাগে অবলোহিত, তৃতীয় ভাগে আলোক, চতুর্থ ভাগে অতিবেগুনী, পঞ্চম ভাগে রঞ্জন রশ্মি এবং ষষ্ঠ ভাগে গামা রশ্মি।

রশ্মিসমূহের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ক্ষুদ্র, তারা তত শক্তিশালী। গামা রশ্মি মানুষের পক্ষে মারাত্মক। বেতার রশ্মি নিরীহ, মানুষের পক্ষে মোটেই বিপজ্জনক নয়। নিম্নে বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা দেওয়া হলো।

রশ্মির শ্রেণী-বিভাগ	তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য
বেতার রশ্মি (Radio)	কয়েক সহস্র মিটার থেকে আরম্ভ করে এক সেন্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ।
অবলোহিত রশ্মি (Infra-red)	এক সেন্টিমিটারের দশমাংশ থেকে আরম্ভ করে এক লক্ষ ভাগের আট ভাগ, অর্থাৎ $১০^{-১}$ থেকে ৮×১০^{-৫} সেন্টিমিটার।

আলোক রশ্মি (Light)	সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের আট ভাগ থেকে আরম্ভ করে এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ, অর্থাৎ ৮×১০^{-৫} থেকে ৪×১০^{-৫} সেন্টিমিটার।
অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet)	সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ থেকে আরম্ভ করে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ৪×১০^{-৫} থেকে $১০^{-৬}$ সেন্টিমিটার।
রঞ্জন রশ্মি (X-rays)	সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ থেকে আরম্ভ করে একশত কোটি ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ $১০^{-৬}$ থেকে $১০^{-৯}$ সেন্টিমিটার।
গামা রশ্মি (γ-rays)	সেন্টিমিটারের এক শত কোটি ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

মহাকাশে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের অত্যধিক তাপমাত্রার দরুণ ও অন্যান্য কারণে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে তাদের অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উক্ত রশ্মিসমূহের বিকিরণ হয়। এদের মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর অভিমুখে আসে, তাদের অধিকাংশই পৃথিবীর
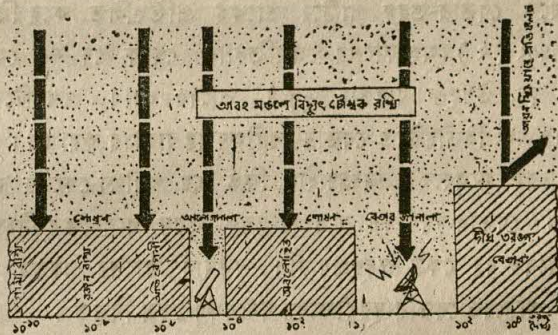
চিত্র-৪৪

আলো-জানালা ও বেতার-জানালা

আবহমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে না, আবহমণ্ডল ক্ষুদ্র তরঙ্গ-গুলিকে শোষণ করে নেয়, বৃহৎ তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারের উপর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। সুতরাং সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র আবহমণ্ডলের ভিতর দিয়ে এসে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে। এই ভগ্নাংশ হচ্ছে

বেতার-তরঙ্গের কিয়দংশ ও আলোক-তরঙ্গের সম্পূর্ণাংশ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর আবহমণ্ডল-রূপ কম্বলের আবরণে দুটি ফাঁক বা জানালা আছে। একটি জানালা দিয়ে ভূপৃষ্ঠে কিছু বেতার-রশ্মি আসে এবং অন্য জানালা দিয়ে ভূপৃষ্ঠ পায় আলোক রশ্মি (চিত্র-৪৪)। যে সব বেতার-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার থেকে আরম্ভ করে ১০ মিটার সাধারণত তাদের ধরেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে মহাকাশে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের নাম বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান (Radio Astronomy)। ইতিপূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে জ্যোতিষ-চর্চার প্রধান অবলম্বন ছিল দর্শনেন্দ্রিয় এবং দৃষ্টিশক্তিসহায়ক যন্ত্রপাতি। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত আধুনিক কালে। ১৯৩২ সালে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ইয়ান্স্কী ভূপৃষ্ঠে মহাকাশের বেতার-তরঙ্গের সন্ধান পান। তারপর থেকে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় সুকৌশলে মহাকাশের বেতার-তরঙ্গ ধরে ও বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

মহাকাশ পর্যবেক্ষণে বেতার-তরঙ্গ দুই প্রণালীতে নিয়োজিত হয়—(১) ভূপৃষ্ঠ থেকে বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে তাকেই প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা; এবং (২) মহাকাশের জ্যোতিষ্কাদি থেকে যে সব বেতার-তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থায় ভূপৃষ্ঠে তাদের ধরা। প্রথমটিতে রেডার নামক যন্ত্র এবং দ্বিতীয়টিতে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। রেডারের বেতার-তরঙ্গ গবেষকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু এর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বেশী দূর নয়। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে আগন্তুক তরঙ্গ গবেষকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, কিন্তু পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী। বর্তমান কালের বৃহত্তম দূরবীক্ষণের দৃষ্টিসীমা পেরিয়েও বেতার-দূরবীক্ষণের পর্যবেক্ষণ-ক্ষেত্র বিস্তৃত।

রেডার

ফাঁকা মাঠে বোমা ফাটালে অনতিদূরের চারতলা বাড়ীর দিক থেকে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। শব্দ বাতাসে তরঙ্গ তোলে। বাতাসে উত্থিত শব্দ-তরঙ্গ বাড়ীর দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে—সেটাই প্রতিধ্বনি। বাতাসে শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। ধরা যাক, বোমা ফাটানো ও তার প্রতিধ্বনি পাওয়ার মধ্যে

ছয় সেকেণ্ড সময়ের ব্যবধান। তাহলে শব্দের যাওয়া ও আসায় ৬ সেকেণ্ড সময় লেগেছে। অতএব বাড়ীর দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে শব্দ ৩ সেকেণ্ড সময় নিয়েছে। সুতরাং ঘটনাস্থল থেকে বাড়ীর দেয়ালের দূরত্ব ৩×১১২০ অর্থাৎ ৩৩৬০ ফুট।

একটি প্রদীপ জ্বালানো হলো—সঙ্গে সঙ্গে দূরের জিনিষটি দেখা গেল। জিনিষটি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে এল বলেই সেটা দেখা গেল। এক্ষেত্রেও আলোর যাতায়াতে যত অল্পই হোক, কিছুটা সময় লেগেছে। কিন্তু আলোর তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, অর্থাৎ এত দ্রুত যে, কিছুটা সময় যে লেগেছে, তা মোটে বোঝাই গেল না—অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া বোঝবার উপায়ও নেই। জিনিষটি থেকে প্রতিফলিত রশ্মি ফিরে আসতে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তা যদি পরিমাপ করা যেত, তবে তাথেকে হিসেব করেই প্রদীপ ও জিনিষটির মধ্যেকার দূরত্ব জানা যেত।

বেতার-তরঙ্গের সাহায্যেও অনুরূপভাবে পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। কৌশলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান। যুদ্ধের সময়ে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে অনুসন্ধান-কার্য চালানো হতো বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল Radio Detection And Ranging,—এরই সংক্ষিপ্ত নাম রেডার।

বেতার-তরঙ্গ অনেক বস্তু ভেদ করে যেতে পারে, আবার অনেক বস্তু তার গতি প্রতিহত করে দেয়। ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলে বেতার-তরঙ্গ যদি কোন পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হয়, তবে সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। আমরা জানি, বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল,—আলোর গতির সমান। সুতরাং কোন বেতার প্রেরক-যন্ত্র থেকে ধ্বনি পাঠাবার পর যদি সেখানেই আবার একটি বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে তবে বুঝতে হবে, তরঙ্গ কোথাও প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। তরঙ্গের যাতায়াতে যে সময় লেগেছে, তার অর্ধেক সময়ে তরঙ্গটি যতদূর ভ্রমণ করতে পারে, প্রতিঘাতকারী বস্তুটি ততদূরে রয়েছে। যেমন এখান থেকে একটি বেতার ধ্বনি পাঠানো হলো, '০০০৮ সেকেণ্ড পরে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। তাহলে প্রতিঘাতকারী বস্তুটি রয়েছে (১৮৬০০০×'০০০৮) ÷২ মাইল দূরে, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ (৭৪'৪) মাইল দূরে। এক্ষেত্রে সময়-পরিমাপক যন্ত্রে সময়ের ঐ ক্ষুদ্র

ভগ্নাংশও যাতে নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে, তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বেতার প্রেরক-যন্ত্র, গ্রাহক-যন্ত্র ও সময়-পরিমাপক যন্ত্রের একত্র বিন্যাসে রেডার যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

রেডারের গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ—

১। একটি বেতার প্রেরক-যন্ত্র (Transmitter)

২। একটি বেতার গ্রাহক-যন্ত্র (Receiver)

৩। একটি এরিয়েল (Aerial)

৪। একটি অসিলোস্কোপ (Oscilloscope)

প্রেরক-যন্ত্র থেকে দমকে দমকে অর্থাৎ ক্ষণকাল পর পর এরিয়েলের সাহায্যে বেতারধ্বনি উৎক্ষিপ্ত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে ঐ এরিয়েলের সাহায্যেই প্রতিধ্বনি গৃহীত হয়। ধ্বনি পাঠানো হয় সবিরাম, তাই প্রতিধ্বনিও আসে সবিরাম। তারই তালে তালে একটি সুইচের সাহায্যে এরিয়েলটিকে একবার শব্দ প্রেরণ এবং একবার শব্দ গ্রহণের কাজে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা আছে। অবতল ফ্রেম-এরিয়েলটিকে যে কোন নির্দিষ্ট দিকে ঘুরিয়ে নেবার ব্যবস্থাও আছে।

গ্রাহক-যন্ত্র একটি অসিলোস্কোপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ধ্বনি প্রেরণ-

চিত্র-৪৫
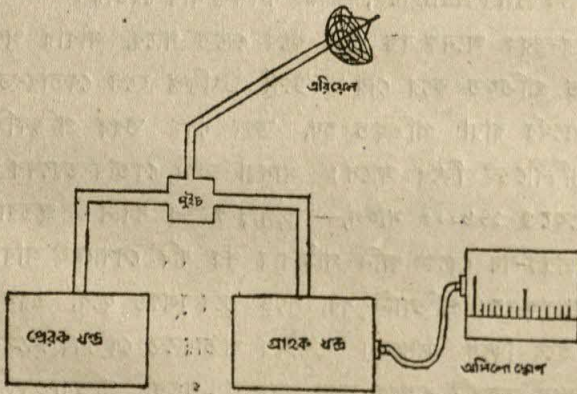
রেডারের গঠন-বিন্যাস

কালে অসিলোস্কোপের কাচের পর্দায় এক ধারে একটি দীর্ঘ আলোকরেখা খাড়াভাবে দণ্ডায়মান দেখা যায়। প্রতিধ্বনি এলে অপেক্ষাকৃত খাটো অন্য একটি

আলোক-রেখা ঐ কাচের পর্দায়ই কিছুটা দূরে এসে পড়ে। অসিলোস্কোপের স্কেলে দুই আলোক-রেখার ব্যবধান দেখে অতিক্রান্ত সময়ের পরিমাপ পাওয়া যায়। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থেকে কি করে দূরত্ব নির্ণীত হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুতঃ স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব এবং তা চলমান হলে তার গতিবেগ সঙ্গে সঙ্গেই জানা যায় (চিত্র-৪৫)।

রেডারের ওজন ও আয়তন যাতে খুব বেশী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এর প্রেরক-যন্ত্রটিকে বিশেষ শক্তিশালী করা হয়। লক্ষ্যবস্তু যদি বৃহদাকারের না হয় তবে বৃহৎ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের যথাযথ প্রতিফলন সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্যে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ রেডার থেকে উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা করা হয়। রেডারের হ্রস্ব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩ থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে।

বিমানপোতের গাত্র বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে দেয় বলে বিগত মহাযুদ্ধের সময় রেডারের সাহায্যে শত্রুপক্ষীয় বিমানের দূরত্ব নির্ণয় করে আগে থেকেই প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি পাকা করে নেওয়া হতো। বর্তমানে রেডারের ব্যবহার অসামরিক কাজেও খুব ছড়িয়ে পড়েছে। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রেডার এখন অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয়। সমুদ্রে ঘন কুয়াশায় দুই জাহাজের সংঘর্ষ নিবারণে রেডার অত্যাবশ্যক। আবহতত্ত্ববিদ্‌গণ রেডারের সাহায্য ঝড়-ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল ও গতিপথ নির্ধারণ করে আগে থেকেই নৌ ও বিমান বন্দরকে সাবধান করে দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকাশ পর্যবেক্ষণেও রেডারের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্কা আমরা রাত্রে দেখতে পাই তার উজ্জ্বল আলোর জন্যে। দিনের বেলায়ও অসংখ্য উল্কাপাত হয়ে থাকে এবং রেডারই তার সন্ধান দেয়। কণা পরিমাণ ক্ষুদ্র উল্কা যে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে, তার শক্তি এত কম যে, রেডারের গ্রাহক-যন্ত্রে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল উর্ধ্বে উল্কা যখন গতির তীব্রতার দরুণ জ্বলতে আরম্ভ করে, তখন উল্কার পরমাণু ও বায়ু থেকে ইলেকট্রন খসে যায়। নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন সংযোগে পরমাণু গঠিত। একটা পরমাণুতে যে কটা ইলেকট্রন আছে—সংঘর্ষ, তাপ বা অন্য কোন কারণে যদি সেই সীমিত সংখ্যক ইলেকট্রনের দুই-একটা খসে যায়, তাহলে পরমাণুটিকে আয়ন (Ion) বলে।

উল্কার ঐ তীব্রবেগে ভ্রমণকালে তার পরমাণু ও বায়ুকণা থেকে ইলেকট্রন খসে যায় বলে তার পশ্চাতের গতিপথের গ্যাসের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্যে থেকে যায় একটি ক্ষীণ আয়নক্ষেত্র। আয়নপূর্ণ ক্ষেত্রের বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা আছে। এই কারণে দিবাভাগেও উল্কাপাতের সংবাদ বেতারের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। উল্লিখিত আয়ন-ক্ষেত্র অল্পকাল স্থায়ী; কারণ আয়নগুলি অনতিবিলম্বে নিজেদের মধ্যে তেজঃকণার যোগ-বিয়োগের দ্বারা সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে। ১৯৪৭ সালে জোড্রেল ব্যাঙ্কে রেডারের সাহায্যে প্রতি মিনিটে উল্কাপাতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এই সময় থেকেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি স্থুরু।

ভূপৃষ্ঠে বসেই এখন রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিপথ, বেগ প্রভৃতি রেডারের দ্বারা নির্ণয় করা হচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহাদির মধ্যেও রেডার স্থাপন করে পৃথিবী ও বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

মেঘলোক ভেদ করে মানুষের দৃষ্টি এগোয় না, কিন্তু বেতার-তরঙ্গ মেঘলোক ভেদ করে যেতে পারে। তাই চোখের দৃষ্টি অপেক্ষা রেডারের তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বেশী এবং নির্ভরযোগ্য। রেডারের সাহায্যে চন্দ্রে ধ্বনি পাঠিয়ে আড়াই সেকেণ্ড পর তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে। এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, চন্দ্রের দূরত্ব পূর্বে যা নিরূপিত হয়েছিল, সে হিসেব নির্ভুল।

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র

১৯৩২ সালে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ইয়ান্স্কী ইয়ারফোনে (শব্দ শোনবার জন্যে যে যন্ত্র দুই কানে চেপে লাগাতে হয়) এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পান। অচিরেই জানা গেল, এই আওয়াজ কোন অজানা উৎস থেকে আগত এক বেতার-তরঙ্গ। এই উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে এমন এক বিশেষ ধরণের এরিয়েল ব্যবহার করা হলো, যা এককালে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ ধরতে পারে। একে একে আকাশের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেল—ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে সবচেয়ে জোরালো আওয়াজ পাওয়া যায়, অন্যত্র ক্ষীণতর। এর পরেই স্থুরু হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পালা। তাঁরা ওই ধরণের এরিয়েলের সঙ্গে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্র যোগ করে নিলেন। এরই নাম বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Radio Telescope)। বহির্বিশ্ব থেকে যে বেতার-তরঙ্গ এরিয়েলে ধরা

পড়ে, তা খুবই দুর্বল। বর্তমানে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সুবৃহৎ এরিয়েলের সঙ্গে যে গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং তারই মধ্যে দুর্বল বেতার-তরঙ্গকে জোরালো করবার ব্যবস্থা আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেরূপ আলোক-তরঙ্গ ধরে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়, বেতার-দূরবীক্ষণেও সেরূপ জ্যোতিষ্কদের দ্বারা বিকিরিত বেতার-তরঙ্গ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রতিফলিত আলোর দূরবীক্ষণের (Reflector) প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বনে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত। জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মি অবতল দর্পণে এসে পড়লে সেই সকল রশ্মি একত্রে প্রতিফলিত হয়ে দর্পণের ফোকাস বিন্দুতে গিয়ে জড়ো হয়। এক বিন্দুতে সম্মিলিত হবার ফলে দুর্বল রশ্মিগুলি যৌথ-ভাবে অনেক শক্তিসম্পন্ন হয়। এই ফোকাসে ফটোপ্লেট রেখে জ্যোতিষ্কের ছবি নেওয়া যেতে পারে কিংবা ত্রিকোণ-কাচ (Prism) রেখে জ্যোতিষ্কের আলোককে বিশ্লেষণ করে বর্ণালী পাওয়া যায়। জ্যোতিষ্কের আলো প্রতি-ফলিত করবার জন্যে এখানে দূরবীক্ষণের যেমন একখানা অবতল দর্পণের দরকার, জ্যোতিষ্কের বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের জন্যেও বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেরূপ একটি অবতল এরিয়েলের দরকার। চক্রাকার ফ্রেমে একটি ধাতুনির্মিত জাল গভীর অবতলভাবে লাগিয়ে নেওয়া হয়। এই জালই এরিয়েল। অবতল জালের ফোকাসে একটি ধাতব দণ্ড সংযোগ করা হয়। দণ্ডটিকে ওয়েভ গাইড (Wave Guide) বলে। সুদূর আকাশ থেকে ঐ এরিয়েলে যে সকল বেতার-তরঙ্গ এসে পতিত হয়, সেগুলি ওয়েভ গাইডে

চিত্র-৪৬—বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র

একত্র সম্মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিসম্পন্ন হয়। ওয়েভ গাইডটি বিশেষভাবে নির্মিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিসমন্বিত এক শক্তিশালী গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত (চিত্র-৪৬)। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে এখান থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণের

কাজ সুরু হয়। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণত এক সেন্টিমিটার থেকে দশ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ধরে আকাশে পর্যবেক্ষণ চালান।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে জ্যোতিষ্কগুলিকে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে গৃহীত তাদের আলোকচিত্র চাক্ষুষ দেখি। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে জ্যোতিষ্কের চেহারা চাক্ষুষ দেখা যায় না। জ্যোতিষ্ক থেকে বিকিরিত বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে কাগজের উপর রেখাঙ্কন করে। এই সকল রেখার বিশ্লেষণ করে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কের আয়তন, তাপমাত্রা ইত্যাদি জানতে পারেন। একেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে জ্যোতিষ্ক দেখা বলেন। যেমন—কাশ্যপী নক্ষত্রপুঞ্জে একটি বেতার-তারকা দেখা যায় কিংবা বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার-সূর্যকে চাক্ষুষ সূর্য অপেক্ষা বড় দেখায়।

সৌরজগতের বহিঃস্থিত যে সব উৎস থেকে বেতার-তরঙ্গ বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে, সেই সব উৎসকে বেতার-তারকা (Radio Stars) বলা হয়। সুতরাং বেতার-তারকা বলতে যেমন বেতার-রশ্মি বিকিরণকারী একটি মাত্র জ্যোতিষ্ককে বোঝাতে পারে, তেমনি বেতার রশ্মি বিকিরণকারী একাধিক জ্যোতিষ্কের সমন্বয়কেও বোঝাতে পারে। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টিতে কোন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। হতে পারে, অত্যধিক দূরত্বের জন্যে কিংবা অতি ক্ষীণ দীপ্তিমাত্রার জন্যে সেগুলি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টির বহির্ভূত। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট বেতার-তারকা-সমূহের মধ্যে আছে—অ্যাণ্ড্রোমেডা বিশ্ব, মেগালানীয় মেঘমালা, ক্র্যাব নেবুলা, কিছু সংঘর্ষরত গ্যালাক্সী বা নীহারিকা, কয়েকটি অতিনোভার ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি। নীহারিকা বা গ্যালাক্সীগুলির সংঘর্ষকালে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ অত্যন্ত শক্তিশালী। এজন্যে তাদের তরঙ্গও বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সহজলভ্য। সিগ্‌নাস (Cygnus), পারসিউস (Perseus) সেণ্টোরাস (Centaurus) প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জে দৃষ্ট সংঘর্ষরত গ্যালাক্সীগুলি বেতার-তারকা। অতিনোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে বিকিরিত বেতার-তরঙ্গও বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সহজে ধরা পড়ে—যেমন, ক্র্যাব নেবুলা এবং কাশ্যপী নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এক অতিনোভার ধ্বংসাবশেষ। অত্যধিক উজ্জ্বল উৎসকে বেতার-তারকা হিসেবে চিহ্নিত করবার জন্যে যে অঞ্চলে তাদের অবস্থিতি, তথাকার

নক্ষত্রপুঞ্জের নামের শেষে ইংরেজী অক্ষর "A" যোগ করা হয়। যেমন, উল্লিখিত বেতার-তারকাগুলির নাম—Cygnus A, Perseus A, Centaurus A, Taurus A (অর্থাৎ ক্র্যাব নেবুলা), Cassiopeia A।

সৌরজগতের সকল গ্রহ ও চন্দ্র থেকে বেতার-বিকিরণ পাওয়া গেছে এবং তাথেকে তাদের পৃষ্ঠতাপও হিসেব করা হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহে কিছু বিশেষত্ব দেখা গেছে। বৃহস্পতি থেকে মাঝে মাঝে প্রবল বেতার-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। এগুলি বিশ্লেষণ করে জানা যায়—বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে পৃথিবীর চেয়ে শক্তিশালী আয়নোস্ফিয়ার বর্তমান।

একক নক্ষত্রগুলি অনেক দূরে বলে তাদের বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে আসতে আসতে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব মাত্র কিঞ্চিদধিক চার আলোকবর্ষ, তথাপি তার বেতার-তরঙ্গ বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা যায় নি।

একক নক্ষত্রগুলির মধ্যে সূর্যই একমাত্র বেতার-তারকা। সূর্যের আলোকমণ্ডল (Photosphere) থেকে যে আলোকরশ্মি বিকিরণ হয়, তারই সাহায্যে আমরা সূর্যকে চাক্ষুষ দেখি। সূর্যের বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও ছটামণ্ডল (Corona) সূর্যগ্রহণ ছাড়া অন্য সময়ে আমরা দেখতে পাই না। আমরা যদি সূর্যের আলোকমণ্ডল না দেখে ছটামণ্ডল দেখতে পেতাম, তাহলে চাক্ষুষ দৃষ্টিতে সূর্যকে অনেক বড় দেখা যেত। সূর্যের আলোক মণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ২০০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ছটামণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ১০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রা যেখানে যত বেশী, সেখান থেকে তত বৃহৎ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়ে। এজন্যে আলোকমণ্ডল থেকে অতি-হ্রস্ব তরঙ্গ, বর্ণমণ্ডল থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ এবং ছটা মণ্ডল থেকে আরও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের বিকিরণ পাওয়া যায়। হ্রস্ব তরঙ্গের বেতার-সূর্য আমাদের দৃশ্য সূর্যের সমান। দশ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-সূর্য দৃশ্য সূর্য অপেক্ষা দশ শতাংশ বড় এবং ছটামণ্ডলের বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-সূর্য আমাদের চাক্ষুষ সূর্যের চেয়ে অনেক বৃহদায়তনের, কিন্তু অতিশয় অস্পষ্ট। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ক্ষুদ্র হয়, বেতার-সূর্য আকার ও আয়তনে তত বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহাকাশে অগণিত জ্যোতিষ্কের সমারোহ তবু দৃশ্যত মহাকাশ ফাঁকা।

বলা হয় মহাকাশ মহাশূন্য। সত্যি কিন্তু তেমন শূন্য নয়,—শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে আছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা আর গ্যাসের সংমিশ্রণ দিয়ে। এই গ্যাস প্রধানত হাইড্রোজেন, তবে অত্যন্ত বিরলভাবে অবস্থিত। এত বিরল যে, ১০ লক্ষ ঘনমাইলের ওজন গড়ে মাত্র এক মিলিগ্র্যাম। অবশ্য কোথাও কোথাও গ্যাসরাশি অপেক্ষাকৃত ঘন। অনেক কুণ্ডলী-পাকানো নীহারিকার বাহুস্থিত গ্যাস ঘনীভূত হয়ে মেঘস্তূপের আকার নিয়েছে। অত্যুত্তপ্ত নক্ষত্রের সন্নিহিত আকাশের হাইড্রোজেন পরমাণু আয়নিত হয়ে যায় অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতির সংঘাতে কিন্তু দূরস্থিত মহাকাশে যেখানে তাপাঙ্ক মাত্র ১০০° কেলভিন অর্থাৎ—১৭৩° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অথবা তারও কম সেখানে হাইড্রোজেন পরমাণু অভগ্ন অবস্থায় থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস বেতার রশ্মি বিকিরণ করে। অভগ্ন ঠাণ্ডা হাইড্রোজেন পরমাণুর বেতার-রশ্মি বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ধরা পড়ে এবং বেতার বর্ণালীতে তার একটি বিকিরণ-রেখা পাওয়া যায়। বেতার বর্ণালীতে হাইড্রোজেনই একমাত্র মৌল যার বিকিরণ-রেখা এ-যাবৎ ধরা পড়েছে। এই বিকিরণ রেখাটির সাহায্যে মহাকাশে হাইড্রোজেনের গতিবিধি নির্ণয় করা যায়। ২১ সেন্টিমিটারের কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ঐ রেখা দেখা গেলে ডপ্‌লার তত্ত্বানুযায়ী বুঝতে হবে গ্যাসরাশি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে এবং ২১ সেন্টিমিটারের বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ঐ রেখার আবির্ভাব হলে জানা যাবে গ্যাসরাশি দূরে সরে যাচ্ছে।

ছায়াপথ নীহারিকাটি তার কেন্দ্রের চতুর্দিকে চক্রের মতো আবর্তন করছে কিন্তু অঞ্চলসমূহের কৌণিক গতি সকলের সমান নয়। সৌর জগতে গ্রহগণ যেমন নিকট বা দূরকক্ষে আপন আপন গতিতে সূর্য প্রদক্ষিণ করে ছায়াপথ নীহারিকাতেও তেমনি বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন গতিবেগে ছায়াপথ কেন্দ্রটিকে প্রদক্ষিণ করছে। ছায়াপথের প্রতিটি অঞ্চলে হাইড্রোজেনের ঘনত্ব এবং তার অগ্রে আগমন ও দূরে অপসরণের চিত্র ২১ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার বর্ণালীতে গৃহীত হয়েছে। এ ভাবে যে চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ছায়াপথ একটি কুণ্ডলী-পাকানো নীহারিকা। আলো-দূরবীন দ্বারা এত কাল ছায়াপথের গঠন-প্রকৃতি জানা যায় নি, বেতার-দূরবীন এখন তার গঠন-ভঙ্গীর মীমাংসা করে দিল।

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নূতন ধরণের কতকগুলি আশ্চর্য জ্যোতিষ্কের সন্ধান দিয়েছে। এরা প্রত্যেকে এক একটি তেজঃপুঞ্জ বিশেষ,—যেমন বেতার উৎস হিসেবে তেমনি আলোক উৎস হিসেবে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াসার (Quasar)। Quasi Stellar Radio Sources শব্দগুলিকে সংক্ষেপ করে Quasar কথাটির উৎপত্তি।

দূরবীনে কোয়াসারগুলি দৃশ্যত এক একটি সাধারণ নক্ষত্রের সমতুল্য এবং কোন কোনটার দেহে গ্যাসীয় জেট আছে। কিন্তু এদের এক একটির বেতার শক্তি একটা সম্পূর্ণ গ্যালাক্সী যে পরিমাণ বেতার রশ্মি বিকিরণ করে তার চেয়ে কম নয়। কোয়াসার এত আলোকোজ্জ্বল যে, অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। এদের কোন কোনটার একক দেহে শতাধিক গ্যালাক্সীর দীপ্তি বর্তমান। কোয়াসারের বিকিরণে অতি-বেগুনী রশ্মির প্রাচুর্য, আর সেই সঙ্গে আছে অতি শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই আলো ও বেতার দীপ্তি স্পন্দনশীল। এদের বর্ণালীর সঙ্গে অপর কোন জ্ঞাত নক্ষত্র, নোভা, অতিনোভা বা নীহারিকার বর্ণালীর মিল নেই। এদের বর্ণালীতে লাল-অপসরণের মাত্রা হিসেব করলে দেখা যায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত সীমায় অর্থাৎ আমাদের বৃহত্তম দূরবীনের দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে আরও বহুদূরে এদের অবস্থান। কিন্তু কোয়াসারের দূরত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের অমিল আছে, তেমনি তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে কোয়া-সারের আকার ও গঠন-প্রকৃতি নিয়ে। কোয়াসারের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অবিসংবাদিত মীমাংসায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এই আশ্চর্য বেতার-উৎসটি রহস্যের অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে। ১৯৬৩ সন থেকে এ পর্যন্ত মোট শতাধিক কোয়াসারের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তাদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে গবেষণাও চলছে।

১৯৬৭ সনের নভেম্বর মাসে বেতার দূরবীনে আকাশ পর্যবেক্ষণ কালে কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানীরা একটি অভিনব বেতার উৎসের সন্ধান পান। তার-পরে ঐ জাতীয় আরও গুটিকয়েক বেতার উৎস ধরা পড়ে। উৎসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে পাল্‌সার (Pulsar)। নামেই এদের প্রকৃতির পরিচয়। এরা ঝলকে ঝলকে বেতার রশ্মি বিকিরণ করে। স্পন্দনশীল নক্ষত্রে যেমন দীপ্তির সময়ানুগ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, পালসারেও তেমনি বেতার রশ্মির বিকিরণ সময়ানুগ। অর্থাৎ পাল্‌সার এক সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময়

বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে সেকেণ্ডখানেকের জন্যে একদম নিস্পন্দ হয়ে যায়। তারপর আবার তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে, আবার বিরতি,—এইভাবে চলে। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, বিকিরণ শক্তির কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও বিরতি কালের এতটুকুও হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, সর্বদা সমান। পৃথিবী থেকে ৩০০ আলোকবর্ষ বা অনুরূপ দূরত্বে উৎসক্ষেত্রগুলির অবস্থিতি। কিন্তু উৎস ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত দূরবীনের দৃষ্টিতে কোন জ্যোতিষ্ক দৃশ্যমান হয়ে ওঠে নি। এক বছরে মাত্র নয়টি পাল্‌সার আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমেরিকা, ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার বহু স্থানে বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে ছোট-বড় বিবিধ আকারের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে এবং অহর্নিশি আকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। ইংল্যাণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকট জোড্‌রেল ব্যাঙ্ক নামক স্থানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে। এর এরিয়েল বা প্রতিফলনকারী অবতল জালটির মুখের ব্যাস ২৫০ ফুট। (প্লেট নং-ম।) কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে জোড্‌রেল ব্যাঙ্কের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটি মডেল স্থাপিত হয়েছে।

ইন্টারফেরোমিটার (Interferometer) নামক একপ্রকার বেতার-ব্যতি-করণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এর যান্ত্রিক বিন্যাস বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা ভিন্ন রকমের এবং এই যন্ত্রের বিশ্লেষণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দেশেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার-প্রকারের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণায় মহাকাশের জ্যোতিষ্কাদি সম্বন্ধে নিত্যই নানাবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাকাশে সঞ্চরণশীল সব রকমের বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ ভূপৃষ্ঠে আসে না—আলো-জানালা ও বেতার-জানালা দিয়ে সামান্য কিছু বিদ্যুত-চৌম্বক রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আসে। সব রকম রশ্মি না আসায় বিজ্ঞানীরা মহাকাশ অনুশীলনে খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। এজন্যে তাঁরা এখন পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরতলায় কৃত্রিম উপগ্রহে ও চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁদের গবেষণাগার স্থাপনের কথা ভাবছেন।

বিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ড

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ

অ্যাণ্ড্রোমেডা বা উত্তর-ভাদ্রপদা নক্ষত্রপুঞ্জে একটি নীহারিকা দেখা যায়। খালি চোখে দৃষ্ট অপর অনেক নীহারিকার মতো এটিকেও ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের অন্তর্গত একটি গ্যাসীয় মেঘলোক মনে করা হতো। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক-শ' ইঞ্চি দূরবীনে এর প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়েছে। ছায়াপথ দ্বীপজগতের সীমানা পেরিয়ে এই নীহারিকাটি অসংখ্য নক্ষত্র সমাকীর্ণ অপর এক দ্বীপজগৎ। অ্যাণ্ড্রোমেডা নক্ষত্রপুঞ্জ ভেদ করে বহু দূরে এর অবস্থান। দূরত্বের দরুণই একে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এক মেঘলোকের ন্যায় দেখায়। আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নীহারিকা-বিশেষজ্ঞ ডক্টর ই. পি হাব্‌ল্ শুধু অ্যাণ্ড্রোমেডা নীহারিকাই নয়, মহাশূন্যে ১০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে ও পরে ২০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে কোটি কোটি নক্ষত্র-লোকের সন্ধান পেয়েছেন—যেগুলির প্রত্যেকেই আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের মতো এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীপজগৎ বা বিশ্ব অর্থাৎ গ্যালাক্সী (Island Universe or Galaxy)।

ব্রহ্মাণ্ড বলতে বোঝায় অসংখ্য গ্যালাক্সী সমন্বিত আমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত ব্যাপ্তিকে; অর্থাৎ এমন কিছু নেই, যা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। ডক্টর হাব্‌লের গবেষণার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যায়—বহু কোটি দ্বীপজগৎ ব্রহ্মাণ্ডময় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে এবং সে কারণে ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে।

কাগজের কতকগুলি ছোট ছোট চাকৃতি কেটে রবারের বেলুনের গায়ে এঁটে দিয়ে যদি বেলুনটাকে ফোলানো যায়, তাহলে দেখা যাবে চাকৃতিগুলি পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বেলুনটাকে যত ফোলানো যাবে, চাকৃতিগুলি ক্রমান্বয়ে তত পরস্পরের দূরবর্তী হবে। কোনও একটা চাকৃতির উপর যদি একটা মাছি

বসে থাকে তবে সে দেখবে—চারদিকের আর সব চাকৃতি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং যে চাকৃতি যত দূরে, তার গতিবেগ তত বেশী (চিত্র-৪৭)।
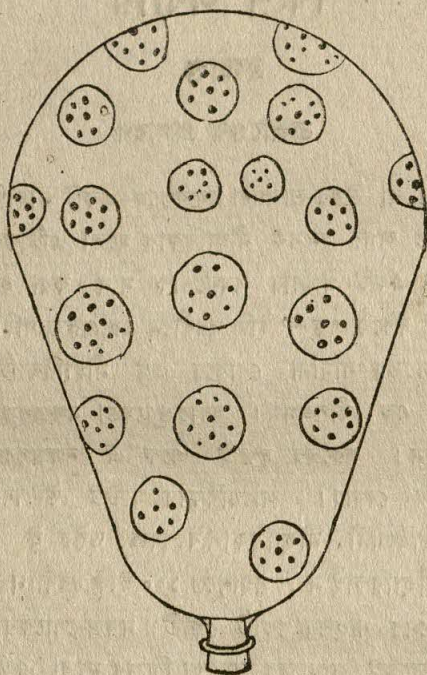
চিত্র-৪৭

বেলুনের স্ফীতিতে চাক্‌তির অপসরণ

প্রতিটি কাগজের চাকৃতির উপর যদি কয়েকটা করে কালির বিন্দু দেওয়া থাকে, তাহলে বেলুন ফোলালে কালির বিন্দুগুলির কোনও নড়চড় হয় না—শুধু এক চাকৃতির বিন্দুসমষ্টি অন্য চাকৃতির বিন্দুসমষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও অনুরূপ। প্রতিটি কালির বিন্দু যেন এক একটি দ্বীপজগৎ বা গ্যালাক্সী কতকগুলি করে দ্বীপজগৎ কালির বিন্দুর মতো সমষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। তাদের আমরা দ্বীপপুঞ্জ (Cluster of Galaxies) বলবো, অর্থাৎ প্রতিটি চাকৃতি এক একটি দ্বীপপুঞ্জ।

ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট বুদ্বুদের মতো প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে দ্বীপপুঞ্জগুলি কাগজের চাকৃতির মতো একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু যে কোন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী আমরা হই না কেন—আমাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যে, আমরাই যেন কেন্দ্রে আছি, অন্যগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছে এবং যে দ্বীপপুঞ্জ যত দূরে তার গতিবেগ তত দ্রুত। কিন্তু কাগজের চাক্‌তি যেমন আয়তনে বাড়ে নি, দ্বীপপুঞ্জগুলিও তেমনি আয়তনে বাড়ছে না, শুধু তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ছে—তাদের অন্তর্বর্তী স্থানের ব্যবধান বাড়ছে।

বলে রাখা ভাল উপরের উপমাটায় ত্রুটি রয়ে গেছে। বেলুনের গায়ে চাক্‌তি বসানো হয়েছে, বেলুনের মধ্যে আছে হাওয়া। এই হাওয়ার ভিতরে ফাঁকা জায়গায় সর্বত্র ঐ রকম চাক্‌তি আছে, কল্পনা করতে হবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই ঐরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ দ্বীপজগৎ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে—কোন সমতলে বা গোলকের পৃষ্ঠে তাদের অবস্থান নয়।

দ্বীপপুঞ্জগুলির আয়তন বাড়ছে না, কিন্তু পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপজগৎগুলিও স্থাণু হয়ে বসে নেই। তারা প্রত্যেকেই আপন আপন মেরু-অবলম্বনে আবর্তন করছে, নিজেদের মধ্যে কেউ কারও কাছে আসছে, কেউ বা দূরে সরে যাচ্ছে—সৌরজগতের সীমানার মধ্যে থেকেই গ্রহ-উপগ্রহগুলি যেমন স্থান পরিবর্তন করে।

ছায়াপথ দ্বীপজগতের দুটি উপজগৎ আছে, তারাও দুটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রলোক বা গ্যালাক্সী বিশেষ। এদের নাম মেগালানিক মেঘমালা (Magellanic clouds)। এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ছায়াপথ বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অ্যাণ্ড্রোমেডা নক্ষত্র-মণ্ডলে দৃষ্ট বিখ্যাত নীহারিকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপজগৎ—ছায়াপথ দ্বীপজগৎ থেকে চৌদ্দ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এম-৩১ (M 31)। অ্যাণ্ড্রোমেডা দ্বীপজগতেরও দুটি উপজগৎ আছে, যারা গ্যালাক্সী হলেও আয়তনে ক্ষুদ্রতর এবং অ্যাণ্ড্রোমেডার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এই ক্ষুদ্র গ্যালাক্সী দুটির পরিচিতি এম-৩২ (M 32) এবং এন. জি. সি-২০৫ (N. G. C. 205)। দুটি উপজগৎ সমেত ছায়াপথ গ্যালাক্সী, দুটি উপজগৎ সমেত অ্যাণ্ড্রোমেডা গ্যালাক্সী এবং আরও ১৫টি — মোট ১৭টি দ্বীপজগৎ নিয়ে আমাদের এই স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। এদের প্রত্যেকেরই অক্ষ অবলম্বনে আবর্তন আছে, অন্যান্য গতি আছে, কিন্তু মহাকর্ষের টানে এক পরিবারভুক্ত — কেউই অন্যদের প্রভাব মুক্ত হয়ে দূরে সরে যেতে পারে না—যেমন পারে না গ্রহ-উপগ্রহগুলি সৌরজগৎ ছেড়ে পালাতে।

ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর গ্যালাক্সীগুলিও ঐরূপ কতকগুলি করে এক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে এক একটি পুঞ্জ রচনা করে রয়েছে। তবে পুঞ্জের দ্বীপজগৎগুলি চাকৃতির কালির বিন্দুর মতো এক সমতলে অবস্থিত নয় এবং তারা বেলুনের মতো কোন গোলকের পৃষ্ঠদেশ অধিকার করে নেই, মহাশূন্যে তারা সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

এই সকল দ্বীপপুঞ্জের বিস্তার বাড়ছে না, কিন্তু পুঞ্জগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই ভাবে গ্যালাক্সীগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির গতিবেগকে তাদের অপসরণ বেগ (Recession velocity) বলা হয়। ডপ্‌লার তত্ত্ব অনুযায়ী বর্ণালীতে লালের অপসরণ থেকে নির্ধারণ করা যায়,—গ্যালাক্সীর গতি কোন্ দিকে অর্থাৎ এগিয়ে আসছে, না পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এই গতিবেগের পরিমাণ কত। এই পদ্ধতিতেই দেখা গেছে, দুই গ্যালাক্সীর ব্যবধান যদি ১০ কোটি আলোকবর্ষ হয়, তবে একটি অপরটি থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল দূরে সরে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে দুই জ্যোতির্বিদ হাব্‌ল্ এবং হুমাসন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা দেখলেন, যে-কোন গ্যালাক্সী থেকেই অপর গ্যালাক্সীগুলির দূরত্ব এবং তাদের অপসরণ বেগ সমানুপাতিক; অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে প্রথম গ্যালাক্সীর দূরত্ব যত, দ্বিতীয় গ্যালাক্সীর দূরত্ব যদি তার দ্বিগুণ হয়, তবে এই দ্বিতীয় গ্যালাক্সীর অপসরণ-বেগও দ্বিগুণ হবে। বর্ণালীতে লালের অপসরণ হিসেব করে উল্লিখিত তথ্যের উদ্ভব। এজন্যে তথ্যটিকে হাব্‌লের লাল-অপসরণ সূত্র বলা হয়। হাব্‌লের সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিনারা অর্থাৎ প্রান্তীয় সীমা কল্পিত হয় নি, কাজেই কোনও গ্যালাক্সীরই কোন অবস্থান-বৈশিষ্ট্য নেই এবং প্রতিটি গ্যালাক্সীর আবাসিকই নিজেদের অবস্থানকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র মনে করতে পারে।

ধরা যাক ক খ গ ঘ সারবন্দী ৪টি গ্যালাক্সী আছে। পর পর তাদের একে অন্যের মধ্যে দূরত্ব ১০ কোটি আলোকবর্ষ (চিত্র-৪৮)। আমরা যদি খ গ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা দেখবো প্রতি সেকেণ্ডে ক ১৪০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে, গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে। আমরা যদি গ গ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা দেখবো খ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে, ক প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে

প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল বেগে ১০ কোটি আলোকবর্ষ পথ যেতে প্রথম গ্যালাক্সীর লেগেছে ১৩০০ কোটি বছর। প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল বেগে আমাদের কাছ থেকে স্বীয় দূরত্ব অর্থাৎ ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যেতে দ্বিতীয় গ্যালাক্সীরও লেগেছে ১৩০০ কোটি বছর। সুতরাং গ্যালাক্সীগুলির গতিবেগ যদি ঠিক ঐ প্রকারই বরাবর থাকে, তাহলে ১৩০০ কোটি বছর পূর্বে তারা সব একত্র সংঘবদ্ধ হয়ে ছিল এবং তার পর বিভিন্ন বেগে চলতে আরম্ভ করে তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।
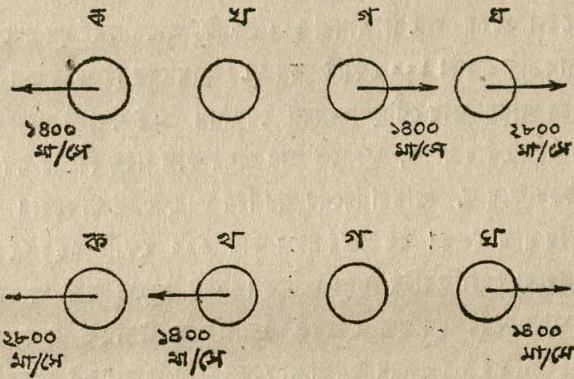
চিত্র-৪৮

দ্বীপজগতের অপসরণ বেগ

দূরস্থিত গ্যালাক্সীগুলির অপসরণ বেগ ক্রমান্বয়ে বেশী। এযাবৎ দূরবীনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে যেগুলি অবস্থিত, তাদের গতিবেগ হিসেব করে সর্বোচ্চ অপসরণ বেগ পাওয়া গেছে আলোর গতির ৪০ শতাংশ অর্থাৎ সেই দূরস্থিত গ্যালাক্সীটি প্রতি সেকেণ্ডে ৭০ হাজার মাইলেরও বেশী সরে যাচ্ছে। সুতরাং দূরবীনের দৃষ্টি বহির্ভূত এমন গ্যালাক্সী থাকা সম্ভব, যার অপসরণ বেগ আলোর গতির সমান হবে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হবে। হাব্‌লের সূত্রে জানা যায়, আমাদের কাছ থেকে বা পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যে গ্যালাক্সী অবস্থিত, তার অপসরণ বেগ আলোর গতির সমান। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কিছুরই গতিবেগ আলোর গতির চেয়ে বেশী হতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ অপেক্ষা দূরস্থিত গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ যদি আলোর গতির সমানও হয়, তথাপি তার আলোকরশ্মি কোন

দিনই পৃথিবীর নাগাল পাবে না। সুতরাং পৃথিবীর দৃষ্টিসীমা ঐ ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত। বর্তমান দৃষ্টি-সহায়ক যন্ত্রপাতির দ্বারা পৃথিবী থেকে ন্যূনাধিক ২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ভবিষ্যৎ উন্নতিতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি যত শক্তিশালীই হোক, ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ অপেক্ষা দূরস্থিত সমস্ত কিছুই তার অদৃশ্য থেকে যাবে; অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে দৃষ্টিসীমা ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার বেশী হতে পারে না। অথবা বলা যায়, পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের সমান।

যে জ্যোতিষ্কের আলো আমরা ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে পাচ্ছি, সে আলোকরশ্মি বস্তুতঃ ১০০ কোটি বছর পূর্বে আমাদের দিকে রওনা হয়েছিল —এতদিনে আমরা তার পৌছবার-খবর পেলাম। এই সময়ের মধ্যে যদি সেই জ্যোতিষ্ক লয়ও পেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রলয় কাল পর্যন্ত দিনের পর দিন যত রশ্মি বিকিরণ করেছে, আমরা দিনের পর দিন তা পেতেই থাকবো। তারপর যে দিন তার রশ্মি প্রেরণ বন্ধ হয়ে যাবে তার ১০০ কোটি বছর পরে আমরা জানতে পারবো জ্যোতিষ্কটির মৃত্যু ঘটেছে। এই মুহূর্তে যদি আমরা পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরস্থিত কোনও জ্যোতিষ্কে উপস্থিত থাকতাম এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির যদি তেমন ক্ষমতা থাকতো, তাহলে স্বচক্ষেই আমরা দেখতে পেতাম পৃথিবীতে বনমানুষ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে দুটি সমধিক প্রচলিত। একটির নাম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (Big Bang) মতবাদ, অন্যটির নাম সদা-সমাবস্থা (Steady state) মতবাদ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে কোনও এক অতীতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল এবং তারপর থেকে তার ক্রমবিবর্তন চলছে। সদা-সমাবস্থা মতবাদে আভ্যন্তরীণ নানা পরিবর্তন সত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক অবস্থা চিরকাল একই রূপ থেকে যাচ্ছে। উভয় মতের সমর্থক বিজ্ঞানীরা আপন আপন মতবাদের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন।

১৯২০ সালে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটারের কল্পিত সৃষ্টিরহস্য এই যে, এক আদিম কণিকা (Primeval atom) থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি
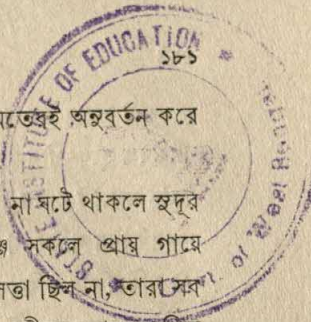
হয়েছে। জর্জ গ্যামো প্রমুখ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই মতেরই অনুবর্তন করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (Big Bang) মতবাদের প্রবর্তন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান নৈসর্গিক রীতিনীতির পরিবর্তন না ঘটে থাকলে সুদূর অতীতে এমন একদিন ছিল, যখন গ্যালাক্সী ও গ্যালাক্সীপুঞ্জ সকলে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে ছিল। তারও পূর্বে তাদের আর কোন পৃথক সত্তা ছিল না, তারা সব একত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হচ্ছে বলেই অতীতে তার সঙ্কুচিত অবস্থা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কেমন সেই সঙ্কোচন? গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেন সঠিক কোনও ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, সেই জমাট পিণ্ডের ঘনত্ব ছিল মানুষের কল্পনার অতীত, সঙ্কোচন হেতু তার তাপমাত্রাও দাঁড়িয়েছিল অকল্পনীয়—ভয়াবহ। জমাট পিণ্ডটির সম্ভাব্য ঘনত্ব ছিল জলের তুলনায় এক শত কোটি গুণ বেশী, অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটারের ওজন হবে দশ কোটি টন। কালির পরিবর্তে ঝরণা কলমে ঐ বস্তু ভরে নিলে কলমটির ওজন দাঁড়াবে কম করেও কুড়ি কোটি টন। বর্তমানের দুই শত ইঞ্চির দূরবীনের দৃষ্টির অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রাদি যাবতীয় বস্তুকে ঐ ঘনত্বে নিয়ে এলে যে স্থান অধিকার করবে, তার আয়তন ত্রিশটি সূর্যকে একত্রে জড়ো করে রাখলে যে আয়তন হবে তার সমান। এই ঘনত্বে ও তাপে কোন পদার্থেরই স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না, তারা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। যে কোন পদার্থ ভাঙলেই তার শেষ বিভাগ দাঁড়ায় প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনে। বিভক্ত এই জমাট মিশ্রণকে ঐ বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ইলেম (Ylem)। ইলেমই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পিণ্ড।

ঘনত্বেরও একটা সীমা আছে। আদি পিণ্ড সেই সীমায় পৌঁছলেই প্রতি-ক্রিয়ার ফলে হলো এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুতীব্র বেগে সুরু হলো প্রসারণ। প্রসারণের ফলে ইলেমের তাপ দ্রুত কমতে আরম্ভ করলো এবং ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অর্থাৎ মৌলিক শক্তিকণাগুলির পক্ষে সম্ভব হলো বিবিধ সংগঠনে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরমাণুর সৃষ্টি করা। বিস্ফোরণ থেকে অরাম্ভ করে পরমাণুর সৃষ্টি পর্যন্ত হয়তো মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। পরমাণুর দ্বারা গঠিত গ্যাস ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, ফলে তার ঘনত্ব কমতে আরম্ভ করলো, পূর্বতন শত কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাও ক্রমে কমে এল। প্রথম তিন কোটি বছর এই ভাবেই চললো। গ্যাস বিরল থেকে বিরলতর হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হচ্ছিলো এবং সেই সঙ্গে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে শূন্য ডিগ্রীর দিকে নেমে আসছিল।

এই সময়ে ব্রহ্মাণ্ড রইলো ঘন অন্ধকারে নিমগ্ন। তারপর বিরল গ্যাসের সমষ্টিবদ্ধ হয়ে দ্বীপজগৎ ও নক্ষত্রাদি সৃষ্টির পালা। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ কোন সময়েই থেমে থাকে নি। বিস্ফোরণের পর গ্যাসীয় মেঘের বস্তুকণাসমূহ যেমন যেমন গতিবেগ পেয়েছিল, সেই গতিবেগ নিয়ে কিংবা মহাকর্ষের লব্ধিতে সৃষ্ট পরিবর্তিত গতিবেগ নিয়ে আজও তারা বহির্মুখে ছুটে চলছে এবং চলবার পথেই তাদের সংহতি থেকে ক্রমাগত সৃষ্ট হয়ে চলেছে দ্বীপজগৎ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক।

মহাগুরু, মহাতপ্ত ও মহোজ্জ্বল একটি আদি পিণ্ড ও তার বিস্ফোরণের সমর্থনে জর্জ গ্যামো, উইৎসেকার প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন। আদি পিণ্ড বা ইলেমের বিস্ফোরণ হেতু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে—এই প্রকার অনুমান-নির্ভর বলে এই মতবাদকে Big Bang বা Big Squeeze বলা হয়। কিন্তু স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, ইলেমের আগে কি ছিল? প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে জর্জ গ্যামো সরস করে লিখেছেন—সেণ্ট অগষ্টাইনের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল—ভগবান তো স্বর্গ সৃষ্টি করলেন, পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তার আগে তিনি কি করছিলেন?

ঐ বিস্ফোরণের পর ক্রম-নিম্নগ চাপ ও তাপমাত্রায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে অবস্থায় যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন সংশ্লেষণে যুক্ত হয়ে ইলেমের শক্তিকণাসমূহ সর্ববিধ মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করলো। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ভারী মৌলিক পদার্থের উদ্ভব হতে অপরিসীম চাপ ও তাপের দরকার। অতএব সর্বপ্রথম ঐসকল ভারী মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হলো। তারপর অতি দ্রুত পর্যায়ে অন্য সব অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে এই ভাবেই সুদূরের কোন এক অতীতে ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা হয়েছিল।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অপর অনুমানটি সদা-সমাবস্থা (Steady State) মতবাদ নামে আখ্যাত। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল, টি. গোল্ড ও এইচ. বণ্ডি এই মতবাদের স্রষ্টা। কোন আদি পিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূত্রপাত—একথা এই বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। এঁরা বলেন, প্রসারণ সত্ত্বেও সার্বিক বিন্যাসে ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল সমাবস্থায় আছে।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হেতু দ্বীপজগৎসমূহের অন্তর্বর্তী দূরত্ব বাড়ছে। এখন থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরে আমরা যদি আবার পৃথিবীতে এসে একই

শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে ফটোগ্রাফ নিই, তাহলে সেই আলোকচিত্রে এখনকার অপেক্ষা অনেক কম দ্বীপজগতের ছবি ধরা পড়বার কথা। এমনটি যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে যে, কতকগুলি গ্যালাক্সী ইতিমধ্যে দূরে সরে গেছে, তাদের স্থান আর পূর্ণ হয় নি। সমাবস্থা-বাদী বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নতুন দ্বীপজগতের সৃষ্টি অবিরাম চলছে এবং অধুনা বা সুদূর ভবিষ্যতে যে কোন সময়েই সেই শক্তিশালী দূরবীনের গৃহীত আলোকচিত্রে প্রায় সমসংখ্যক দ্বীপজগতের ছবিই ধরা পরবে।

তাহলে মানতে হয় যে, গ্যালাক্সীগুলি দূরে সরে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের সাম্য রক্ষিত হয় সমহারে নতুন গ্যালাক্সীর সৃষ্টির দ্বারা। এই মতবাদই সদা-সমাবস্থা। প্রক্রিয়াটিকে ভাষান্তরে অবিরাম সৃষ্টি (Continuous Creation) মতবাদও বলা হয়।

এই মতের প্রধান প্রবক্তা বৃটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল। তিনি বলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের গড় ঘনত্ব চিরকাল একই রয়ে যাচ্ছে। এই গড় ঘনত্ব অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। প্রসারণ হেতু ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি বাড়লে ঘনত্ব যতটা কমে, পরিপূরক নতুন পদার্থের সৃষ্টির দ্বারা ঘনত্ব অবার সেই পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের গড় ঘনত্ব আবহমানকাল একই থেকে যাচ্ছে। সৃষ্ট নতুন পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয় নতুন গ্যালাক্সী ও তার মধ্যে নতুন নক্ষত্র। এই মতবাদে ব্রহ্মাণ্ডের আরম্ভ নেই, শেষও নেই—ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্ত।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই পরিপূরক নতুন পদার্থ আসে কোথা থেকে? এর উত্তর নিশ্চয়ই শূন্য থেকে। কিছু নেই থেকে কিছুর জন্ম! এর সমাধান করতে গিয়ে ঐ বিজ্ঞানীরা যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তার ভিত্তিও কল্পনাশ্রয়ী। এখানেই এই মতবাদের একটি প্রধান দুর্বলতা।

এদিকে বেতার-জ্যোতিষের আবিষ্ক্রিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ১৯৬৩-৬৫ সালের মধ্যে কতকগুলি আশ্চর্য বেতার-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। আলোকচিত্রে দেখা যায়, এরা আয়তনে এক একটা সাধারণ নক্ষত্রের সমতুল্য অথচ একটা সম্পূর্ণ গ্যালাক্সী থেকে যে পরিমাণ বেতার-রশ্মি বিকিরিত হয়, এদের প্রত্যেকের বেতার-শক্তি অন্ততঃ ততটাই বিরাট। এদের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াসার। Quasi Stellar Radio Sources শব্দগুলিকে সংক্ষেপ করে Quaser শব্দটির উৎপত্তি।

এলেন স্যাণ্ডেজ, মার্টিন স্মিথ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে, কোয়াসারের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের তুলনাই চলে না। এদের কোন কোন্টার একক দেহে প্রায় একশত গ্যালাক্সীর দীপ্তি বর্তমান। এদের বিকিরণে অতিবেগুনী রশ্মির প্রাচুর্য, আর সেই সঙ্গে আছে অতি শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ। এদের বর্ণালীর সঙ্গে অপর কোন জ্ঞাত নক্ষত্র, নোভা, অতিনোভা, নীহারিকা অথবা দ্বীপজগতের বর্ণালীর মিল নেই। এত উজ্জ্বল বলেই এরা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্র বলে ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বৃহত্তম দূরবীনের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে আরও বহুদূরে এদের অবস্থান। কোয়াসারের দূরত্ব সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানী ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিতেই তাঁরা বলেন কোয়াসাররা অত দূরে নয়, অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত। প্রকৃত দূরত্ব এখনও গবেষণাধীন।

কোয়াসারের দেহ থেকে বিকিরিত তেজের প্রকৃতি, তার দূরত্ব, তার শক্তিমত্তা প্রভৃতি পর্যালোচনা করে ফ্রেড হয়েল দেখলেন, এই অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সমাবস্থা মতবাদের সামঞ্জস্য ঘটানো যায় না। তাই ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রেড হয়েল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে তাঁর স্বরচিত ও কুড়ি বছর যাবৎ সমর্থিত সদা-সমাবস্থা মতবাদ প্রত্যাহার করেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ

ব্রহ্মাণ্ড সসীম কি অসীম—এই ভাবনা সর্বদেশের সর্বকালের চিন্তানায়কদের, কিন্তু আজও এর কোন প্রশ্নাতীত মীমাংসা হয় নি। মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহামতি আইনস্টাইন অনুমান করেছিলেন 'দেশের বক্রতা' (Curvature of Space)। এই তথ্যকে ভিত্তি করেই অনেক মনীষী বলেছেন—ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত অথচ সীমাহীন" (Finite but Unbounded)। 'দেশের বক্রতা' বলতে কি বোঝায় তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা কারও আছে কি না, সে বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও সন্দেহ প্রকাশ করেন। আবার 'পরিমিত অথচ অসীম' এই পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন শব্দদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ মানসচক্ষে আনা দুরূহ। এক্ষেত্রে ভূগোলকের একটা অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা আনতে সহায়ক হতে পারে; যেমন—পৃথিবীর বঙ্কিম উপরিভাগের আয়তন পরিমিত কিন্তু সীমাহান। ভূপৃষ্ঠের আয়র্তনের বিস্তৃতি পরিমাপ করা যায়, কিন্তু তার উপর যতই ঘোরা যাক, তার সীমানা পাওয়া যাবে না। ভূপৃষ্ঠের আয়তনের কোন

কেন্দ্রবিন্দু নেই, কোন প্রান্তও নেই। গোলকের পৃষ্ঠে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়েই চতুর্দিকে একই দৃশ্যাবলী দেখা যাবে, পৃষ্ঠের যে-কোন বিন্দুকেই কেন্দ্র ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভূগোলকের একটি কেন্দ্র আছে, অতএব সীমিত একটি ব্যাসার্ধও আছে। ব্রহ্মাণ্ডেরও সেইরূপ কোথাও না কোথাও কোন একটি কেন্দ্র আছ, অতএব ব্যাসার্ধও আছে, কিন্তু তার ব্যাসার্ধের মাপ পরিবর্তনশীল—কারণ ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের তিন প্রকার পরিণতি সম্ভব।

১। ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, অথবা

২। ব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল ধরে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে যাবে, অথবা

৩। সীমিত সময়ের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পর্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হতে থাকবে।

প্রথম সম্ভাবনাটির কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বিতীয় পরিণামে বিশ্বাসী, আবার অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তৃতীয় পরিণামে বিশ্বাস করেন।

একবিংশ অধ্যায়

রকেট সাহায্যে মহাকাশ সমীক্ষা

মানুষ আকাশকে জানতে চায়। এজন্যে তার আগ্রহের যেমন সীমা নেই, প্রচেষ্টাও তেমনই অন্তহীন। আদিযুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত আকাশ দর্শনে মানুষের একমাত্র নির্ভর ছিল তার আপন চক্ষু। ১৬১০ সনের পর গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র মানুষের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দূরবীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অপরিহার্য যন্ত্র। আকারে, প্রকারে ও যান্ত্রিক কৌশলে দূরবীনের এত উন্নতি হয়েছে যে, দুই শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের আকাশও আজ মানুষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেছে। ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে জ্যোতিষ্ক দ্বারা বিচ্ছুরিত বেতার-তরঙ্গ করায়ত্ত হওয়ায় আকাশ পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানীর সামনে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে আর এক নবতর প্রণালী মানুষকে তার যন্ত্রপাতিসহ আকাশে পরিভ্রমণ করে অধিকতর নির্ভুলভাবে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রণালীটি হচ্ছে রকেট সাহায্যে মহাকাশ অভিযান। অর্থাৎ রকেটের সাহায্যে যথোপযুক্ত যানে যন্ত্রাগার ও নভচারীকে ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতামুক্ত উর্ধ্বাকাশে পাঠিয়ে সেখান থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অবিকৃত রূপ অনুধাবন করা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে রকেট কি ?

প্রায় সহস্র বছর কাল মানুষ হাউই বাজীর সঙ্গে পরিচিত। উপযুক্ত আধারের নীচের দিকে বারুদ ভর্তি করে হাউই প্রস্তুত। হাউইকে উর্ধ্বমুখী করে নীচেকার বারুদে আগুন ধরিয়ে দিলেই হাউই উঁচুদিকে ছুট দেয়। মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হাউই আকাশে উঠে তার ডগায় রাখা তারা বাজী জ্বালিয়ে দিয়ে যে রং-বেরঙের শোভা সৃষ্টি করে মাটির মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাই দেখে পুলকিত হয়।

রকেট (Rocket) হাউইরই উন্নত সংস্করণ। রকেটে গতিসঞ্চারক বা প্রপেলাণ্ট (Propellant) অর্থাৎ জ্বালানী হিসেবে কঠিন ও তরল দুই প্রকার বস্তুরই ব্যবহার আছে। কঠিন পদার্থ বারুদ কারো অজানা নয়। রবার্ট এইচ গডার্ড নামক এক আমেরিকান বিজ্ঞানী ১৯২৬ সনে সর্বপ্রথম তরল

প্রপেলাণ্ট সাহায্যে রকেট উৎক্ষেপণে কৃতকার্য হন। তরল দাহ্যপদার্থ ও দহনক্রিয়া সহায়ক তরল অক্সিডাইজার একত্রে সংমিশ্রণ দ্বারা তরল প্রপেলাণ্ট তৈরি হয়। যেমন—(১) কেরোসিন ও তরল অক্সিজেন, (২) পেট্রোল ও তরল অক্সিজেন, (৩) তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন ইত্যাদি। ক্ষেত্র বিশেষে তরল অক্সিজেনের পরিবর্তে অন্যান্য তরল অক্সিডাইজারও ব্যবহৃত হয়।

বায়ুর অবর্তমানে প্যারাসুট অকেজো। বায়ু না থাকলে বেলুন ভেসে থাকতে পারে না। বায়ু না থাকলে প্রপেলার-চালিত এরোপ্লেন উড়ে যেতে পারে না। কিন্তু বায়ুহীন স্থানে রকেট স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। নিউটনের গতিসূত্রে আছে,—প্রতিটি ক্রিয়ার ফলে সমপরিমাণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ধাক্কা দিলে সমপরিমাণ বিপরীতমুখী ধাক্কা ফিরে আসে। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করি আমরা পদে পদে। হাঁটবার সময়ে পা দিয়ে মাটিতে পিছন দিকে যে ধাক্কা দেওয়া হয় মাটি সে ধাক্কা ফিরিয়ে দেয়
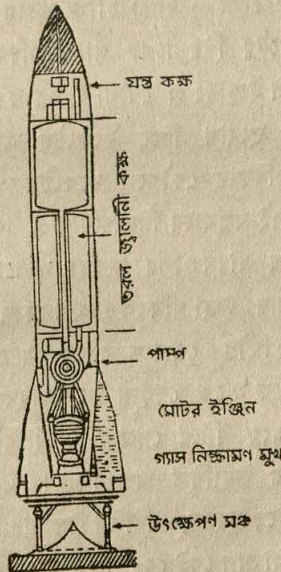
চিত্র-৪৯
রকেট

পা-কে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে—যার ফলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। নীচের দিকে ঝাপ্‌টা মেরে পাখী কি করে উপরে উড্ডীন হয়,

সে দৃশ্য কারও অদেখা নয়। রকেটের মধ্যে রক্ষিত প্রপেলান্টে আগুন লাগলে তা থেকে যে গ্যাস সৃষ্টি হয় সেই গ্যাস রকেটের পিছনের সর্বনিম্নের পেট-চেপা নজ্‌ল্ (Nozzle) বা সরু নলপথ (Jet) দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসে। গ্যাসের এই প্রবল পশ্চাৎগতির প্রতিক্রিয়ায় রকেট সম্মুখগতি লাভ করে। সাধারণত রকেটের আধার থেকে তরল জ্বালানী পাম্পের সাহায্যে ইঞ্জিনে টেনে এনে দহনক্রিয়ায় যে গ্যাস সৃষ্টি হয় মোটর চালিয়ে সেই গ্যাস রকেটের নিম্নভাগের সরু নলপথে বা নজ্‌ল্ দিয়ে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রমণ করলেই রকেটটি সম্মুখদিকে গতিশীল হয় (চিত্র-৪৯)

রকেটের মধ্যেই জেটপথে নির্গমনের গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা থাকায় অর্থাৎ নিজের গ্যাস নিজেই বানিয়ে নেয় বলে রকেট বায়ুনির্ভর নয়। বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে গিয়েও তার স্বচ্ছন্দ গতি রুদ্ধ হয় না। জেটগ্যাস নির্গমনের বেগ ও পরিমাণ বাড়িয়ে রকেটেরও গতিবেগ এবং বহনক্ষমতা বাড়ানো যায়, উল্টোমুখী রকেট (Retro-rocket) চালিয়ে তার সম্মুখদিকের দ্রুতগতিতে মন্থরতা আনা যায়, রকেটের নিম্নভাগের গায়ে এদিক-ওদিক যদি গুটিকয়েক নলপথ রাখা হয় যেগুলি ইচ্ছামতো খোলা বা বন্ধ করা যায় তাহলে ঐ সকল ছিদ্রপথে গ্যাস বেরুবার সুযোগ দিয়ে রকেটের অভিমুখ পরিবর্তনও সম্ভব হয়। মোট কথা প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশলে রকেটের গতিবেগ ও গন্তব্যপথের দিক পরিবর্তন প্রভৃতি সবই বর্তমানে নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

পৃথিবীর উচ্চাকাশের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সম্পর্কে মানুষের অনুসন্ধিৎসা চিরকালের। কিন্তু জানার ইচ্ছা থাকলেও তখনকার দিনে তেমন সুষ্ঠু উপায় ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে আরম্ভ করে শতাধিক বর্ষ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে বেলুনে চড়ে বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করেছেন। এই সময় তাদের কেউ সঙ্গে নিয়ে গেছেন থার্মোমিটার প্রভৃতি পরিমাপক যন্ত্রাদি, কেউ বা নিজের উদ্ভাবিত অন্য কিছু। এক বিজ্ঞানী কতকগুলি জলভর্তি বোতল নিয়ে উড়েছিলেন,—বিভিন্ন উচ্চতায় এক এক বোতলের জল ফেলে দিয়ে সেখানকার বাতাস সেই বোতলে বন্দী করে এনেছিলেন পৃথিবীতে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে। এইভাবে খানিকদূর উচ্চাকাশের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, চাপমাত্রা, ঘনত্ব ও গঠন-উপাদান সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। বেলুনের সাহায্যে ঘন বায়ুর আবরণের বাইরে গিয়ে ঐ সামান্য উচ্চতা থেকে ক্যামেরা দ্বারা গৃহীত গ্রহ-নক্ষত্রের আলোকচিত্র

ভূপৃষ্ঠে গৃহীত আলোকচিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট,—এও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ সকল প্রচেষ্টা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কারণ ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বদিকে মাত্র ১৫-২০ মাইল বিস্তৃতির মধ্যে আছে ওজন হিসেবে বায়ুর শতকরা ৯৯ ভাগ। বেলুন উড়িয়ে দিলে উর্ধ্বে মাত্র ঐ ১৫-২০ মাইল উঠতে পারে, তার উপরে বায়ু এত হাল্‌কা যে, বেলুন সেখানে ভেসে থাকতে পারে না।

রকেটের সাহায্যে আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিজ্ঞানে উন্নত অর্থবান দেশসমূহ কর্তৃক আধারে রক্ষিত যন্ত্রাগার রকেটশীর্ষে আকাশে উৎক্ষেপণ সুরু হয়। ঐ সকল যন্ত্রপাতি ছিল স্বয়ংক্রিয় এবং আকাশে উঠবার পর পৃথিবীর কন্‌ট্রোল রুমের (Control room) বেতার নির্দেশে সেগুলি পরিচালিত হতো। আবহ-মণ্ডলের তথ্য সংগ্রহের অভিপ্রায়ে উৎক্ষিপ্ত এইসব রকেট বিভিন্ন দেশে আকার, আয়তন ও কার্যকারিতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে।

পৃথিবী ও আকাশের সম্পর্কে সমস্ত কিছু নিয়ে সমবেত গবেষণা করার উদ্দেশ্যে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা ১৯৫৭ সনের ১লা জুলাই একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৮ মাস ব্যাপী একটা কর্মসূচী গ্রহণ করে সংস্থাটির নাম দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বর্ষ (International Geophysical Year), সংক্ষেপে I. G. Y.।

রকেটের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের সূচীতে I. G. Y. যেমন দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, I. G. Y. শেষ হবার পরেও সে গতি অব্যাহত থাকে বিশেষ করে রাশিয়ায় ও আমেরিকায়। এদের সঙ্গে I. G. Y-তে যুক্ত ছিল ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি। এই সময়ে উন্নত দেশগুলির সাহচর্যে ভারতবর্ষে কেরালা রাজ্যে থুম্বা নামক স্থানে একটি আবহ গবেষণাগার স্থাপিত হয়। আমেরিকার তথ্যসংগ্রাহী রকেটগুলির নাম এয়ারো-বি, রকুন, স্কাইলার্ক, ভাইকিং, ভি-২ প্রভৃতি; রাশিয়ার রকেটগুলির নাম জিওফিজিক্যাল, মেটিরিওলজিক্যাল; ফ্রান্সের রকেটের নাম ভেরোনিক, জাপানের রকেটের নাম কাপ্পা। জার্মানীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে প্রস্তুত ভি-২ রকেটই আমেরিকায় আবহ তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত।

I. G. Y-এর মধ্যে না হলেও কিছুদিন যাবৎ ভারতের থুম্বা থেকে আবহের তথ্য-সন্ধানী দু-একটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে,—এগুলির নাম

দেওয়া হয়েছে মেনকা। ১৯৬৯ সনের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতে প্রস্তুত শুম্বা বিজ্ঞানীদের দুই পর্যায়ের রকেট সেণ্টর (Centaur)।

I. G. Y-এর সময় সীমার মধ্য থেকেই রাশিয়া ও আমেরিকা প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আকাশ সমীক্ষায় প্রবৃত্ত আছে। আমেরিকায় মহাকাশ সমীক্ষার সমস্ত পরিকল্পনা যে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তার নাম National Aeronautics & Space Administration,—সংক্ষেপে NASA।

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। মানুষের তৈরী কোন বস্তু যদি চন্দ্রের মতো পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে তবে তাকে নকল চাঁদ বা নকল উপগ্রহ বলা যেতে পারে। ১৯৫৭ সনের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীবাসীকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাশিয়া ঘোষণা করলো,—সে দেশ থেকে স্পুট্‌নিক-১ নামক এক নকল উপগ্রহ পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে এক কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে ভূপ্রদক্ষিণের জন্যে। উঁচুস্তরের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ। গোল আকৃতি স্পুট্‌নিক-১-এর ব্যাস ছিল ৫৮ সেণ্টিমিটার, ওজন ৮৩·৬ কিলোগ্র্যাম এবং পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ কাল ৯৫ মিনিট। এর পরিক্রমণের কক্ষ-পথটি উপবৃত্তাকার,—পৃথিবী থেকে তার নিম্নতম দূরত্ব বা অনুভূ ১৪০ মাইল এবং সর্বাধিক দূরত্ব বা অপভূ কিঞ্চিদধিক ৫০০ মাইল। ভূপৃষ্ঠের উত্তরে ও দক্ষিণে ৬৫ ডিগ্রী অক্ষরেখা পর্যন্ত স্পুট্‌নিক-১-এর উপবৃত্ত কক্ষপথটির বিস্তৃতি। বায়ুর ঘনত্ব ও আয়নমণ্ডলের উঁচুস্তরে ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ণয়ের সন্ধান-কার্য চালায় এই নকল উপগ্রহটি। এর ভিতরকার বেতার যন্ত্র যে বার্তা ও ধ্বনি পাঠিয়েছে পৃথিবীর বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের চাবি যথাযথ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ঘুরিয়ে আনলে সে সব শোনা গেছে। ১৯৫৮ সনের ৪ঠা জানুয়ারী স্পুট্‌নিক-১ পৃথিবীর ঘনবায়ুতে নেমে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

স্পুট্‌নিক-১ উৎক্ষেপণের একমাস পরে ৩রা নভেম্বর রাশিয়া তার দ্বিতীয় নকল চাঁদ স্পুট্‌নিক-২ পাঠায় অপর এক কক্ষপথে। স্পুট্‌নিক-২-য়ে সন্ধানী যন্ত্রপাতি ছাড়া একটি জীবন্ত কুকুর ছিল—তার নাম লাইকা। স্পুট্‌নিক-২-এর উপবৃত্ত কক্ষটির বিস্তৃতি ছিল পূর্বেরটির অনুরূপ, এর অনুভূও ১৪০ মাইল কিন্তু অপভূ ১০৩৮ মাইল। বেতার প্রেরক-যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক মাপজোকের যন্ত্র, সূর্য থেকে বিকীর্ণ অতিবেগুনী ও রঞ্জন রশ্মি পরিমাপের যন্ত্র, কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে

তথ্যানুসন্ধানী যন্ত্র, কুকুরটির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌স্পন্দনের রেখাঙ্কন যন্ত্র, প্রভৃতি স্পুট্‌নিক-২-এর মধ্যে ছিল। উচ্চ বায়ুমণ্ডলে লাইকার উপর তথা জীবদেহের উপর প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ এই অভিযানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সংলগ্ন রকেটটির প্রপেলাণ্ট পুড়ে শেষ হয়ে গেলেও সেটি স্পুট্‌নিক-২-এর দেহ থেকে বিছিন্ন না হওয়ায় এর মোট ওজন দাঁড়িয়েছিল ১১২০ পাউণ্ড। কক্ষপথে বহুবার ভূপ্রদক্ষিণ করে ১৯৫৮ সনের ১৪ই এপ্রিল এই নকল উপগ্রহটি ভূতলে অবতরণ করে। কুকুরটি কিন্তু জীবিত অবস্থায় ফেরে নি।

১৯৫৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী আমেরিকাও একটি নকল উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষেপণ করে। এটির নাম এক্সপ্লোরার-১ (Explorer-1)। ফ্লোরিডার অন্তর্গত কেপ ক্যানেভেরাল থেকে ছাড়বার সাত মিনিটের মধ্যেই এটি এক কক্ষপথে ভূপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। রকেটের শেষাংশটি নকল উপগ্রহটির দেহ সংলগ্ন হয়ে থাকায় এক্সপ্লোরার-১-এর আকৃতি দেখতে হয়েছিল চোঙের মতো—দৈর্ঘ্যে ৮০ ইঞ্চি ও ব্যাস ৬ ইঞ্চি। এটির ওজন প্রায় ৩৩ পাউণ্ড। এর উপবৃত্ত কক্ষের অনুভূ ২২৪ মাইল ও অপভূ ১৫৭৩ মাইল। পৃথিবীর বিষুব সমতলের সঙ্গে এর কক্ষসমতলের নতি প্রায় ৩৩ ডিগ্রী এবং ভূপ্রদক্ষিণ কাল ১১৫ মিনিটে একবার। যানটির বাইরের ও ভিতরের তাপমাত্রা দেখবার, কসমিক রশ্মি পরিমাপের এবং যানের গায়ে উল্কাপিণ্ডসমূহের আঘাত সংখ্যা গণনা করবার যন্ত্রপাতি ছাড়াও দুটি বেতার প্রেরক-যন্ত্র এক্সপ্লোরার-১-এর অভ্যন্তর ভাগে ছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান অত্যন্ত হাল্‌কা বায়ুতে বিচরণের ফলে এর আয়ুস্কাল বছর চারেক হতে পারে। এক্সপ্লোরার-১-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক সাফল্য এই যে, এর সাহায্যে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় আবিষ্কৃত হয়।

১৯৫৮ সনের ১৭ই মার্চ কেপ ক্যানেভেরাল থেকে আমেরিকা আর একটি নকল উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। নকল উপগ্রহটি মাত্র ৬ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোলক। এর ওজন তিন পাউণ্ড এবং ভূপ্রদক্ষিণ কাল ১৩৪ মিনিটে একবার। এর উপবৃত্ত কক্ষের অনুভূ ৪১০ মাইল অপভূ ২৫১৫ মাইল এবং ভূবিষুবের সঙ্গে এর কক্ষটির নতি ৩৩ ডিগ্রী। এই নকল উপগ্রহটির সাহায্যে উঁচুস্তরের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। এর ভিতর ছিল দুটি বেতার প্রেরক-যন্ত্র,—একটি ব্যাটারীচালিত, অন্যটি সৌরকোষচালিত। বিজ্ঞানীদের অনুমান এত উচ্চে থাকায় এই নকল চাঁদটি একশত বৎসর ভূপ্রদক্ষিণ করে চলবে।

এই সকল প্রাথমিক চেষ্টার পর রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশ থেকেই আরও বহুসংখ্যক নকল উপগ্রহ উচ্চাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে পৃথিবীর বহিরাকাশে কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদের ওজন, আকৃতি প্রভৃতিতে পার্থক্য ছিল এবং তাদের মধ্যে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতির কর্মক্ষমতাও ভিন্নতর ছিল। আমেরিকা এক্সপ্লোরার, ভ্যানগার্ড, ডিসকভারার ইত্যাদি শ্রেণীর অনেকগুলি করে নকল চাঁদ কক্ষে স্থাপন করে নানা ধরণের তথ্য সংগ্রহ করেছে—যেগুলি পরবর্তী মহাকাশ সমীক্ষায় বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। রাশিয়াও আকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় পিছনে পড়ে ছিল না।

পৃথিবীর গবেষণাগারের সঙ্গে নকল উপগ্রহের সব সময়েই বেতার সংযোগ রক্ষা করা হয়। নকল উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্যও বেতারযোগেই গবেষণাগারে পৌছায়। পৃথিবী থেকে বেতারযোগে যখন যেমন নির্দেশ যায় নকল চাঁদে রক্ষিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিসমূহ তদনুসারে আপন আপন কাজ স্বরু করে অথবা বন্ধ করে। ভূতলে নেমে আসবার নির্দেশও ঐ ভাবেই নকল উপগ্রহে পৌছায়। এই সকল রকেটযানের ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করবার পদ্ধতিও প্রত্যেক ক্ষেত্রে মোটামুটি এক। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে রকেটযানের গতিবেগ এত প্রচণ্ড হয়ে পড়ে যে, সে অবস্থায় ভূমি স্পর্শ করলে মহা বিপর্যয় অনিবার্য, আবার বায়ুর ঘর্ষণে উচ্চাকাশেও অগ্নিদগ্ধ হয়ে যেতে পারে। এ কারণে গতিবেগে মন্থরতা আনবার জন্যে উল্টোমুখী রকেট চালানো আবশ্যক এবং যানে সংযুক্ত প্যারাস্যুটও খুলে দেওয়া হয় যাতে ধীরে ধীরে অক্ষত দেহে ভূপৃষ্ঠে নামতে পারে।

পৃথিবীর থেকে কয়েক শত মাইল উঁচুতে যদি কোনও বস্তুকে পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে চলতে হয় তবে এই নকল উপগ্রহের গতিবেগ হওয়া চাই সেকেণ্ডে ৫ মাইল বা ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল। নকল চাঁদ যত উপরে উঠবে তার ভূপ্রদক্ষিণের গতিবেগ তত কম হলেই চলে। যেমন;—২২০০০ মাইল উঁচুতে নকল চাঁদের গতিবেগ সেকেণ্ডে ২ মাইলের কম, আর ২৪০০০০ মাইল উঁচুতে আসল চাঁদের গতিবেগ সেকেণ্ডে কিঞ্চিদধিক আধ মাইল।

নকল উপগ্রহ উঁচুতে উঠে দ্রুতবেগে পৃথিবীর চারদিকে এক কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে থাকে। দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণের জন্যে এটিতে বহির্মুখী কেন্দ্রাতিগ গতি বা সেণ্ট্রিফিউগাল ফোর্স (Centrifugal Force) সঞ্চার হয়। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে এটি কক্ষপথেই থাকে, বাইরে বেরিয়ে যেতে

পারে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ গতি ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান—এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির সমতা সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে নকল উপগ্রহটির কোন কিছুতেই মাধ্যাকর্ষণের টান নেই, সবই ভারহীন। এর মধ্যে মানুষ থাকলে সেও ভারহীন হয়ে পড়বে, তারও মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি থাকবে না।

রকেট অভিযানে প্রাথমিক সাফল্যের পর বিজ্ঞানীরা ব্যগ্র হলেন মহাশূন্যে রকেটযানে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে। চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ নামাবার পরিকল্পনাও ছিল বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার এক প্রধান অঙ্গ। এসকল উপলক্ষে প্রথম স্পুটনিকের সময় থেকে বিগত ১১।১২ বছরে রকেট অভিযানের ঘটনাপঞ্জী এত বিরাট হয়ে উঠেছে যে, তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাই মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

নকল উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণ আরম্ভের কিছুদিনের মধ্যেই সুদূর আকাশে মহাশূন্য অভিমুখে রকেট শীর্ষে যন্ত্রপাতি উৎক্ষেপণ সুরু হয়। এগুলিকে স্পেস প্রোব (Space Probe) বা মহাশূন্য সন্ধানী অভিযান বলা হয়। ভূবেষ্টনী কোন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ এদের লক্ষ্য নয় বলে পৃথিবী থেকে প্রস্থানবেগ-সঞ্চারী শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে উর্ধ্বমুখে এরা উৎক্ষিপ্ত হয়। ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের পরিধি নির্ণয় ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ছিল রাশিয়ার লুনিক শ্রেণীর ও আমেরিকার পাইওনিয়ার শ্রেণীর কতকগুলি মহাশূন্যগামী রকেটের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। একটি লুনিক ও পাইওনিয়ার-৪ আপন আপন কর্ম সমাপনান্তে আরও উঁচুতে উঠে গেছে এবং বর্তমানে ঐ লুনিক ১৫ মাসে ও চতুর্থ পাইওনিয়ারটি ৪০০ দিনে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করতে করতে নকল গ্রহরূপে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। ১৯৬০ সনের ১৭ই মার্চ পাইওনিয়ার-৫ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ১৮ই মার্চ এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ মাইল উঁচুতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সৌরকোষ-চালিত বেতার প্রেরক-যন্ত্র থেকে রকেটযানটি যে সব সঙ্কেত পাঠায় ভূপৃষ্ঠে সেগুলি স্পষ্ট শোনা যায়। দূরপাল্লার সঙ্কেত আদান-প্রদানে এটিই ছিল সেদিনকার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র। এর পরে মহাশূন্য সন্ধানী রকেট যানগুলির তথ্য সংগ্রহ ক্ষমতা ও ভ্রমণ-শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হয়েছে।

রাশিয়া ও আমেরিকা ক্রমে ক্রমে বহু রকেটযান তথ্যানুসন্ধানের জন্যে চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অভিমুখে পাঠিয়েছে।

আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত ম্যারিনার-৪ নামক একটি রকেটযান সাত মাসেরও বেশী সময় ক্রমাগত ছুটে ১৩ কোটি মাইল অতিক্রম করে ১৯৬৫ সনের ১৪ই জুন মঙ্গল গ্রহের প্রায় ৬ হাজার মাইলের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে তার যন্ত্রপাতিসমূহ ২১টি টেলিভিসন ছবি পাঠায়।

কতকগুলি অসফল প্রচেষ্টার পর রাশিয়া প্রেরিত ভেনাস-৪ নামক একটি রকেটযান আড়াই কোটি মাইল ছুটে গিয়ে ১৯৬৭ সনের ৯ই অক্টোবর শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে একটি যন্ত্র নামিয়ে দিতে সমর্থ হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি সম্পূর্ণ অক্ষত থাকে এবং পৃথিবীর উদ্দেশ্যে তথাকার নৈসর্গিক অবস্থা সম্পর্কে বার্তা প্রেরণ করে। ভেনাস-৪ শুক্রের পৌঁছবার দেড়দিন পর আমেরিকা প্রেরিত ম্যারিনার-৫ শুক্রের ২৫০০ মাইল দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে কিন্তু যাওয়ার পথে ম্যারিনার-৫ কিছু তথ্যপূর্ণ বার্তা পৃথিবীকে জানিয়ে গেছে।

চারমাস কাল অবিশ্রান্ত পথ পরিক্রমায় ষোল কোটি মাইল অতিক্রম করে রাশিয়া প্রেরিত দুই মহাকাশ যান ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ ১৯৬৯ সনের ১৬ই মে ও ১৭ই মে শুক্রপৃষ্ঠে প্যারাসুট সাহায্যে অবতরণ করতে সমর্থ হয়। এরা শুক্রের আবহমণ্ডলে প্রবেশ পথে সুস্পষ্ট ও জোরালো বেতার-বার্তা পাঠায়, যা পৃথিবীর অনেক বেতার মানমন্দিরে ধরা পড়েছে। গ্রহগণের অন্তর্বর্তী মহাকাশের প্রাকৃতিক অবস্থাদি বিষয়ে উভয় যানের যন্ত্রাগার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৃথিবীতে এসেছে,—যেগুলি বিশ্ব বিবর্তনের ইতিহাস রচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে পথের সন্ধান দিতে পারবে। এদের কাছ থেকেই জানা গেছে শুক্রের আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা অন্যূন ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ঐ আবহমণ্ডলের গঠন-উপাদানে সামান্য নাইট্রোজেন ছাড়া বাকী সর্বাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড। তাছাড়া শুক্রপৃষ্ঠে আবহমণ্ডলের চাপ ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু চাপের কুড়ি গুন। অর্থাৎ শুক্রগ্রহ মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

১৯৫৯ সন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত রাশিয়া ও আমেরিকা বহু রকেটযান চন্দ্র অভিমুখে উৎক্ষেপণ করেছে এবং তথ্য সংগ্রহে তাদের সাফল্য ও অসাফল্য নিয়ে এক বিস্তৃত ইতিহাস ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে।

উপরোক্ত রকেটযানগুলিকে মহাশূন্যে পাঠাতে রকেটগুলিতেও অনেক রকমের সংস্কার সাধন করতে হয়েছে। পৃথিবী থেকে পদার্থের প্রস্থানবেগ সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বা ৭ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪০০০০ কিলোমিটার বা ২৫০০০ মাইল। একটি মাত্র রকেট দিয়ে কোনও যানে এই গতিবেগ

সঞ্চার করা যায় না। তাই একটির মাথায় আর একটি—এই ভাবে কয়েকটি রকেট পর পর সাজিয়ে বহুপর্যায়ী (Multistage) রকেট প্রস্তুত হয়। বহুপর্যায়ী রকেটে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে প্রথমটির প্রপেলাণ্ট শেষ হলেই দ্বিতীয়টি চালু হয়, তারপর তৃতীয়টি। প্রপেলাণ্ট যার শেষ হয়ে গেল তার কাজও ফুরালো। মস্ত বড় ধাতব দেহের এই অকারণ বোঝাটি বহন করবার সার্থকতা নেই বলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এটি খসে পড়ে যায়। বেশ কিছুটা হাল্‌কা হওয়ায় এবার দ্বিতীয়টির ধাক্কায় রকেটযানটি আরও অনেক বেশী দূর উপরে ওঠে। এটিও খসে পড়ে গেলে তৃতীয়টির কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম রকেটটি যানে যে গতি সঞ্চার করে দেয়, দ্বিতীয় রকেট সেই গতিতে আরও গতিবেগ যোগ করে, তৃতীয়টি আরও করে,—এই ভাবে ধাপে ধাপে গতিবেগ বেড়ে গিয়ে অবশেষে যানখানা উপরোক্ত প্রস্থানবেগে উপনীত হলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাশূন্যে যাত্রা স্থুরু করে।

মহাকাশে মানুষ

পৃথিবীর আকাশে বা মহাশূন্যে কতকগুলি যান্ত্রিক গবেষণাগার পাঠিয়ে আবহমণ্ডলের তথ্য সংগ্রহ করেই মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারে না। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী। যান্ত্রিক গবেষণাগার দিয়ে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়,—তাই বুদ্ধিমান মানুষকে যেতে হবে মহাকাশে। সংগৃহীত তথ্যাদিতে ক্রমে ক্রমে জানা গেছে উচ্চাকাশে বিষাক্ত বিকিরণের প্রাচুর্য, বায়ুহীনতা অতএব চাপহীনতা, অত্যুচ্চ ও অতি নিম্ন তাপ প্রভৃতি। এজন্যে নভচারীর পোষাক-পরিচ্ছদে এবং নভযানের অভ্যন্তরে ও বহিরঙ্গে বিবিধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চাই। আর চাই যানের ভূতলে প্রত্যাবর্তনের নিরাপদ ও ত্রুটিহীন পরিকল্পনা। উল্লিখিত অসংখ্য সমস্যার প্রতিটিরই নিখুঁত সমাধান করতে হবে ভূপৃষ্ঠে বসে এবং ব্যবহারিক পর্যায়ে আকাশের উঁচুতলায় নভচারী পাঠিয়ে। নকল চাঁদ আকাশে প্রেরণের সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা বিগত কয়েক বছর যাবৎ এ কাজে ব্রতী আছেন। বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন এই সকল কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্য দিয়ে পৃথিবীর জনসাধারণকে বিস্ময় বিমূঢ় করে রেখেছেন। তাঁদের পূর্ব প্রচেষ্টার ত্রুটিচ্যুতি পরের প্রচেষ্টায় সংশোধিত হয়ে সফলতা এনে দিচ্ছে। এইভাবে পূর্ববর্তী দিন পরবর্তী দিনকে সমৃদ্ধ করছে।

১৯৫৭ সনে রাশিয়া স্পুট্‌নিক-২-য়ে লাইকা নামক এক কুকুরকে উচ্চাকাশ

পরিক্রমা করিয়েছিল কিন্তু তাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে পারে নি। ১৯৬০ সনের ১৯শে আগষ্ট রাশিয়া অন্য একটি নকল উপগ্রহে বেল্‌কা ও স্ট্রেল্‌কা নামক ছুটি কুকুর, সাদা ও কালো রঙের কয়েকটি ইঁহুর, বোতলে কতকগুলি মাছি ও কিছু চারাগাছ পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষ ভ্রমণে পাঠিয়েছিল। এই বৃহৎ যানখানি ২০০ মাইল উর্ধ্বে দেড় ঘণ্টায় একবার করে ভূপ্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইভাবে ১৭ বার প্রদক্ষিণের পর ১৮ বারের সময় পৃথিবীর মানুষের বেতার সঙ্কেত মান্য করে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে রাশিয়ার ভূমিতে প্রায় পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে। কুকুর ছুটি ও অন্যান্য প্রাণীরা বেঁচে ছিল এবং উচ্চাকাশে জীবদেহে প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর তারাই প্রথম বহন করে আনে।

আমেরিকায়ও একটি বাঁদরকে রকেটশীর্ষস্থ আধারে বসিয়ে ৬০ মাইল উঁচু থেকে বেড়িয়ে আনানো হয়েছিল। ভূতলে নেমে রকেটযান থেকে বেরিয়েই বাঁদরটি লম্ফ দিয়ে পালিয়ে যায়। মানুষের এই মারাত্মক খেলা বোধ হয় তার তেমন মনঃপুত হয় নি।

এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয় মানব নভচারীর পোষাক পরিচ্ছদের এবং মানব-আরোহী যানের জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পরিকল্পনা।

১৯৬১ সনের ১২ই এপ্রিল রাশিয়া সর্বপ্রথম মহাকাশে মানব অভিযাত্রী প্রেরণ করে। অভিযাত্রীর নাম ইউরী গ্যাগারিন। মহাকাশযানের নাম ভষ্টক-১। ভষ্টক-১-য়ে আরোহণ করে গ্যাগারিন ১০৮ মিনিটে পৃথিবীর এক কক্ষপথে একবারের সামান্য বেশী পরিক্রমা করে নিরাপদে ভূতলে নামেন। ভূপৃষ্ঠে থেকে তার কক্ষের নিকটতম ও দীর্ঘতম দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ১০৯ ও ৮৭ মাইল। গ্যাগারিন তাঁর যানের কামরায় বসে তাঁর উপর ন্যস্ত কর্ম সুসম্পন্ন করেন নিজের ভারহীন অবস্থায়। কক্ষ পরিক্রমা কালে তিনি দেখেছিলেন মহাকাশ ঘোর অন্ধকার, দিনের বেলায় প্রখর সূর্য থাকা সত্ত্বেও নিষ্কম্প উজ্জ্বল নক্ষত্র দৃশ্যমান। নামবার সময়ে ঘনবায়ুতে তিনি দেখেছিলেন তাঁর যানের বহির্ভাগে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে যদিও যানের ভিতরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল। এর বছর ছয়েক পরে এক বিমান দুর্ঘটনায় গ্যাগারিনের মৃত্যু হয়।

রাশিয়ার দ্বিতীয় নভচারী তিতভ। তিনিও মহাকাশ পরিক্রমা করে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে নেমে গ্যাগারিনের অনুরূপ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

১৯৬১ সনের ৫ই মে আমেরিকার মহাকাশযাত্রী এলান শেপার্ড কেপ ক্যানাভেরাল থেকে সোজাসুজি উপরে মহাকাশে উঠে আবার নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে নেমে আসেন। ঐ বছরই ২১শে জুলাই দ্বিতীয় মার্কিন অভিযাত্রী ভার্জিল গ্রিসম ঐ ভাবেই মহাকাশ জয় করেন। মার্কিন নভচারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি আকাশের এক কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন তার নাম জন গ্লেন। ১৯৬২ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে আকাশে উঠে তিন বার পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমা করে ঘণ্টা পাঁচেক পরে নিরাপদে এসে আটলান্টিক মহাসাগরে নামেন। এর তিন মাস পরে স্কট কার্পেণ্টার নামক অপর এক মার্কিন নভচারীও বার তিনেক ভূপ্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন।

এর পরের খবর রাশিয়ায়। ১৯৬২ সনের ১১ই আগষ্ট রুশ নাগরিক মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করেন। রাশিয়ার এই তৃতীয় অভিযাত্রীর যানের নাম ভষ্টক-৩।

এর পরের দিনই রাশিয়ার চতুর্থ অভিযাত্রী পাভেল পপোভিচ ভষ্টক-৪ নামক যানে মহাকাশে উঠে পরিক্রমা সুরু করেন। ভষ্টক-৩ ও ভষ্টক-৪ একই কক্ষপথে পরস্পর থেকে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধান রেখে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই জোট বাঁধা অবস্থায় নভচারীদ্বয় পরস্পরের মধ্যে বেতার সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হন; পৃথিবীর সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবেও তাঁদের বেতার যোগাযোগ তো ছিলই। নিকোলায়েভ কিঞ্চিদধিক ৯৪ ঘণ্টায় ৬৩-৬৪ বার ও পপোভিচ প্রায় ৭১ ঘণ্টায় ৪৭-৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ১৫ই আগষ্ট উভয়ে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করেন।

এই বছরই কেপ ক্যানাভেরাল থেকে আকাশে উঠে মার্কিন নাগরিক ওয়াল্টার সিরা ৬ বার ভূপ্রদক্ষিণ করে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে নামেন।

পরবর্তী মার্কিন অভিযানটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ১৯৬৩ সনের ১৫ই মে মার্কিন অভিযাত্রী গর্ডন কুপার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে ফেইথ-৭ নামক মহাকাশ যানে মহাশূন্যে যাত্রা করেন। ৯৫ ফুট দীর্ঘ অ্যাটলাস রকেট মাথায় করে ফেইথ-৭-কে আকাশে নিয়ে যায়। শূন্যে কুপার ঠিকভাবে তাঁর যানটিকে ঘুরিয়ে ভূপ্রদক্ষিণের কক্ষে স্থাপন করেন। ৩৫ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে ২২ বার পৃথিবীর চতুর্দিক পরিক্রমা করে ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর নিজের যেমন প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদেরও

রেখেছি। ১৯ বারের প্রদক্ষিণের সময়ে যানের একটি বাতি নিভে যাওয়ায় কুপার বিপদের সংকেত পেলেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বেতারে জানালেন কুপারের অ্যাটোমেটিক কন্ট্রোলের দুই-তৃতীয়াংশ বিকল হয়ে যাওয়ায় যানের আয়নিক যন্ত্রাদি অকেজো হয়ে গেছে, তবে নেমে আসতে অসুবিধা হবে না। নামবার সময়ে যখন উল্টোমুখী রকেট চালাতে হবে তখন সেই অ্যাটোমেটিক কন্ট্রোলের অবশিষ্টাংশও বিকল হয়ে গেছে। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অবিচলিত ধীর স্থির মস্তিষ্কে কুপার হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে নামতে সমর্থ হলেন। কুপার বলেছেন একবার নিদ্রা-কালে তিনি দেখেন তাঁর ভারহীন দেহের হাত দুটি প্রসারিত অবস্থায় ভেসে রয়েছে। পাছে কোনও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সুইচে হাত লেগে যায় এই ভয়ে তিনি এর পর থেকে ঘুমোবার আগে কাঁধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে হাত বেঁধে নিতেন।

১৯৬৩ সনের জুন মাসে ভস্টক-৬-এ আরোহণ করে রাশিয়ার মহাকাশ চারিণী শ্রীমতী ভেলেনতিনা তেরেশকোভা মহাশূন্যে উঠে ৪৮ বার ভূপ্রদক্ষিণ করে নিরাপদে ভূতলে অবতরণ করেন। রাশিয়া ও আমেরিকার মহাকাশচারীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত ইনিই একমাত্র মহিলা।

১৯৬৪ সনের ১২ই অক্টোবর প্রথম বহু আসনযুক্ত মহাকাশযান রাশিয়া থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই যানে তিনজন নভচারী ছিলেন। ১৯৬৫ সনের মার্চে রুশ নভচারী আলেক্সি লিওনভ মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে বিচরণ করেন। যানে ফিরে যেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্যে যানের সঙ্গে দড়ি দিয়ে তাঁর শরীর বাঁধা ছিল।

১৯৬৫ সনে আমেরিকা থেকে মানব আরোহীসহ উৎক্ষিপ্ত জেমিনি-৬ এবং জেমিনি-৭ নামক দুইখানি মহাকাশযান একই কক্ষপথে এসে মিলিত হয়ে একত্রে ভূপ্রদক্ষিণ করে। এদের মধ্যে গ্রন্থিবন্ধন হয় নি, কিন্তু গ্রন্থিবন্ধন যে সম্ভব এ কথা তখনই বুঝা গিয়েছিল। ১৯৬৬ সনের জুলাই মাসে মার্কিন নভচারীসহ আর একটি মহাকাশ যান জেমিনি-১০ ঊর্ধ্বাকাশে ওঠে। ভূপ্রদক্ষিণ-রত অবস্থায় এই যানখানি এক মনুষ্যবিহীন নকল উপগ্রহের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করতে সমর্থ হয়।

এর পর দুইটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে,—একটি রাশিয়ায় অপরটি আমেরিকায়। রুশ নাগরিক কমোরোভ নভচারণা করে নামবার সময়ে দড়ি জড়িয়ে প্যারাশুট না খোলায় তার যানখানি দ্রুত বেগে এসে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

অতিক্রান্ত হলে, কমান্ডোরাও নিরত হন। আমেরিকার তিন নভচারী একত্রে মহাকাশে পাড়ি দেবার মহড়ায় তাঁদের যানে আগুন ধরে যায়। নভচারী তিনজন,—হোয়াইট, গ্রিসম ও চ্যাফে সেই আগুনে ভস্মীভূত হন।

১৯৬৯ সনের ১৪ই জানুয়ারী পৃথিবীবাসীকে বিস্মিত করে রাশিয়া মহাকাশে আর একটি রোমাঞ্চকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কর্নেল ভ্লাদিমির শাতালভের পরিচালনাধীনে সোয়ুজ-৪ নামক একটি যান উৎক্ষেপণের পরদিন বোরিস ভলিনভের পরিচালনাধীনে সোয়ুজ-৫ নামে আর একটি যান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। সোয়ুজ-৫-এ আরও দুইজন নভচারী ছিলেন—এঁরা আলেক্সি ইয়েলিসিয়েভ ও ইয়েভগেনী ক্রুনভ। ১৬ই জানুয়ারী সোয়ুজ-৪ ও সোয়ুজ-৫ পৃথিবী থেকে ১৫০ মাইল ঊর্ধ্বাকাশে মিলিত হয়। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব যখন মাত্র শতাধিক ফুট তখন শাতালভ সোয়ুজ-৪ কে হস্তচালিত যন্ত্র সাহায্যে সোয়ুজ-৫-এর পাশে নিয়ে আসেন। উভয়েরই গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল। উভয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধন হয় এবং ইলেকট্রিক সংযোগও স্থাপিত হয়। উভয়ে সাড়ে চার ঘণ্টা একত্রিত অবস্থায় পরিক্রমার পর প্রতি ঘণ্টায় তারা আবার স্বকীয় প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে সোয়ুজ-৫-এর আরোহীরা ক্রুনভ ও ইয়েলিসিয়েভ একে একে যান থেকে বেরিয়ে এসে আকাশে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বিচরণ করেন। তাঁদের শরীর যানের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল না। জীবন্ত মানব চাঁদরূপে মহাকাশে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে তাঁরা একে একে এবার গিয়ে সোয়ুজ-৪-এ উঠে শাতালভের সঙ্গে মিলিত হন। শাতালভ তার অতিথি-দের সমেত সোয়ুজ-৪-কে কাজাকস্তানে ধীরে ধীরে অবতরণ করান। ঘণ্টা কয়েক পরে সোয়ুজ-৫ও নিরাপদে নেমে আসে।

এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো ঊর্ধ্বাকাশে নকল উপগ্রহে স্থায়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্ভব। পৃথিবী থেকে এক মহাকাশযান খেয়ানৌকার মতো ঐ বিজ্ঞানাগারে যাতায়াত করে মানুষ ও মালপত্র পারাপার করতে পারবে।

উপরোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আকাশচারণার পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে বহুবিধ অত্যাবশ্যক নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে এখানে দু-একটির উল্লেখ করা হচ্ছে।

ভূপৃষ্ঠের উপরের দিকে বায়ুর ঘনত্ব ক্রমে বিরল হতে বিরলতর এবং বায়ুর চাপও ক্রমান্বয়ে কম হওয়ায় ঊর্ধ্বাকাশ জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল নয়। এ

জন্যে মানবারোহী-যানের অভ্যন্তর ভাগকে বাইরের পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুচাপের অনুরূপ চাপ যানের ভিতর কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয়। নভচারীদের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবার জন্যে যানের মধ্যে রক্ষিত তরল অক্সিজেনের ভাণ্ডার থেকে অক্সিজেন গ্যাসের সরবরাহ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের ব্যবস্থাও যানের আভ্যন্তরীণ আবহে করা হয়। অন্যান্য যে সব জিনিষ যানের মধ্যে অপরিহার্য তার মধ্যে আছে নভচারীদের খাদ্য, পানীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ, পৃথিবীর কণ্ট্রোল রুমের পরিচালনাধীনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, হস্তচালিত কলকব্জা, বেতার প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র, বহির্বিশ্ব অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও ক্যামেরা ইত্যাদি। এ ছাড়া ভারহীন নভচারীদের হাঁটাচলার সুবিধার জন্যে যানের মধ্যে কতকগুলি দড়ি টাঙিয়ে রাখা হয়।

অত্যুচ্চ ও অতিনিম্ন তাপ-নিরোধক বর্মদ্বারা মহাকাশযানের বহিরঙ্গ আচ্ছাদিত থাকে। বাইরের দৃশ্যাবলী দেখবার জন্যে যানের স্বচ্ছ জানালা বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত। আভ্যন্তরীণ আবহে কোন ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে দরজা দিয়ে যান থেকে বেরিয়ে আসা ও যানের ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বিষাক্ত বিকিরণ প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থের আক্রমণ প্রতিরোধী পোষাক পরিহিত নভচারী যখন যানের বাইরে মহাকাশ বিচরণ করতে বেরিয়ে আসেন তখন ঐ পোষাককে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়। বায়ুচাপ সংরক্ষিত ঐ পোষাকের মধ্যেই থাকে অক্সিজেন সরবরাহ, কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ও তাপ-নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা। এ ছাড়া পোষাকের মধ্যে থাকে ছোট বন্দুক। বন্দুক চালিয়ে তার বিপরীত ধাক্কায় নভচারী মুক্ত অঙ্গনে ইচ্ছামতো স্থানে সরে যেতে পারেন (প্লেট নং ষ)।

ভূপৃষ্ঠ থেকে যাত্রাকালে রকেটের ধাক্কায় যখন মহাকাশযান প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠতে আরম্ভ করে তখন মিনিট কয়েক নভচারীগণের শরীরের উপর চাপ ভয়ানক বেড়ে যায়। এই চাপ মাধ্যাকর্ষণের চার পাঁচ গুণ হওয়া বিচিত্র নয়, তার বেশীও হতে পারে। কাজেই নভচারীকে শুধু সুস্থ নয়, তাকে সবলও হতে হবে যাতে ঐ প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে শুইয়ে ফেলবে, কাজেই প্রথম থেকেই শুয়ে থাকতে হয়। সবচেয়ে ভাল বন্দোবস্ত আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত থাকা।

মহাকাশযান কক্ষপথে ভূপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করলে তার উপর মাধ্যাকর্ষণ

নিষ্ক্রিয়,—এ অবস্থায় যানের মধ্যে কোন কিছুরই ভার নেই। মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য বঞ্চিত নভচারীর তখন আপন পেশীই একমাত্র ভরসা। যেমন,—জল খেয়ে গেলাসটা ছেড়ে দিলে সেটা সেখানেই ভেসে থাকবে, মেঝেতে রাখতে হলে আরোহীকে নিজের পেশীর সাহায্য নিতে হবে।

মহাকাশে সম্ভাব্য সকল রকম নৈসর্গিক পরিস্থিতি কৃত্রিম উপায়ে ভূপৃষ্ঠের প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করে নির্বাচিত নভচারীদের সেই প্রকোষ্ঠে বসবাস করে অনেক দিন ধরে শিক্ষানবিশি করতে হয়।

চাঁদের দেশে

রাশিয়া এবং আমেরিকা ১৯৫৯ সন থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩০টির বেশী মানব আরোহীবিহীন রকেটযান চাঁদের দেশে পাঠিয়েছে। চন্দ্রাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত রাশিয়ার রকেটযানগুলির নাম লুনা ১,২,…, জোণ্ড-১,২,… ইত্যাদি, আমেরিকার যানগুলির নাম রেঞ্জার-১,২,…, সারভেয়ার-১,২,…, অরবিটার -১,২,… প্রভৃতি। উভয় দেশের যানগুলির মধ্যে ৭টি চাঁদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে অনন্ত শূন্যে হারিয়ে গেছে, চাঁদের পিঠে আঘাত করে ১১টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, ৬টি ধীরে ধীরে নেমে চন্দ্রপৃষ্ঠে বসতে পেরেছে, ৮টি চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করেছিল তবে এতদিনে বোধহয় চন্দ্রপৃষ্ঠে আছ্‌ড়ে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। চন্দ্রের সান্নিধ্য থেকে লুনা-৩ ফিরে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ভস্মীভূত হয়েছে, আবার রাশিয়ারই জোণ্ড-৫ চন্দ্র প্রদক্ষিণের পর নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছে।

চন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই সকল অভিযান। রকেটের শীর্ষে একটি আধার সংলগ্ন করা হয়। সেই আধারে রাখা হয় ক্যামেরা ও বেতার যোগাযোগের যন্ত্রপাতি। রকেটযান চন্দ্রের সান্নিধ্যে উপস্থিত হলে পৃথিবীর বেতার সঙ্কেত পেয়ে ক্যামেরার মুখ খুলে যায়। ক্যামেরার আলোকচিত্রই টেলিভিসন ব্যবস্থায় পৃথিবীতে এসে পৌছায়। উপরোক্ত রকেটযানগুলি এইভাবে যত টেলিভিসন ছবি পাঠিয়েছে তাতে চন্দ্রের দৃশ্য ও অদৃশ্য পিঠসহ সম্পূর্ণ চন্দ্রগোলকের আলোকচিত্র বিজ্ঞানীরা পেয়ে গেছেন। চন্দ্রের পর্বত, গহ্বর, ক্ষুদ্র-বৃহৎ খাদসহ সমতল ভূমি ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই ভৌগোলিক বিবরণ বিজ্ঞানীরা এখন জানেন। তদনুযায়ী কোথায় মানুষের অবতরণযোগ্য স্থান চন্দ্রপৃষ্ঠে আছে তাও মোটামুটি অনুমিত হয়েছে। কিন্তু নভচারীকে চন্দ্রপৃষ্ঠে

নামানো এবং তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৯৬৮ সনেও শেষ হয় নি।

১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি রাশিয়া জোণ্ড-৫ নামক একটি রকেটযান নানাবিধ যন্ত্রপাতিসমেত চন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করে। যানে একটি কচ্ছপও ছিল। রকেটযানটি স্বল্প দূরত্বে চন্দ্রের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। যাত্রার ছয়দিন পর আবার পৃথিবীতে ভারত মহাসাগরের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে অক্ষত অবস্থায় অবতরণ করতে সমর্থ হয়। কচ্ছপটির দেহে মহাশূন্যের বিষাক্ত রশ্মিসমূহের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ পরে ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। জোণ্ড-৫-এর এই অভিযান দ্বারা মানুষের পক্ষে পৃথিবী থেকে চন্দ্রে ও গ্রহান্তরে যাওয়ার এবং পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার ব্যবস্থায় এক চাঞ্চল্যকর বৈজ্ঞানিক সাফল্য সূচিত হয়েছে।

এর পর কেবল যান নয়, তিনজন মানব নভচারীকে নিয়ে একটি যান চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে এসে নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেছে। পরীক্ষাটি আমেরিকার এক অতুলনীয় কৃতিত্ব। যানটির নাম অ্যাপোলো-৮। ১৯৬৮ সনের ২১শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে তিনজন অভিযাত্রীসহ অ্যাপোলো-৮ নামক এক অতিকায় মহাকাশযান আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে চন্দ্র প্রদক্ষিণের জন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই দুঃসাহসিক অভিযানটি যেমন রোমাঞ্চকর, এতে প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উৎকর্ষ তেমনি বিস্ময়কর। মানব কৃতিত্বের পঞ্জী রচয়িতারা বলেন এই অভিযানের বিবরণ দিতে গেলে বিশেষণ সমূহে তম প্রত্যয় যোগ করেও কৃতিত্বের পরিমাপ হয় না। NASA পরিচালিত হাউসটনস্থিত মহাকাশ পরীক্ষা কেন্দ্রের (Space Centre) নয় সহস্রাধিক বিজ্ঞানী ও কর্মীর সমবেত কর্মযজ্ঞের অবদান এই অতুলনীয় অভিযান। চন্দ্র বিজয়ে অ্যাপোলো সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে প্রজেক্ট অ্যাপোলো (Project Apollo) আখ্যা দেওয়া হয়।

মহাকাশচারী তিনজনের নাম ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, উইলিয়াম এ এণ্ডারস্, ও জেমস্ এ লোভেল। চন্দ্র প্রদক্ষিণের পর সুস্থ শরীরে এঁরা ২৭ শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত ৯ টা ২১ মিনিটে হাওয়াই দ্বীপের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করেন। এঁরা শুধু চন্দ্রলোক ফেরত প্রথম মানব নন, এঁরা দ্রুততম পথিক, সবচেয়ে দূর জগতে প্রথম মানব যাত্রী, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে চন্দ্রের অভিকর্ষের অনুভূতি এঁরা প্রথম পেলেন, চন্দ্র প্রদক্ষিণ করলেন, চন্দ্রের

অদৃশ্য পিঠ এঁরাই প্রথম স্বচক্ষে দেখলেন, জন্মভূমি পৃথিবীকে দেখলেন আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে চন্দ্ররূপে।

রকেটের সাহায্যে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানখানাকে ভূমি থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ঠেলে তুলে ধাপে ধাপে তার গতিবেগ বাড়ানো হয় এবং যানটি মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে গেলে চাঁদের দেশে পাড়ি দিতে আরম্ভ করে। তিন পর্যায়ের এই রকেটটির নাম স্যাটার্ন-৫। মহাশক্তিধর এই রকেট। যানের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় রকেটটির দৈর্ঘ্য ৩৬৪ ফুট বা ১০৯ মিটার এবং ওজন সর্বসমেত ৬১০০০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ২৮০০ টন। যানসমেত রকেট উৎক্ষেপণ করা হয় একটি সুদৃঢ় মঞ্চের উপর থেকে।

স্যাটার্ন-৫-এর প্রথম পর্যায়ের রকেট অ্যাপোলো-৮ যানখানিকে আড়াই মিনিটে ঘন বায়ুস্তর ভেদ করে ৬১ কিলোমিটার বা প্রায় ৩৮ মাইল উপরে তুলে দিলে তার জ্বালানী ফুরিয়ে যায় এবং এর খোলসটি খুলে পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটি চালু হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০০ কিঃ মিঃ ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে দ্বিতীয় রকেটের খোলসও খসে পড়ে যায়। তখন যানের গতিবেগ ঘণ্টায় ২২০০০ কিঃমিঃ। এবার তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের কাজ সুরু হয়। এই রকেটটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য অর্থাৎ ইঞ্জিনে জ্বালানীর যোগান দিয়ে বা না-দিয়ে এটিকে চালু করা বা বন্ধ করা যায়। এই রকেটটি চালু করে যানের গতিবেগ যখন ঘণ্টায় ২৮০০০ কিঃমিঃ ওঠে তখন যানখানি ভূপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করে ও রকেটটি নিবিয়ে দেওয়া হয়। দুইবার ভূপ্রদক্ষিণের পর তৃতীয় বারের সময় রকেটটি আবার চালু করে দিয়ে যানটির গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০০০০ কিঃ মিঃ বা ২৫০০০ মাইল পৌঁছলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং পৃথিবী থেকে এই প্রস্থানবেগসহ অভিযাত্রীদের নিয়ে যানটি মহাশূন্যে যাত্রা সুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্যাটার্নের এই তৃতীয় রকেটটিও অ্যাপোলো যানের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং যানটি স্বকীয় গতিবেগে চন্দ্রাভিমুখে ছুটে চলে।

স্যাটার্ন-৫-এর খোলসগুলি একে একে তিনটিই পরিত্যক্ত হলেও অ্যাপোলো যানের দেহ সংলগ্ন আছে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট রকেট ও তাদের জ্বালানী ভাণ্ডার,—যেগুলির প্রয়োজন হবে চাঁদের আকাশে গতি নিয়ন্ত্রণে এবং প্রত্যাবর্তন সময়ে চাঁদের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করার প্রয়োজনে।

মঙ্গলবার ২৪শে ডিসেম্বর চাঁদের দেশে পৌছে উল্টোমুখী রকেট চালিয়ে যানের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০০০ কিলোমিটার করা হলে যানটি চন্দ্রের চতুর্দিকে

এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। কক্ষে স্থাপন কালে যানটি চন্দ্রের অদৃশ্য পিঠের দিকে ছিল। দ্বিতীয় বার প্রদক্ষিণের পর যানের কক্ষপথ বৃত্তাকার করা হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠ ও অ্যাপোলো-৮-এর ভ্রমণকক্ষের মধ্যে তখন ব্যবধান ছিল মাত্র ১১৩ কিঃ মিঃ বা প্রায় ৭০ মাইল। অ্যাপোলো-৮ মোট দশবার চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছে, প্রতিবারে সময় লেগেছে দুই ঘণ্টা। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণকালে যানটি যখন চাঁদের অদৃশ্য দিকে চলে যেত তখন ৪৫ মিনিট পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন বেতার যোগাযোগ থাকতো না। চাঁদের কক্ষে ২০ ঘণ্টা কাটিয়ে নভচারীরা রকেট চালু করেন এবং চাঁদের অদৃশ্য পিঠের দিকে থাকা অবস্থায় তার অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন হয়ে পৃথিবী অভিমুখে অ্যাপোলো-৮ এর প্রত্যাবর্তন স্থরু হয়। চাঁদের দেশ থেকে যাত্রার ১১ ঘণ্টা পরে পৃথিবী ও চন্দ্রের সম-অভিকর্ষ ক্ষেত্র পার হয়ে অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এ কয়দিন নভচারীরা পৃথিবীতে অনেক টেলিভিসন ফটো পাঠিয়েছেন এবং চন্দ্রের দৃশ্য ও অদৃশ্য পিঠের বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতে কোন অভিযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে মনুষ্য অবতরণের উপযোগী ৫ টি স্থান নভচারীরা নির্বাচন করে এসেছেন। এই অভিযানে পূর্ব নির্ধারিত পথ ধরেই অ্যাপোলো-৮ যাতায়াত করেছে, এজন্যে পূর্বকৃত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তনের দরকার নভচারীদের সমক্ষে উপস্থিত হয় নি।

শুক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর নভচারীরা তাঁদের মহাকাশযান প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপ থেকে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে অপেক্ষমান জাহাজ ইয়র্কটাউন থেকে মাত্র ৫০০০ গজ দূরে কাটায় কাটায় পূর্ব নির্ধারিত সময়ে অবতরণ করান। তখন ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ২১ মিনিট। একটি হেলিকপ্টার এসে সমুদ্রে ভাসমান যানটি থেকে নভচারীদের উঠিয়ে নিয়ে ইয়র্কটাউন জাহাজে পৌছিয়ে দেয়। নভচারী তিনজন খুবই স্থস্থ ও উৎফুল্ল ছিলেন যদিও তাঁদের হাঁটাচলায় ক্লান্তির ছাপ স্থস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

অভিযানকালে মহাকাশযানের নভচারীদের দু-জন ঘুমোতেন ও একজন জেগে থাকতেন। কিন্তু চন্দ্র প্রদক্ষিণের কুড়ি ঘণ্টা ওঁরা সকলে একসঙ্গে জেগে-ছিলেন। এসময়ে ওঁরা অনেক কৌতুকোদ্দীপক দৃশ্য দেখেছেন। পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে যেমন দেখায় চাঁদের দেশ থেকেও নভচারীরা পৃথিবীকে ঠিক তেমনই দেখেছেন, তবে পৃথ্বীচাঁদ অনেক বেশী উজ্জ্বল ও আকারে অনেক বড়। চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে পৃথ্বীচাঁদের উদয় ও অস্তদৃশ্য ওরা অনেকবার উপভোগ করেছেন।

আকাশের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সূর্যকে দেখেছেন অতি শুভ্র একখানা চাকতির মতো।

অ্যাপোলো যানে প্রধান দুইটি অংশ বা প্রকোষ্ঠের নাম Service Module এবং Command Module। তৃতীয় অংশের নাম Lunar Excursion Module, সংক্ষেপে L. E. M বা L. M। সর্বোপরি অবস্থিত Service Module সম্পূর্ণ-ই জ্বালানী ভাণ্ডার। Command Module-য়ে নভচারীদের বসবাসের ব্যবস্থা, আর আছে স্বয়ংক্রিয়, হস্তচালিত ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং ক্যামেরা প্রভৃতি। L. E. M চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের যান—সেজন্যে অ্যাপোলো যানের এই অংশটিকে পৃথকভাবে চান্দ্রযান নাম দেওয়া যেতে পারে। অ্যাপোলো-৮ থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পরিকল্পনা ছিল না—তাই এর সঙ্গে L. E. M বা চান্দ্রযান সংলগ্ন ছিল না।

L. E. M প্রকোষ্ঠখানির অর্থাৎ চান্দ্রযানখানিতে ছড়ানো দীর্ঘাকৃতি চারখানি পায়া থাকায় এটিকে খানিকটা মাকড়সার মতো দেখতে। এই চান্দ্রযানখানিকে আবার দুই খণ্ডে ভাগ করা যায়—একখণ্ডে চন্দ্রপৃষ্ঠকে পর্যবেক্ষণের গবেষণাগার, অপর খণ্ডে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগের যান্ত্রিক কৌশল। সম্পূর্ণ যানখানি যখন চন্দ্রের কক্ষে প্রদক্ষিণরত তখন অ্যাপোলোর অপর দুই প্রকোষ্ঠ থেকে চান্দ্রযানখানাকে বিচ্ছিন্ন করে উল্টোমুখী রকেটের সাহায্যে ধীরে ধীরে গিয়ে পায়ের উপর ভর করে চন্দ্রপৃষ্ঠে বসবার ব্যবস্থা। পরিকল্পনা এই যে, দুই নভচারী চান্দ্রযানে চেপে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবেন এবং এক নভচারী Command Module-য়ে চন্দ্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে থাকবেন। ন্যস্ত কর্ম সম্পূর্ণ করে নভচারীদ্বয় চান্দ্রযানের অপর খণ্ডে আরোহণ করে রকেট চালিয়ে প্রদক্ষিণরত Command Module-এর কক্ষপথে উঠে অপর নভচারীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

Command Module থেকে দুই নভচারী ঠিকমতো চান্দ্রযানে ঢুকতে পারে কিনা, চান্দ্রযানকে ঠিকমতো Command module থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় কি না, দূর থেকে কাছে এসে আবার Command Module-এর সঙ্গে চান্দ্রযানকে যুক্ত করা যায় কি না, দুই নভচারী চান্দ্রযান থেকে আবার Command Module-য়ে ঢুকতে পারে কিনা—এ সকল পরীক্ষার জন্যে ১৯৬৯ সনে মার্চের প্রথম সপ্তাহে তিন নভচারী অ্যাপোলো-৯-য়ে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে উঠে ১০ দিন যাবৎ উক্ত সকল পরীক্ষা সম্পন্ন করেন ও সাফল্য অর্জন

করে ১৩ই মার্চ আটলান্টিক মহাসাগরে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে নির্বিঘ্নে অবতরণ করেন।

১৯৬৯ সনের ১৮ই মে রবিবার রাত ১০টা ১৯ মিনিট সময়ে অ্যাপোলো-১০ চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করে, ২১মে চাঁদের আকাশে পৌছে, ২৩শে মে প্রত্যাবর্তন সুরু করে ও ২৬ শে সোমবার রাত্রে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ২৩ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরে প্যাগো প্যাগো দ্বীপের সন্নিকটে নির্বিঘ্নে অবতরণ করে। এই অভিযানে অ্যাপোলো-১০-এর সঙ্গে L.E.M. বা চান্দ্রযান যুক্ত ছিল। তিন মহাকাশচারী স্ট্যাফোর্ড, সারনান ও ইয়ং ছিলেন অভিযাত্রী। অ্যাপোলো-১০ যানটি যখন চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল উঁচুতে কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত তখন স্ট্যাফোর্ড ও সারনান চান্দ্রযানে আরোহণ করে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ মাইল উঁচুতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং এক কক্ষপথে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করেন। এঁরা চাঁদের এত সন্নিকট থেকে অবতরণযোগ্য স্থানসমূহ চাক্ষুষ দেখে ও ফটো নিয়ে কয়েকবার প্রদক্ষিণের পর যথাসময়ে রকেট চালিয়ে আবার উর্ধ্বাকাশে পরিভ্রমণরত নভচারী ইয়ংএর সঙ্গে অ্যাপোলো-১০-য়ে এসে মিলিত হন। তারপর আরোহীগণ উপযুক্ত সময়ে রকেট চালিয়ে চাঁদের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করে পৃথিবীর দিকে প্রত্যাবর্তন সুরু করেন। চাঁদের আকাশ থেকে বহু টেলিভিসন ছবি এঁরা পৃথিবীবাসীকে দেখিয়েছেন। অ্যাপোলো-৮-এর অভিযাত্রীদের চেয়ে আরও কিছু বেশী অভিজ্ঞতা ও তথ্য সঞ্চয় করে এঁরা ঘরে ফিরলেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ প্রশ্নে সকল সমস্যারই সফল সমাধান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এবার পৃথিবীর মানুষ NASA কর্তৃক অবতরণের সেই পরম লগ্নটির ঘোষণা প্রতীক্ষা করছে।

চন্দ্র বিজয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য সেখানে কোন মানমন্দির স্থাপন করা যায় কি না তা পরীক্ষা করা। বায়ুর আবরণহীন চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অবিকৃত রূপ পর্যবেক্ষণ করা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের স্বপ্ন। ব্রহ্মাণ্ডের জন্মেতিহাস ও তার বিবর্তনের ধারা নির্ণয়ে আনুমানিক তত্ত্বের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ তথ্য পেলে বিজ্ঞানীর গবেষণা অবশ্যই অনেক দৃঢ়ভিত্তিক হবে।

মহাকাশে স্থায়ী বিজ্ঞানাগার ও ঘাটি

আড়াই লক্ষ মাইল দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিজ্ঞানাগার ও মহাকাশ সমীক্ষার ঘাটি নির্মাণ কোনদিন সম্ভবপর হলেও পৃথিবী থেকে এই বিপদসঙ্কুল ও ব্যয়বহুল

চন্দ্রাভিযান অনেক বিজ্ঞানীর মতে বাস্তবানুগ নয়। তার চেয়ে পৃথিবীর ঘন বায়ুর আস্তরণের উপরে উচ্চাকাশে অল্পে অল্পে মালমশলা নিয়ে গিয়ে একটি বৃহদায়তন নকল চাঁদ সৃষ্টি করে তাতে বিজ্ঞানাগার ও মহাকাশ সমীক্ষার ঘাটি নির্মাণ অনেক সহজসাধ্য ও অল্প ব্যয়সাপেক্ষ। এজন্যে N A S A-র পরিকল্পনা আগেই প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী কাজও এগিয়ে চলেছে।

পৃথিবীর কক্ষে নকল উপগ্রহ স্থাপন যেদিন থেকে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে সেদিন থেকে উচ্চাকাশে বৃহদায়তন কৃত্রিম উপগ্রহে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের কল্পনা বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করে আসছে। এ যাবৎ যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায় মহাশূন্যে মানুষের পদচারণা সম্ভব, মহাকাশে দুই যানের একত্র মিলন সম্ভব, মহাশূন্যে মানুষের এক যান থেকে অন্য যানে প্রবেশ করাও সম্ভব। সুতরাং আশা করা যায়, পৃথিবী থেকে প্রেরিত কোন রকেটযান অন্য কোন কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে গিয়ে নোঙর করতে পারবে। পৃথিবী ও কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে জিনিষপত্র, লোকজন ইত্যাদি পারাপারের জন্যে রকেটযানকে খেয়াতরী হিসেবে ব্যবহার করা অসম্ভব হবে না—এমন ভরসাও করা যায়।

মহাকাশে যদি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করা যায় তাহলে বায়ুর প্রতিবন্ধকতাহীন ঐ স্থান থেকে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন প্রয়াসে বিজ্ঞানীরা অনেক জটিলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। আবার ঐ রকম কোন একটি নকল উপগ্রহকে ঘাটি করে চন্দ্রে ও গ্রহান্তরে অভিযান চালানোতে অনেক শ্রম লাঘব ও ব্যয়সঙ্কোচ হবে, কারণ এক্ষেত্রে স্যাটার্ন-৫-এর মতো মহা-শক্তিশালী রকেটের দরকার হবে না। স্যাটার্নের তৃতীয় পর্যায়ের মতো এক ইঞ্জিনযুক্ত একটি মাত্র রকেটই ভূপ্রদক্ষিণরত ঘাটি থেকে একটি মহাকাশযানকে মহাশূন্যে পাঠাবার জন্যে প্রস্থানবেগ সঞ্চার করে দিতে পারবে।

সিনক্রোনাস (Synchronous) উপগ্রহ

বেতার প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্র যদি খুব দূরে থাকে তাহলে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ সেখানে সোজা পথে যেতে অনেক সময় এমন বাধার সম্মুখীন হয় যে, তরঙ্গগুলি আর গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছতে পারে না। অথচ এক দেশ থেকে অন্য দেশেও বেতার সংবাদ, টেলিভিশন প্রভৃতি বেশ পৌঁছে যাচ্ছে। এর কারণ হলো প্রেরক-যন্ত্র দ্বারা উৎসারিত বেতার-তরঙ্গ

আকাশে উঠে আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে, ভূপৃষ্ঠে ধাক্কা খেয়ে আবার আয়নমণ্ডলে যায়, আবার আসে, আবার যায়, —এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে বহুদূরেও সে তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু প্রতিফলনের জন্যে আয়নমণ্ডল খুব নির্ভরযোগ্য স্থান নয়। সূর্যদেহের বিক্ষোভের সঙ্গে আয়নমণ্ডলের গঠন-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সূর্যদেহে মাঝে মাঝে এমন প্রবল বিক্ষোভ হয় যে, আয়নমণ্ডলের স্বাভাবিক প্রতিফলন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দূরের গ্রাহক-যন্ত্রে বেতার-তরঙ্গ পৌঁছায় না, অর্থাৎ বেতার-বার্তা ও টেলিভিশন সবই বন্ধ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরিমাণ ও প্রয়োজন বর্তমান কালে এত বেড়ে গেছে যে, অন্যান্য মাধ্যমগুলির পক্ষে সে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। এ অবস্থায় যদি আয়নমণ্ডলও অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে অসুবিধার অন্ত থাকে না। এর প্রতিকারার্থে এক পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে International Telecommunication Satellite Consortium নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। ষাটটি দেশ এই সংস্থার সদস্য, তাদের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি।

পরিকল্পনাটি এইরূপ। ভূপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বদেশে ভূবেষ্টনী একটি বৃত্তের উপর সমান দূরত্বে তিনটি নকল চাঁদ স্থাপন করতে হবে। ভূপ্রদক্ষিণরত ঐসব নকল চাঁদের গতিবেগ পৃথিবীর আবর্তন বেগ অর্থাৎ আহ্নিক গতির সমান। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থান থেকে সেই অঞ্চলের নকল চাঁদকে সব সময়েই নিশ্চল বা একদম স্থির দেখা যাবে। পৃথিবীর আবর্তন গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলে এ জাতীয় নকল চাঁদকে (Synchronous Satellite) সিনক্রোনাস উপগ্রহ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে প্রথমটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর, দ্বিতীয়টি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর ও অপরটি ভারত মহাসাগরের উপর। ঐ সংস্থা ইতিমধ্যেই আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর সিনক্রোনাস উপগ্রহ স্থাপন করেছে, ভারত মহাসাগরের উপরকার নকল চাঁদটি বোধহয় এক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে। নকল চাঁদ তিনটি সর্বদা বর্তমান থাকায় তাদের দেহও সর্বদা বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারবে এবং এ অবস্থায় সারা পৃথিবীর বেতার-বার্তা ও টেলিভিসন অনুষ্ঠান কোন সময়েই বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। অধিকন্তু দুর্বল বেতার তরঙ্গকে অধিকতর শক্তিশালী করে দেবার যন্ত্রাদিও নকল চাঁদগুলিতে থাকবে। পরিকল্পনার
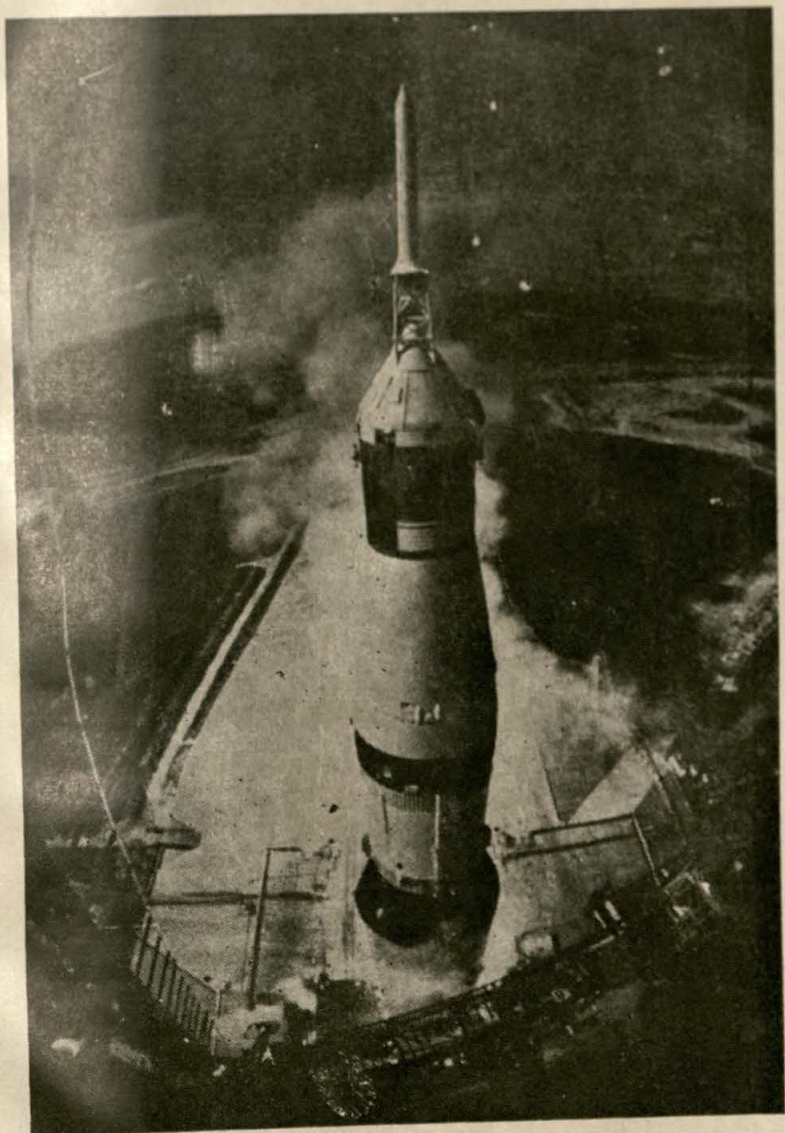
বিশাল আকৃতির স্যাটার্ন-৫ রকেট অ্যাপোলো-১১-কে মাথায় নিয়ে ১৬ই জুলাই চন্দ্রে যাবার জন্যে কেপ কেনেডীর উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে যাত্রা করছে।

সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার অভিপ্রায়ে ভারতে ইতিমধ্যেই পুনার নিকটে আরভিতে একটা বিরাট বেতার স্টেশন তৈরির কাজ সুরু হয়েছে এবং বোম্বাইয়ে চলছে Satellite Communication Exchange প্রতিষ্ঠার কাজ। প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে সকল রকমের প্রাকৃতিক বাধা এবং ব্যয়বহুল অনেক যান্ত্রিক ব্যবস্থার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভারত ভূখণ্ডেরই উচ্চাকাশে অনতিবিলম্বে ঐরূপ একটি সিনক্রোনাস উপগ্রহ স্থাপন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সমান বেগে চলবে বলে এই নকল চাঁদটির সর্বকালীন স্থিতি ভারত ভূখণ্ডের উচ্চাকাশে একটি স্থানে নিবদ্ধ থাকবে। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটির মাধ্যমে কেবলমাত্র জাতির উন্নয়নমূলক বিবিধ কার্য-সূচী প্রচার করা হবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণ

নিখুঁত পরিকল্পনা, প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ এবং দুঃসাহসিক নভচারীদের কর্মকুশলতা সহযোগে আমেরিকার প্রোজেক্ট অ্যাপোলো মানুষের বিস্ময়ের মাত্রা ও রোমাঞ্চের শিহরণ উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছে। অ্যাপোলো-৮ তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে চাঁদের দেশ বেড়িয়ে আনলো, অ্যাপোলো-১০ এর তিন মহাকাশচারীর দু-জন চান্দ্রযানে করে চন্দ্রকে দশ মাইলের মধ্যে রেখে প্রদক্ষিণ করে এলেন, অ্যাপোলো-১১-এর তিন যাত্রীর মধ্যে দু-জন চান্দ্রযানে করে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলেন,—চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণ পড়লো, চন্দ্রের ভূমিতে মানুষের পরিচয় ফলক ও ধ্বজা প্রোথিত হলো।

অ্যাপোলো-১১-এর সার্ভিস ও কম্যাণ্ড মড্যুলের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছিল কলম্বিয়া। এই কলম্বিয়া নাকের ডগায় করে মাকড়সাসদৃশ যে চান্দ্রযান-খানাকে চাঁদের দেশে নিয়ে গিয়েছিল তার নাম রাখা হয়েছিল ঈগল। অ্যাপোলো-১১-য়ে যে তিন নভচারী গিয়েছিলেন তাঁদের নাম—নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন আলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। আর্মস্ট্রং এ অভিযানের অধিনায়ক, কলিন্স মূল যানের চালক ও আলড্রিন ঈগলের চালক। পূর্বেই বলা হয়েছে, চান্দ্রযানের মধ্যে আছে দুটি অংশ,—একটি অবতরণ অংশ, অপরটি উড্ডীন অংশ। এক্ষেত্রে ব্যবস্থা ছিল, ঈগলের চতুষ্পদযুক্ত অবতরণ অংশকে চাঁদের

ভূমির উপর পরিত্যাগ করে তার উড্ডীন অংশে আরোহণ করে নভচারীরা ঊর্ধ্বে উঠে প্রদক্ষিণরত কলম্বিয়ার সঙ্গে মিলিত হবেন।

১৯৬৯ সনের ১৬ই জুলাই ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২ মিনিটে কেপ কেনেডি থেকে মহাশক্তিমান স্যাটার্ন-৫ রকেট অ্যাপোলো-১১কে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায়। অ্যাপোলো-৮ ও ১০-এর প্রণালী অবলম্বনেই তিন ঘণ্টারও কম সময়ে পৃথিবীর মহাকর্ষশক্তি অতিক্রম করে অ্যাপোলো-১১-য়ে প্রস্থানবেগ সঞ্চারিত হয় ও ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০০ মাইল বেগে যানটি চন্দ্রাভিমুখে ছুটতে আরম্ভ করে। এই গতিবেগ ক্রমান্বয়ে কমে আসে এবং চাঁদ ও পৃথিবীর সম-অভিকর্ষ ক্ষেত্র পার হয়ে গতিবেগ আবার কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০শে জুলাই চাঁদের রাজ্যে পৌঁছে অ্যাপোলো-১১ চন্দ্র প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৯ মাইল উচ্চতায় তার উপবৃত্ত কক্ষটিকে বৃত্তাকার করে নেয়া হয়। ঐ দিনই রাত্রি ১১টা ১৮ মিনিট সময়ে ঈগলে আরোহণ করে তাকে মূলযান থেকে বিযুক্ত করে আলড্রিন ও আর্মস্ট্রং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্যে যাত্রা করেন এবং কলম্বিয়ায় বসে কলিন্স ৬৯ মাইল ঊর্ধ্বে বৃত্তপথে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। আলড্রিনের পরিচালনায় রাত্রি ১টা ৪৪ মিনিট সময়ে ঈগল চাঁদের শান্তিসাগর এলাকায় ভূমির উপর নির্বিঘ্নে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নভচারীদ্বয় ঈগলের প্রকোষ্ঠে বসেই দেখতে পান,—শান্তি সাগর এলাকাটি নানা রংবেরঙের উপলখণ্ড সমাকীর্ণ একটি সমতল ক্ষেত্র এবং তথায় অনেক চক্রাকার খাদমুখও আছে।

কয়েক ঘণ্টা ঈগলের প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করে ২১শে জুলাই সকাল ৮টা ২৬ মিনিটে আর্মস্ট্রং যানটির পদসংলগ্ন মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে নেমে পড়েন। মইয়ের দুই ধাপ নেমে আর্মস্ট্রং টেলিভিসন ক্যামেরাটি এমনভাবে স্থাপন করেছিলেন যাতে পৃথিবীবাসী তাঁদের চন্দ্র বিচরণ দেখতে পায়। মইয়ের শেষে ধাপে নেমে তিনি পা দিয়ে পরখ করে নিলেন চাঁদের মাটি যথেষ্ট শক্ত কি না,—তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে পড়লেন। প্রথমেই হাতের কাছে যে উপলখণ্ডটি পেলেন সেটি কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখলেন ও হাঁটাচলা আরম্ভ করলেন। ২০ মিনিট পর আলড্রিনও ঈগল থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ঈগলের পায়ে সংলগ্ন ছিল একটি ফলকে লেখা মানুষের স্মারকলিপি। আর্মস্ট্রং তার ঢাক্‌নাটি খুলে দেন। তাতে লেখা আছে,—"১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহ থেকে মানুষ এসে এখানে পদার্পণ

করেছিল। আমরা এসেছিলাম মানব জাতির শান্তি কামনায়।" ফলকে নভচারী তিন জনের ও প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্বাক্ষর আছে। এর পর তাঁরা আমেরিকার জাতীয় পতাকা সংলগ্ন দণ্ডটি সেখানে প্রোথিত করেন। বায়ুহীন চাঁদে পতাকা খুলবে না তাই টান টান করে পতাকাটিকে খুলে রাখার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল।

মহাকাশের পোষাকপরা অবস্থায় ওঁদের পক্ষে কোমর বাঁকিয়ে চাঁদের ধূলি মাটি নুড়ি কুড়ানো খুব সহজ ছিল না তবুও যথাসাধ্য প্রচুরই সংগ্রহ করতে পেরেছেন। খুঁড়ে খুঁড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৫ ইঞ্চি গভীরের মাটিও ওঁরা সংগ্রহ করেছেন। নভচারীদ্বয় তখনই রেডিওতে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন উপলখণ্ডগুলি পিচ্ছিল, যেন গায়ে পাউডার মাখানো আছে; চাঁদের উপর-তলার মাটি কাঠকয়লার গুঁড়োর মতো; ধূলোমাটি লেগে ওঁদের জুতোয় রং ধরে গেছে। কিন্তু ৫ ইঞ্চি গভীরের মাটি কেমন যেন ভিজে ভিজে। চাঁদের উপরতলার মাটি বেশ শক্ত বলা চলে,—তাতে দেহভারে জুতো সিকি ইঞ্চি মাত্র ডোবে। চন্দ্রপৃষ্ঠের ছায়াময় অংশগুলিতে এত গাঢ় অন্ধকার যে, নিজেরা কোথায় পা ফেলছেন তাও দেখতে পাচ্ছিলেন না। অদূরে একটি পাহাড় দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু তার দূরত্ব আধ মাইল কি এক মাইল তা ওঁরা সঠিক অনুমান করতে পারেন নি। নভচারীদ্বয়ের সংগৃহীত ধূলো, মাটি, পাথরের নমুনা কয়েকটি থলিতে ভর্তি করে ঈগল-প্রকোষ্ঠ থেকে ঝুলানো একটা বড় থলির মধ্যে আর্মস্ট্রং নিয়ে জড়ো করে রেখে আসেন। এগুলি পরে যানে উঠে বাক্সবন্দী হবে। ওঁরা সবশুদ্ধ যা সংগ্রহ করেছেন, পৃথিবীতে তার ওজন ২৪ কিলোগ্র্যাম।

এর পর সুরু হয় বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ। চন্দ্রের মাটিতে ওঁরা সিস্‌মোমিটার (Seismometer) প্রোথিত করেন, যার সাহায্যে চন্দ্রের ভূকম্পন পৃথিবীতে বসেও পরিমাপ করা সম্ভব হবে। চন্দ্রের মাটিতে ওঁরা একটি লেসার বীম রিফ্লেক্টর (Laser Beam Reflector) যন্ত্রও স্থাপন করেন। পৃথিবী থেকে প্রেরিত আলোক-রশ্মি ঐ যন্ত্র থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে, যার ফলে চন্দ্রের অবস্থিতি স্থান ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ঠিক তক্ষুনি ক্যালিফোর্ণিয়ার এক মানমন্দির থেকে আলোকরশ্মি পাঠিয়ে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ঐ যন্ত্র থেকে প্রতিফলন যথাযথ ফিরে আসছে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, বায়ুচাপ সংরক্ষণ ও তেজস্ক্রিয় কণিকার প্রতিরোধ, এই তিন স্তরের পোষাকে নভচারীরা সজ্জিত ছিলেন। তাঁদের এক কাঁধের উপর

অক্সিজেন ভাণ্ডার ও অপর কাঁধে বেতার প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র এবং আরও নানাবিধ দ্রব্য ওঁদের পোষাকে যোগ করা হয় যা চাঁদের বায়ুহীন মরুপ্রান্তরে জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়ায় পোষাকটির ওজন পৃথিবীতে হবে ৭৮ কিলোগ্রাম অর্থাৎ প্রায় দুই মন। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে পোষাকটির ওজন মাত্র ১৩ কিলোগ্রাম। চন্দ্রে দুর্বল অভিকর্ষের দরুণ নভচারীরাও তাঁদের এক-ষষ্ঠাংশ ওজনে পরিণত হয়েছিলেন। এর ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁদের হাঁটাচলা স্বাভাবিক ছিল না,—ওঁরা চলেছেন ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে, টলতে টলতে।

হাউসটনের মহাকাশঘাটির সঙ্গে তিন মহাকাশচারীর সারাক্ষণই রেডিও যোগাযোগ ছিল। ঘাটির সঙ্গে তাঁদের সর্বদাই যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও আরও নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলেছে এবং ঘাটিতেই বেতারে তাঁদের হৃদ্‌স্পন্দনাদির রেখাচিত্র পাওয়া গেছে। মূলযান থেকে ঈগলে উঠে চন্দ্রপৃষ্ঠে যাত্রাকালে অধিনায়ক আর্মস্ট্রঙের নাড়ীস্পন্দন বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিনিটে ১৫৬ ও চালক আলড্রিনের ১২০। ঈগল চন্দ্রপৃষ্ঠে নির্বিঘ্নে নামবার ৪৫ মিনিট পর তাঁদের নাড়ীস্পন্দন ৯০-তে নেমে আসে অর্থাৎ তখনও স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রায় ২০ বেশী। চন্দ্রপৃষ্ঠে পদক্ষেপের সময়ে আর্মস্ট্রঙের নাড়ীস্পন্দন ছিল ৯৪ ও আলড্রিনের ১২০।

কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও ওঁরা আরও কিছুক্ষণ চাঁদের ভূমিতে বিচরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু ভাণ্ডারে রক্ষিত শ্বাসগ্রহণের অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছিল বলে পৃথিবীর ঘাটির কড়া নির্দেশে ওঁরা অনতি-বিলম্বে ঈগল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে ঝাঁপ বন্ধ করে দেন। ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ২ সেকেণ্ড সময় আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে মুক্ত অঙ্গনে ছিলেন, আলড্রিন কিছু কম। ঈগল প্রকোষ্ঠে আহারাদি সেরে ওঁরা ঘুমিয়ে নেন। তারপর রাত্রি ১১টা ২৪ মিনিটে অর্থাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠে কিঞ্চিদধিক সাড়ে তেইশ ঘণ্টা কাটিয়ে আর্মস্ট্রং ও আলড্রিন ঈগলের অবতরণ অংশ ওখানেই ফেলে রেখে উড্ডীন অংশে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করেন। আলড্রিনের পরিচালনায় এটি সাত মিনিটের মধ্যেই নিম্নস্থ এক কক্ষে স্থাপিত হয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। ক্রমান্বয়ে উচ্চতর কক্ষে উঠে সাড়ে তিন ঘণ্টা পশ্চাদ্ধাবনের পর ঈগল ৩টা ১৫ মিনিটে কলম্বিয়ার সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করে। সুড়ঙ্গ পথে মালপত্রসহ নভচারীদ্বয়ের কম্যাণ্ড মড্যুলে প্রবেশ করার পর ঈগলকে কলম্বিয়া

থেকে বন্ধনমুক্ত করে পরিত্যাগ করা হয়। ক্ষুদ্র ঈগল তখন উপগ্রহরূপে চন্দ্র প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। কলিন্সের সঙ্গে আর্মস্ট্রং ও আলড্রিনের কলম্বিয়ায় পুনর্মিলন হলো ২৭ ঘণ্টা পরে।

কলিন্স এবার রকেট চালিয়ে চন্দ্রের অভিকর্ষ বন্ধন ছিন্ন করে কলম্বিয়া অর্থাৎ অ্যাপোলো-১১-কে পৃথিবী অভিমুখে পরিচালনা স্থরু করলেন। চাঁদের রাজ্য ছাড়ার পর যানটির গতিবেগ ক্রমে বাড়তে থাকে। ২৪শে জুলাই পৃথিবীর আকহমণ্ডলে প্রবেশের প্রাক্কালে তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০০ মাইল। এ সময়ে অ্যাপোলো-১১-এর দেহ থেকে সার্ভিস মড্যুলটিকে খুলে ফেলে দেওয়া হয়,—আরতো জ্বালানী ও রকেটের আবশ্যক নেই! তাছাড়া এর ফলে যানটির আর বহিরাকাশে ছিটকে চলে যাওয়ারও কোনই আশঙ্কা থাকলো না। এর পরে প্যারাস্থট সাহায্যে পৃথিবীতে নামার পালা। নামতে হবে প্রশান্ত মহাসাগরে কিন্তু যে-স্থানটিতে নামার কথা সেখানকার আবহাওয়া খারাপ থাকায় নভচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ওখান থেকে ২১৫ মাইল দূরে একস্থানে নামতে। এখানে জলে ভাসমান কম্যাণ্ড মড্যুল থেকে নভচারীদের উদ্ধার করার সকল ব্যবস্থাই প্রস্তুত রাখা হয়। স্থানটি হাওয়াই দ্বীপের ৯০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

নামবার সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে যানটির বহিরাবরণের তাপমাত্রা উঠেছিল ৫০০০ ডিগ্রী ফারেনহীট কিন্তু যানের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ছিল ৮০ ডিগ্রী ফারেনহীট। নভচারীত্রয়সহ যানটি প্রশান্ত মহাসাগরে যথানির্দিষ্টস্থানে জল স্পর্শ করে ঠিক পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ২৪ শে জুলাই রাত্রে ভারতীয় সময় ১০ টা ১৯ মিনিটে। অ্যাপোলো-৮ ও ১০ থেকে নভচারীদের যেভাবে জলে ভাসমান কম্যাণ্ড মড্যুল থেকে হেলিকপ্টার সাহায্যে নিকটস্থ জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবেই তিন নভচারীকে নিকটে অপেক্ষমান হরনেট নামক জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

নভচারীরা চাঁদ থেকে যদি কোন নূতন জীবাণু নিয়ে এসে থাকেন যার ফলে পৃথিবীতে নূতন ধরণের কোন রোগের উৎপত্তি হতে পারে,—এই আশঙ্কায় প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান অবস্থায় যানের মধ্যেই তাঁদের পোষাক পরিবর্তন করতে হয়। এই জীবাণু প্রতিরোধী পোষাক তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে দেয়। হেলিকপ্টারে তাঁরা যখন হরনেট জাহাজে পৌঁছেন তখন সেখানে উপস্থিত প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কেউই

চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতে, অভিনন্দন জানাতে বা কথাবার্তা বলতে পারলেন না। জাহাজের ক্যারেনটাইন (Quarantine) কক্ষে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো। চাঁদের মাটিতে ওদের কোনও জীবাণু আক্রমণ করেছে কিনা কিংবা চাঁদ থেকে কোন নূতন জীবাণু বহন করে পৃথিবীতে এনেছেন কিনা,—এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ১৮ দিন অর্থাৎ ১১ই আগষ্ট পর্যন্ত তাঁদের ক্যারেনটাইনে থাকতে হবে,—তারপর তাঁদের মুক্তি। এর পরে হবে আপন আপন পরিজনের সঙ্গে মেলামেশা, অভিনন্দন গ্রহণ প্রভৃতি উচ্ছ্বাস উল্লাসের সমারোহ।

১৯৬৯ সনের ১৩ই জুলাই অর্থাৎ অ্যাপোলো-১১-এর যাত্রার তিন দিন আগে রাশিয়া লুনা-১৫ নামক এক মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান চাঁদের দেশে পাঠায়। এটি ৫২ বার চন্দ্রপ্রদক্ষিণ করে ২১ তারিখে চাঁদের ভূমিতে অবতরণ করে ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অ্যাপোলো-১১-এর চান্দ্রযান ঈগল চন্দ্রপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায়ই তার থেকে ৫০০ মাইল দূরে লুনা-১৫ অবতরণ করে। এসময়ে এ অভিযানের উদ্দেশ্য কি রাশিয়া তা প্রকাশ করে নি। লুনা-১৫ যে সব সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠিয়েছে রাশিয়া ব্যতীত অপর কোন দেশের বেতার-বিজ্ঞানীরা তার মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি। অনেকের বিশ্বাস,—লুনা-১৫-কে পাঠানো হয়েছিল আমেরিকার আগেই যান্ত্রিক উপায়ে চাঁদের মাটি, নুড়ি কুড়িয়ে আনার জন্যে।

আপোলো-১১-এর নভচারীগণ চন্দ্রপৃষ্ঠের যে মাটি পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করে এনেছেন আজ ২৭শে জুলাই প্রবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত সে সবের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি সুরু হয় নি।

পরিশিষ্ট

সূর্য থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট নক্ষত্রের দূরত্ব

ধ্রুবতারা (Pole Star)	...	৪৭ আলোকবর্ষ
লুব্ধক (Sirius)	...	৮·৬ „
আর্দ্রা (Betelgeuse)	...	২০০ „
রোহিণী (Aldebaran)	...	৫৭ „
আল্‌ফা মহিষাসুর (a Centauri)	...	৪·৩ „
প্রশ্বা (Procyon)	...	১০·৫ „
স্বাতী (Arcturus)	...	৪১ „
ব্রহ্মহৃদয় (Capella)	...	৫২ „
আভজিৎ (Vega)	...	২৬ „
বাণরাজ (Rigel)	...	৫০০ „
জ্যেষ্ঠা (Antares)	...	৩৮০ „

নক্ষত্রের শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণী	পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (ডিগ্রী কেলভিন *)	বর্ণ
O	২৫০০০ ডিগ্রী কেলভিনের উর্ধ্বে	নীল
B	১১০০০—২৫০০০	নীলাভ সাদা
A	৭৬০০—১১০০০	সাদা
F	৬০০০—৭৬০০	হল্‌দেটে সাদা
G	৫১২০—৬০০০	হলুদ
K	৩৬০০—৫১২০	কমলা
M	৩৬০০ ডিগ্রী কেলভিন থেকে ক্রমান্বয়ে নীচে	লাল
R		„
N		„
S		„

* কেলভিন = সেন্টিগ্রেড + ২৭৩°
অর্থাৎ 0° কেলভিন = —২৭৩° সেন্টিগ্রেড

সৌরজগতের প্রধান প্রধান জ্যোতিষ্কসমূহের

জ্যোতিষ্কের নাম	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (লক্ষ মাইল)	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (সৌর একক)	গড় ব্যাস (মাইল)	আবর্তন কাল	সূর্য প্রদক্ষিণ কাল (ব=বৎসর মা=মাস দি=দিন)	ঘনত্ব (জল=১)
বুধ	৩৬০	০'৩৯	২৯০০	৮৮ দিন	৮৮ দিন	৬'১
শুক্র	৬৭২	০'৭২	৭৬০০	??	২২৪ দিন	৫'০৬
পৃথিবী	৯২৯	১'০০	৭৯১৩	২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট	৩৬৫'২৬ দি বা ১ ব	৫'৫২
মঙ্গল	১৪১৬	১'৫২	৪২০০	২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট	১ ব ১০ মা ২২ দি	৪'১২
সিরিস (সর্ববৃহৎ গ্রহকণিকা)	২৫৭১	২'৭৬	৪৮০	??	৪ ব ৭ মা ১২ দি	?
বৃহস্পতি	৪৮৩৩	৫'২০	৮৬৮০০	৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট	১১ ব ১০ মা ২৪ দি	১'৩৫
শনি	৮৮৬২	৯'৫৪	৭১৫০০	১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট	২৯ ব ৫ মা ১৭ দি	০'৭১
ইউরেনাস	১৭৮৩০	১৯'১৮	২৯৪০০	১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট	৮৪ ব ০ মা ৫ দি	১'৫৬
নেপচুন	২৭৯৪০	৩০'০৫	২৮০০০	১৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট	১৬৪ ব ৯ মা ১৮ দি	২'২৯
প্লুটো	৩৬৭০০	৩৯'৫১	৩৮০০	??	২৪৮ ব ৫ মা	?
সূর্য			৮৬৪০০০	২৪'৬৫ দিন		১'৪১
চন্দ্র			২১৬০	২৭'৩২ দিন		৩'৩৩

তুলনামূলক তথ্য

জ্যোতিষ্কের নাম	ভর (পৃথিবী=১)	স্বকীয় ভ্রমণ কক্ষের সঙ্গে বিষুব বৃত্তের কোণ	ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে ভ্রমণ কক্ষের কোণ	মাধ্যাকর্ষণ (পৃথিবী=১)	সর্বোচ্চ দীপ্তিমাত্রা (আপাত)	উপগ্রহের সংখ্যা
বুধ	০·০৫	৭° ?	৭°	০·২৬	—১·৯	×
শুক্র	০·৮১	২৩° ?	৩°২৪′	০·৯০	—৪·৪	×
পৃথিবী	১·০০	২৩°২৭′		১·০০		১
মঙ্গল	০·১১	২৪°	১°৫১	০·৩৭	—২·৮	২
সিরিস (সর্ববৃহৎ গ্রহকণিকা)	০·০০৫	?	১০°৩৭′	?	?	×
বৃহস্পতি	৩১৮·৪	৩°৭′	১°১৮′	২·৬৪	—২·৫	১২
শনি	৯৫·৩	২৬°৪৫	২°২৯′	১·১৩	—০·৪	৯+৩ বলয়
ইউরেনাস	১৪·৫	৯৮°	০°৪৬	০·৮৪	+৫·৭	৫
নেপচুন	১৭·২	২৯°	১°৪৬′	১·১৪	+৭·৬	২
প্লুটো	০·৯	?	১৭°৯′	?	?	?
সূর্য	৩৩১৯৫০	৭°১০	০°		—২৬·৮	
চন্দ্র	০·০১২	৬°৪১′	৫°৮′		—১২·৬	

কয়েকটি বিশিষ্ট নক্ষত্রের পরিচয়

১। লুব্ধক (Sirius)—নক্ষত্রটি একটি যুগলের অন্যতম। অপরটি আকারে ছোট, শ্বেতবামন,—নাম Sirius B। লুব্ধক সূর্যের তুলনায় ১'৫৮ গুণ বড়। পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে লুব্ধক আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

২। আল্‌ফা মহিষাসুর (a Centauri)—মহিষাসুর নক্ষত্রমণ্ডলের এই নক্ষত্রটি একটি যুগলের অন্যতম। আকারে সূর্যের ১'০৭ গুণ। এই মণ্ডলের প্রক্সিমা মহিষাসুর সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্র।

৩। প্রশ্বা (Procyon)—যুগলের একটি। আকারে সূর্যের ১'৮ গুণ। যুগলের অপরটি শ্বেতবামন।

৪। বাণরাজ (Rigel)—সূর্যাপেক্ষা ৩০ গুণ বড়। বর্ণ নীলাভ।

৫। আর্দ্রা (Betelgeuse)—সূর্যাপেক্ষা ৩৫০ গুণ বড়। লালদানব।

৬। জ্যেষ্ঠা (Antares)—সূর্যাপেক্ষা ৪৫০ গুণ বড়। আকাশের বৃহত্তম লালদানব।

৭। রোহিণী (Aldebaran)—আকারে সূর্যের ৪০ গুণ বড়। অপর একটির সঙ্গে যুগল। উভয়েই পীতদানব।

৮। ধ্রুবতারা (Pole Star)—পৃথিবীর উত্তর দিক নির্দেশ করে। যুগলের অন্যতম এটি একটি স্পন্দনশীল নক্ষত্র।

৯। মীর (Mira Ceti)—আকারে সূর্যের ৩০০ গুণ। যুগল নক্ষত্র। এদের বড়টি লালদানব, ছোটটি শ্বেতবামন। এই যুগল স্পন্দনশীল।

প্রধান কয়েকটি উপগ্রহ

গ্রহ	উপগ্রহের সংখ্যা	প্রধান উপগ্রহ	ব্যাস (মাইল)	ভর (চন্দ্র-১)	গড় ঘনত্ব (জল-১)	সংশ্লিষ্ট গ্রহ থেকে গড় দূরত্ব (হাজার মাইল)
বুধ	...					
শুক্র	...					
পৃথিবী	১	চন্দ্র	২১৬০	১·০০	৩·৩৩	২৩৯
মঙ্গল	২	(১) ফোবাস				৫·৮
		(২) ডাইমস				১৪·৬
		উভয়ই ক্ষুদ্রায়তন				
বৃহস্পতি	১২	(১) আইয়ো	২০০০	০·৯৯	৪·০৩	২৬২
		(২) ইউরোপা	১৮০০	০·৬৪	৩·৭৮	৪১৭
		(৩) গ্যানিমিড	৩১০০	২·১১	২·৩৫	৬৬৬
		(৪) ক্যালিস্টো	২৮০০	১·৩২	২·০৬	১১৭০
		অন্যরা ক্ষুদ্রায়তন				
শনি	৯	(১) রিয়া	১০০০	?	?	৩২৭
		(২) টাইটান	২৮৫০	১·৯২	২·৪	৭৫৯
		অন্যরা ক্ষুদ্রায়তন				
ইউরেনাস	৫	সকলেই ক্ষুদ্রায়তন				
নেপচুন	২	(১) ট্রাইটন	২৩৫০	১·৮	২·০ ?	২২০
		অন্যটি ক্ষুদ্রায়তন				
প্লুটো	?					

নির্ঘণ্ট
(পৃষ্ঠার নির্দেশ)